"ঈসা খান মসনদ-ই-আলা ঃ জীবন ও কর্মের একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ"

এম,ফিল, ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত
সন্দর্ভ

আ,এ,শেখ মোঃ আছরারুল হক চিশতি
এম, ফিল, গবেষক
রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ ৪৭
সেশন ঃ ১৯৯০-৯১

GIFT

Dhaka University Library
382736

382736

DIGITIZED

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মার্চ ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহ্-পীর চিশতি (কুঃ ছিঃ আঃ)-এর
চরণে
উৎসর্গীকৃত

382736

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"ঈসা খান মসনদ-ই-আলাঃ জীবন ও কর্মের একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ" শীর্ষক সন্দর্ভটি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে পেরে আমি প্রথমেই পরম করুণাময় আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের (দঃ) দরবারে শুকর গুজারী করছি।

উক্ত সন্দর্ভ প্রণয়ন সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রথমেই আমি যাঁর নিকট গভীর কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ রয়েছি তিনি হচ্ছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক ডঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিম, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যিনি পেশাগত দায়িত্ব পালনের নানান ব্যস্ততা সত্ত্বেও তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তাঁর মূল্যবান সময় অকৃপণ হস্তে দান করেন এবং গবেষণা কর্মের অগ্রগতিতে করেছেন আন্তরিক সহযোগিতা এবং দিয়েছেন প্রয়োজনীয় জ্ঞানগর্ভ ও পান্ডিত্যপূর্ণ উপদেশ। এর সাথে সাথেই আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর সহযোগী অধ্যাপক আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব মুঃ মুসা আনসারী এর নিকট, যিনি আমার এম, ফিল, প্রথম পর্বের একজন কোর্স শিক্ষক হিসেবে আমাকে গবেষণা সংক্রান্ত মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন।

382736

এছাড়া ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডঃ হাবিবা খাতুন এবং বর্তমান চেয়ারম্যান ডঃ আয়শা বেগম সহ উক্ত বিভাগের অন্যান্য সুযোগ্য শিক্ষক মন্ডলীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যাঁরা বিভিন্ন সময়ে আমাকে গবেষণা কর্মে আন্তরিক ভাবে উৎসাহ দিয়েছেন।

আমি আরো সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পিতা শ্রদ্ধেয় শাহ্ আবুল উলা শেখ মোঃ ফরিদ উদ্দিন চিশতি- এর নিকট, যিনি আমার জাগতিক ও পারত্রিক কর্ম প্রেরণার উৎস।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

এ পর্যায়ে আমি যাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করলেই নয় তিনি হচ্ছেন আমার পরমাত্মীয় জনাব আতাউর রহমান চিশতি, যিনি আজ আর পৃথিবীতে বর্তমান নেই। তিনি আমার এম. ফিল. প্রথম পর্বে ভর্তি হওয়ার পর থেকে আমাকে গবেষণা কর্মে আত্মনিয়োগে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

সর্বোপরি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী আব্দুল মালেক মল্লিক, প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, সরকারী সাদাত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল ও এমরান জাহান, প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, সরকারী মহিলা কলেজ, মানিক গঞ্জ, স্নেহাস্পদ ইমতিয়াজ আহমেদ, প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস, সরকারী এম. এম. আলী কলেজ, কাগমারী, টাঙ্গাইল ও ইফতিখার আহ্‌মেদ এবং ছোটভাই শেখ মোঃ মাসুদুল হক চিশতি'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা আমাকে গবেষণা কর্মে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছে।

পরিশেষে আমার শ্রদ্ধাস্পদ মাতা জাহানারা বেগম চিশতি এর প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যাঁর নিকট জন্ম লগ্ন থেকেই ঋণাবদ্ধ রয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আ,এ,শেখ মোঃ আছরারুল হক চিশতি কৃত "ঈসা খান মসনদ-ই-আলা ঃ জীবন ও কর্মের একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ" শীর্ষক সন্দর্ভটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। এটি এম. ফিল. ডিগ্রীর আবশ্যকীয় দিকগুলোর আংশিক পরিপূর্ণতা বিধানের লক্ষ্যে প্রণীত এবং আমি স্বয়ং এ গবেষণা কাজ বরাবর তদারক করেছি। আমি প্রার্থীকে এম.ফিল. ডিগ্রী প্রদান করার জন্য এটিকে বিবেচনা করার সুপারিশ করছি।

(ডঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিম)
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায় - পটভূমি	১-১৬
দ্বিতীয় অধ্যায় - ঈসা খানের বংশ পরিচয়	১৭-৭৫
তৃতীয় অধ্যায় - ঈসা খানের জন্ম, প্রাথমিক জীবন ও উত্থান	৭৬-১০২
ভাগ ১ - ঈসা খানের জন্ম	৭৬-৭৭
ভাগ ২ - ঈসা খানের প্রাথমিক জীবন	৭৭-৮০
ভাগ ৩ - আফগান সামন্ত হিসেবে ঈসা খান	৮১-৯৯
চতুর্থ অধ্যায় - স্বাধীন নৃপতি ঈসা খান ও তাঁর রাজ্যসীমা	১০৩-১২৯
ভাগ ১ - ভাটির স্বাধীন শাসক হিসেবে ঈসা খান	১০৩-১০৮
ভাগ ২ - ঈসা খানের রাজ্যের বিস্তৃতি	১০৮-১২২
ভাগ ৩ - ঈসা খানের রাজধানী	১২২-১২৫
পঞ্চম অধ্যায় - সমসাময়িক অন্যান্য প্রতিবেশী শাসক-সর্দারদের সাথে ঈসা খানের সম্পর্ক	১৩০-১৩৭
ষষ্ঠ অধ্যায় - মুঘলদের বিরুদ্ধে ঈসা খানের সংগ্রাম	১৩৮-২৩৫
ভাগ ১ - উত্তর ভারতে মুঘলদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ	১৩৮-১৪৩
ভাগ ২- আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার কার্যক্রম ঃ একটি সাধারণ সমীক্ষা	১৪৩-১৫৪
ভাগ ৩ - পূর্ব-ভারত ও এর শাসকদের প্রতি বাদশাহ্ আকবরের মনোভাব	১৫৪-১৫৯
ভাগ ৪ - মুঘল সম্প্রসারণবাদী নীতির প্রয়োগ; ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ব-ভারতে সামরিক অভিযানাদি, বিজয় ও ক্ষমতা সংহত করণের পদক্ষেপ সমূহ ও স্থানীয় সর্দারদের প্রতিক্রিয়া	১৫৯-১৭০
ভাগ ৫ - ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদের মুঘল-হুমকির মুকাবিলা	১৭১-২১২
উপভাগ ১ - ঈসা খান বনাম খান-ই-জাহান	১৭১-১৮৪
উপভাগ ২ - ঈসা খান বনাম শাহ্বায খান	১৮৪-১৯৯
উপভাগ ৩ - ঈসা খান বনাম শাহ্বায খান ও সাদিক খান	২০০-২০৬
উপভাগ ৪ - ঈসা খান বনাম মানসিংহ	২০৬-২১২
ভাগ ৬- ঈসা খানের মুঘল-বিরোধী অবস্থান ও আপেক্ষিক সুবিধে-অসুবিধে	২১২-২১৮
ভাগ ৭ - ঈসা-মুঘল সংঘর্ষের চূড়ান্ত পরিণতি	২১৮-২১৯
সপ্তম অধ্যায় - ঈসা খান মসনদ-ই-আলা ঃ কৃতিত্ব বিচার	২৩৬-২৪০

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
পরিশিষ্ট ১ -	ঈসা খানের "মসনদ-ই-আলা" উপাধি	২৪১-২৫৮
পরিশিষ্ট ২ -	সমসাময়িক আরো এক ঈসা খান প্রসঙ্গ	২৫৯-২৬৬
পরিশিষ্ট ৩ -	ঈসা খান কেন্দ্রিক লোকপ্রিয় উপাখ্যানাদির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ	২৬৭-২৭৬
পরিশিষ্ট ৪ -	বাংলা সাহিত্যে ঈসা খান প্রসঙ্গ ঃ একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা	২৭৭-২৮২
পরিশিষ্ট ৫ -	ঈসা খানের সাক্ষাত-উত্তর পুরুষ ও তাঁদের ভূমিকা	২৮৩-২৮৭
পরিশিষ্ট ৬ -	আকর গ্রন্থ সমূহের পর্যালোচনা	২৮৮-২৯৩
গ্রন্থপঞ্জী		২৯৪-৩০২

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় ঃ পটভূমি

ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে কুতব্ আল-দীন আইবক কর্তৃক উত্তর ভারতে তথা দিল্লী কেন্দ্রিক মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতের উপর দিল্লীর কর্তৃত্ব অটুট ছিল। কিন্তু মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের শেষ দিক থেকে দিল্লী সালতানাতের ক্রমাবনতি শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত দিল্লী সালতানাতের ধ্বংসাবশেষের উপর উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে কতিপয় স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠে। উত্তর ও পূর্ব ভারতীয় রাজ্য সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গুজরাট[১], মালব[২], জৌনপুর[৩] ও বাংলা[৪]। পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাহলুল লোদীর নেতৃত্বে দিল্লীতে আফগান শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও একমাত্র জৌনপুর[৫] ব্যতীত অন্যান্য স্বাধীন রাজ্যগুলোর উপর ষষ্ঠদশ শতকের পূর্বে দিল্লীর কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। উত্তর ভারতীয় এ স্বাধীন রাজ্য গুলোর মধ্যে কোনরূপ রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না এবং রাজ্যগুলোর মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিল। এ রাজনৈতিক অনৈক্যের সুযোগ গ্রহণ করেই মুঘল বাদশাহ্ বাবর ষষ্ঠদশ শতকে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। বাবরের ভারত বর্ষ অভিযানের প্রাক্কালে উত্তর ও পূর্ব ভারতে যে সকল সুলতান ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন দিল্লীতে আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদী, গুজরাটে দ্বিতীয় মুজফফর শাহ্, মালবে দ্বিতীয় মাহমুদ শাহ্ এবং বাংলায় সৈয়দ সুলতান নুসরাত শাহ্।

১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করে উত্তর ভারতে মুঘল শাসনের গোড়াপত্তন করেন। বাবরের নেতৃত্বে এ উপমহাদেশের রাজনৈতিক গগনে মুঘল শক্তির উত্থান এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটায়। কেননা বাবরের নিকট ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ের ফলে একদিকে আফগানরা ভারতের শাসন-দন্ড মুঘলদের হস্তে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং অন্যদিকে রাজ-ক্ষমতার এ হাতবদল আফগান ও মুঘলদের মধ্যে একটি তিক্ত দ্বন্দ্বের সূচনা করে। বস্তুতঃ ষষ্ঠদশ শতক ব্যাপী মুঘলদের সাথে আফগানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই এবং পূর্ব-ভারতে আফগানদের ক্রম অনুপ্রবেশ ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাসে একটি উত্তেজনাকর অধ্যায়ের সংযোজন করে। ষষ্ঠদশ শতকের এ মুঘল-

Dhaka University Institutional Repository

আফগান দ্বন্দ্ব বাংলার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং এ দ্বন্দ্বের সর্বশেষ কেন্দ্রস্থল ছিল বাংলা।

বাবরের নিকট ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ের ফলে সিকান্দর লোদী যেমনি জৌনপুরের সুলতান হুসাইন শাহ্ শর্কীকে বাংলায় আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন তেমনি আফগানরাও এখন বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৪৯৪ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর আফগান সুলতান সিকান্দর লোদী কর্তৃক পরাজিত হয়ে জৌনপুরের সুলতান হুসাইন শাহ্ শর্কী বাংলার সৈয়দ বংশীয় শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সুলতান আলা-আল-দীন হুসাইন শাহের নিকট আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। বাংলার সুলতান জৌনপুরের সুলতানকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং আমৃত্যু তিনি বাংলার সুলতানের আশ্রয়ে ছিলেন। যাহোক, হুসাইন শাহ্ শর্কীকে আশ্রয় প্রদান করায় দিল্লীর সুলতান সিকান্দর লোদী ক্ষিপ্ত হয়ে বাংলা আক্রমণ করেন। বাংলার সুলতানও তাঁর পুত্র দানিয়েলের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। দিল্লী ও বাংলার সৈন্যবাহিনী বাঢ় নামক স্থানে পরস্পরের মুখোমুখী হয়। এ ভাবেই দিল্লীর আফগান-শাসক সর্বপ্রথম বাংলার সংস্পর্শে আসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ না হয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির শর্তানুযায়ী স্থির হয় যে, একপক্ষ অন্যপক্ষকে আক্রমণ করবেনা এবং এক পক্ষ অন্য পক্ষের শত্রুকে আশ্রয় প্রদান থেকে বিরত থাকবে। এ চুক্তি সম্পাদনের পর থেকে ষষ্ঠদশ শতকের প্রথম কোয়ার্টার পর্যন্ত দিল্লীর লোদী আফগান সুলতান ও বাংলার সুলতানের মধ্যে কোনরূপ সংঘর্ষের সংবাদ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাংলার সুলতান আলা আল-দীন হুসাইন শাহ্ ও দিল্লীর সুলতান সিকান্দর লোদীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির ফলে দিল্লী ও বাংলার মধ্যে ক্ষমতার যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা লোদীদের উপর বাবরের বিজয়ের ফলে বিনষ্ট হয়ে যায়। কেননা পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের নিকট ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ের পর একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আফগান অভিজাত বাংলার সৈয়দ বংশীয় সুলতান নুসরাত শাহের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। বাংলায় পলায়নপর আফগানদের প্রতি বাবরের তাৎক্ষণিক মনোযোগ না থাকলেও রাণা সংগ্রাম সিংহের নেতৃত্বে হিন্দু রাজপুত প্রধানরা যেরূপ মুঘল বিরোধী সংঘ গঠন করেছিল বাংলার সুলতান ও পলায়নপর আফগানরা যাতে অনুরূপ সংঘ গঠন করতে না পারে সেদিকেই বাবরের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। এ উদ্দেশ্যেই বাবর ১৫২৭ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে আসন্ন লড়াইয়ে নুসরাত শাহের নিকট নিরপেক্ষতার আশ্বাস চেয়ে দূত প্রেরণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন[১১]। এ ভাবেই সর্ব প্রথম মুঘল শাসকের সাথে বাংলার যোগাযোগ ঘটেছিল। বাবরের নিবিষ্টচিত্ততা লক্ষ্য করে নুসরাত শাহ্ তৎক্ষণাত কোনরূপ হ্যাঁ - সূচক উত্তর প্রদান থেকে বিরত থাকেন[১২]। যাহোক, ১৫২৭ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই মার্চ বাবর খানুয়ার যুদ্ধে সংগ্রাম সিংহকে পরাস্ত করতে সক্ষম হন। অতপর বাবর ১৫২৮ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী রাজপুতদেরকে পরাজিত করে চান্দেরী দুর্গ দখল করে তাঁর বিজয় কে আরো সুসংহত করেন[১৩]। বাবর কর্তৃক খানুয়ার যুদ্ধে জয়লাভ রাজপুতদের নেতৃত্বে ভারতে হিন্দুদের রাজনৈতিক পুনরুত্থানের সম্ভাবনা বিনষ্ট করে দেয়[১৪]। রাজপুতদেরকে দমনের পর বাবর অযোধ্যা ও অন্যান্য স্থানের আফগানদের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি পুনরায় বাংলায় দূত প্রেরণ করেন। এই অবস্থায় নুসরাত শাহ্ পুনরায় বিলম্ব করা যুক্তিসংগত নয় মনে করেন এবং নিরপেক্ষতা ঘোষণা করে উপঢৌকনসহ বাবরের নিকট তাঁর দূত ইসমাইল মীথাকে প্রেরণ করেন[১৫]। ইতোমধ্যে আফগানরা তাদের নেতা ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মাহমুদ লোদী, শের খান, এবং জালাল খানের নেতৃত্বে অযোধ্যা ও দক্ষিণ বিহারে মুঘলদের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে সংগঠিত করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু বাবর তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া মাত্রই তারা পশ্চাদপসরণ করে। আফগানদেরকে তাড়া করার জন্য বাবর তখন ঘোগরা নদী অতিক্রম করে নুসরাত শাহের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলের উপর দিয়ে নির্বিঘ্নে সৈন্য পরিচালনার দাবী জানায়। নুসরাত শাহের ইতস্ততা ও গড়িমসির কারণে বাবর বল প্রয়োগ করেন এবং বাংলার সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে সারণ (SARAN) পর্যন্ত এলাকা দখল করে নেন। অবশেষে বাবরের নির্দেশিত শর্তানুযায়ী উভয় পক্ষের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়[১৬]। যাহোক, ১৫৩০ খ্রীস্টাব্দে বাবর মৃত্যুবরণ করেন। ভারতে ৪ বছর অবস্থান কালে বাবর উত্তর ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করতে সক্ষম হলেও সম্পূর্ণ উত্তর ভারত পদানত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুমায়ুন বাবরের স্থলাভিষিক্ত হন। ১৫৩১ খ্রীস্টাব্দে হুমায়ূন দাদরার(DOURAH) যুদ্ধে আফগানদেরকে পরাজিত করে মাহমুদ লোদীকে জৌনপুর থেকে বিতাড়িত করেন[১৭]। এর পর শুনা যায় যে, হুমায়ুন বাংলা আক্রমণের পরিকল্পনা করছেন। এ অবস্থায় নুসরাত শাহ্ মালিক মরজান নামক এক ব্যক্তিকে দূত নিযুক্ত করে গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের নিকট প্রেরণ করেন। বাহাদুর শাহ্ বাংলার সুলতানের দূতকে সাদরে গ্রহণ করেন। কিন্তু কোনরূপ চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই নুসরাত শাহ্ মৃত্যুবরণ করেন[১৮]।

Dhaka University Institutional Repository

যাহোক, নুসরাত শাহের জীবদ্দশায় মুঘলদের সাথে বাংলার সুলতানের আর কোন সংঘর্ষ হয়নি।

হুসাইন শাহী বংশের শেষ সুলতান গিয়াস আল-দীন মাহ্‌মুদ শাহ্ এমন এক সময় সিংহাসনে আরোহণ করেন যখন উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং হুমায়ূন ও শের শাহের নেতৃত্বে মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে উন্নীত হয়। একদিকে হুমায়ূন মালব, গুজরাট ও বাংলা দখলের ব্যর্থ চেষ্টা করেন এবং অন্যদিকে শের শাহের নিকট পরাজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত হুমায়ূন ভারতে থেকে বিতাড়িত হন। শের শাহ্ ও হুমায়ূন উভয়েই বাংলার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং বাংলাকে উত্তর ভারতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ভিত্তি প্রস্তরে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। এছাড়া পর্তুগীজরা সমুদ্রের দিক থেকে ক্রমাগত চাপ বৃদ্ধি করে এবং বাংলার দক্ষিণের জেলা সমূহে প্রবেশ করে। সর্বোপরি মাহ্‌মুদ শাহ্ নুসরাত শাহের পুত্র আলা-আল-দীন ফিরূয শাহ্‌কে হত্যা করে বাংলার সিংহাসন দখল করে নেয়ায় দেশের অমাত্যগণ তাঁর শত্রু হয়ে উঠে এবং দেশে অন্তর্বিরোধ দেখা দেয়। হাজীপুরের শাসনকর্তা গিয়াস আল-দীন মাহ্‌মুদ শাহের ভগ্নিপতি মখদুম আলম মাহ্‌মুদ শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং শের শাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ফলে মাহ্‌মুদ শাহ্ মখদুম আলমকে দমন করতে গিয়ে শের শাহের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। শের শাহ্ প্রথমে ১৫৩৪ খ্রীস্টাব্দে সুরুজগড়ের যুদ্ধে বাংলার সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেন এবং শেষে ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে গৌড় অধিকার করেন[১৯]। এ অবস্থায় মাহ্‌মুদ শাহ্ মুঘল বাদশাহ্ হুমায়ূনকে গৌড় আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান[২০]। হুমায়ূন বাংলার দিকে যাত্রা করলে শের শাহ্ গৌড় ত্যাগ করেন এবং ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে হুমায়ূন বিনা বাধায় গৌড়ে প্রবেশ করেন[২১]। কিন্তু ১৫৩৯ খ্রীস্টাব্দে শের শাহ্ চৌসার যুদ্ধে হুমায়ূনকে পরাজিত করার পর গৌড় পুনরধিকার করেন এবং ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দে বিলগ্রামের যুদ্ধে হুমায়ূনকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন[২২]। এর ফলে একদিকে যেমনি বাংলার প্রায় দু'শত বছরের স্বাধীন সুলতানী শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে বাংলা পুনরায় দিল্লীর নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে আসে অন্যদিকে তেমনি মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বের আপতিক অবসান ঘটে।

আফগান সুলতান শের শাহ্ ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করার পর মৃত্যুবরণ করেন। এ স্বল্প সময়ের মধ্যে শের শাহ্

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা, বিহার, জৌনপুর , মালব, দিল্লী, আগ্রা এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেও গুজরাট তখনও দিল্লীর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত ছিল। শের শাহের মৃত্যুর পর আফগানরা পুনরায় অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। শের শাহের পুত্র সুলতান ইসলাম শাহ্ তাঁর পিতৃ-সাম্রাজ্যের অখন্ডতা রক্ষা করতে সক্ষম হলেও ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর একদিকে আফগানদের অন্তর্দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে, অন্যদিকে মুঘলরা আফগানদের এ আত্মকলহের সুযোগ গ্রহণ করে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তারা আফগানদের নিকট থেকে ভারতের রাজদন্ড পুনরায় ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র ফিরুয খান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ফিরুয খানের মা'তুল মুবারিয খান তাঁকে হত্যা করে দিল্লীর মসনদ দখল করেন এবং মুহম্মদ আদিল শাহ্ উপাধি ধারণ করেন। কিন্তু দুর্ধর্ষ আফগান অমাত্যদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি । তাঁর দরবারে কোলাহল লেগেই থাকতো এবং একদিন প্রকাশ্য দরবারে দু'দলের মধ্যে খুনোখুনি হয়[২৫]। অনেকে দরবার থেকে পলায়ন করেন এবং কেউ কেউ রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন তাজ খান কারারানী (তিনি দক্ষিণ বিহারে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন), বাংলার শাসনকর্তা মুহম্মদ খান সূর (তিনি বাংলায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সুলতান শামস্ আল-দীন মুহম্মদ শাহ্ গাযী উপাধি গ্রহণ করে উত্তর ভারতে স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন), ইব্রাহিম খান সূর এবং আহমদ খান সূর (তাঁরা দু'জনেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং আফগান সিংহাসন দখলের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন)[২৬]। আদিল যখন এ সকল বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত তখন সুজাত খান সূরের পুত্র বাজ বাহাদুর মালবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন[২৭]। এরূপ পরিস্থিতিতে আদিল তাঁর সেনাপতি হিমুর সাহায্যে প্রথমে তাজ খান কারারানীকে ছাপরামওয়ে (CHAPPRAMAU) পরাজিত করেন। তাজ খান পরাজিত হয়ে অন্যান্য আফগান ও তাঁর ভ্রাতাদের সাথে মিলিত হয়ে দক্ষিণ বিহারে স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন[২৮]। আদিল ও হিমু দক্ষিণ বিহারের কারারানীদেরকে পুনরায় দমনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। প্রায় এ সময় ইব্রাহিম খান সূর,আদিলের সেনাপতি ঈসা খান নিয়াজীকে পরাস্ত করে দিল্লী, আগ্রা, এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহ দখল করে নেন। আদিল ও হিমু দিল্লী ও আগ্রা পুনরধিকারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন এবং চুনারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইব্রাহিম খান সূর ইব্রাহিম শাহ উপাধি ধারণ করে নিজ নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রাংকন করেন[২৯]। অন্যদিকে আহমদ খান সূর পাঞ্জাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করে

Dhaka University Institutional Repository

সিকান্দর শাহ্ উপাধি ধারণ করেন এবং দিল্লী ও আগ্রার দিকে অগ্রসর হন। ১৫৫৪ খ্রীস্টাব্দের শেষ দিক ফাররাহ (FARRAH) নামক স্থানে সিকান্দর শাহ্ ইব্রাহিম শাহকে পরাস্ত করে দিল্লী ও আগ্রা দখল করেন এবং সম্বল থেকে ইটাওয়া (ETAWA) পর্যন্ত ইব্রাহিম শাহের পশ্চাদ্ধাবন করেন। এ সময় সিকান্দর শাহ্ মুঘল বাদশাহ্ হুমায়ূন কর্তৃক লাহোর দখলের সংবাদ পান[২৮]।

ইব্রাহিম শাহ্ নতুন সৈন্য বাহিনী সংগ্রহ করে কালপির দিকে অগ্রসর হন। প্রায় এ সময় আদিল তাঁর উযীর ও সেনাপতি হিমুকে চুনার থেকে আগ্রা ও দিল্লী পুনরধিকারের জন্য প্রেরণ করেন। হিমু কালপি পৌঁছে প্রথমে ইব্রাহিম শাহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন[২৯]। হিমু এক যুদ্ধে ইব্রাহিমকে পরাস্ত করে তার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং বিয়ানার সীমান্তে পুনরায় এক যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ইব্রাহিম বিয়ানার দুর্গে আশ্রয় নেন। তিন মাস পর্যন্ত হিমু ঐ দুর্গ অবরোধ করে রাখেন[৩০]।

অন্যদিকে হিমু যখন বিয়ানায় ছিলেন তখন বাংলার মুহম্মদ খান সূর জৌনপুর দখল করেন এবং কালপি ও আগ্রার দিকে যাত্রা করেন। এ অবস্থায় আদিলের নির্দেশে হিমু বিয়ানা ত্যাগ করে কালপির দিকে অগ্রসর হলে ইব্রাহিম শাহ্ও তাঁকে অনুসরণ করেন এবং মান্দাগড় নামক স্থানে পিছন থেকে হিমুকে আক্রমণ করেন। কিন্তু হিমুর নিকট পরাস্ত হয়ে তিনি প্রথমে আলোয়ার এবং পরে পাটনার দিকে চলে যান[৩১]। এ বিজয়ের পর হিমু ছপ্পরঘাটায় আদিলের সাথে মিলিত হয়ে ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এক যুদ্ধে মুহম্মদ খান সূরকে পরাজিত ও হত্যা করে বাংলা দখল করে নেন এবং শাহ্বায খানকে বাংলার শাসন কর্তা নিযুক্ত করেন[৩২]। অন্যদিকে মুহম্মদ খান সূরের অমাত্যরা এলাহাবাদের অপরদিকে ঝুসী নামক স্থানে তাঁর পুত্র খিযির খানকে গিয়াস আল-দীন বাহাদুর শাহ্ উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসান। বাহাদুর শাহ্ শাহ্বায খানকে পরাজিত করে গৌড় দখল করেন[৩৩]।

আদিল শাহ্ যখন ইব্রাহিম শাহ্ এবং মুহম্মদ খান সূরের সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন তখন হুমায়ূন দিল্লী ও আগ্রা দখল করে নেন। আফগান সুলতান ইসলাম শাহের জীবদ্দশায় হুমায়ূন ভারত আক্রমণের সাহস না করলেও ইসলাম শাহের মৃত্যুর সংবাদ, আদিলের দুর্বল শাসন এবং আফগানদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল তাঁকে হৃত সিংহাসন পুনরধিকারে উৎসাহিত করে। ১৫৫৪ খ্রীস্টাব্দের ১২ই নভেম্বর

Dhaka University Institutional Repository

হুমায়ূন কাবুল থেকে ভারত আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন। আফগানরা গৃহযুদ্ধে লিপ্ত থাকার কারণে উত্তর - পশ্চিম সীমান্তের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অবহেলা প্রদর্শন করে। এ সুযোগে হুমায়ূন বিনা বাধায় সিন্ধু অতিক্রম করে রোহ্‌তাস দুর্গ আক্রমণ করেন এবং এর পর ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী মুঘলরা আফগানদেরকে বিতাড়িত করে লাহোর দখল করে নেয়। দিপালপুর থেকেও আফগান সেনানায়ক শাহ্‌বায খান এবং নাসির খান ভয়ে পলায়ন করে। অবশেষে ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দের ২২ শে জুন সিরহিন্দের যুদ্ধে সিকান্দর শাহ্‌ হুমায়ূনের নিকট পরাজিত হয়ে সিওয়ালিক পাহাড়ের দিকে পলায়ন করলে হুমায়ূন ২০শে জুলাই রাজধানী দিল্লীতে পুনরায় প্রবেশ করেন[৩৪]। অতঃপর হুমায়ূন আগ্রা ও আগ্রার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো দখল করে নেন। হুমায়ূনের সেনাপতি হায়দার মুহম্মদ খান আতকা বিয়ানা অবরোধ করলে ইব্রাহিম শাহের পিতা গাযী খান সূর আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁকে হত্যা করা হয়। এর কিছুকাল পর ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী মুঘল বাদশাহ্‌ হুমায়ূন মৃত্যুবরণ করেন। ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী হুমায়ূনের পুত্র আকবরকে পাঞ্জাবের কালানৌর নামক স্থানে হুমায়ূনের স্থলাভিষিক্ত করা হয়[৩৫]।

বাদশাহ্‌ আকবর এমন এক সময় মুঘল নেতৃত্ব গ্রহণ করেন যখন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল বিশৃংখলাপূর্ণ এবং তখনও ভারতে মুঘল কর্তৃত্বের ভবিষ্যত ছিল অনিশ্চিত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বাধীন রাজ্য সমূহের প্রত্যেকটিই এসময় ক্ষমতার লড়াইয়ে ব্যস্ত ছিল। এ সময় উত্তর -পশ্চিম দিকে কাবুল ছিল আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মীর্যা মুহম্মদ হাকীমের শাসনাধীন । উত্তর দিকে কাশ্মীরে স্থানীয় মুসলিম বংশীয়দের শাসন ছিল এবং হিমালয়ান রাজ্যগুলোও স্বাধীন ছিল। আফগান সুলতান শের শাহের মৃত্যুর পরেই সিন্ধু ও মুলতান দিল্লীর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। উড়িষ্যা, মালব এবং গুজরাটও এসময় দিল্লীর নিয়ন্ত্রণমুক্ত ছিল। গন্ডোয়ানার স্থানীয় প্রধানরাও স্বধীন ছিল। বিন্ধ্য পর্বতমালার দক্ষিণে বিজয়নগর রাজ্য ও খান্দেশ, বেরার, বিদর, আহমদনগর ও গোলকুন্ডার মুসলিম রাজ্য দু'টিও স্বাধীন ছিল এবং উত্তর ভারতীয় রাজনীতির প্রতি তাদের কোন আগ্রহ ছিল না । সর্বোপরি এ সময় গোয়া এবং দিউতে পর্তুগীজ প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। হুমায়ূন তাঁর মৃত্যুর পূর্বে হৃতরাজ্যের অতি সামান্য অংশই পুনর্দখল করতে সক্ষম হন। তখনও শের শাহের সাম্রাজ্যের বৃহদাংশ সূর আফগানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল[৩৬]। আকবরের নেতৃত্বেই মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বের সর্বশেষ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং

Dhaka University Institutional Repository

আকবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যকে নিরাপদ বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন । যাহোক, হুমায়ূনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আদিল শাহ্ দিল্লী ও আগ্রা দখলের উদ্দেশ্যে হিমুকে প্রেরণ করেন এবং নিজে চুনারে অবস্থান করেন । হিমু ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মুঘলদেরকে বিতাড়িত করে দিল্লী পুনর্দখল করেন[৩৭] । কিন্তু ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দের ৫ই নভেম্বর পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধে মুঘলরা হিমুর নেতৃত্বাধীন আফগান বাহিনীকে পরাজিত করে এবং হিমু আহত অবস্থায় বন্দী হন এবং বৈরাম খান কর্তৃক নিহত হন[৩৮] । পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধ ছিল একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ এবং ইহা ভারতে মুঘল - আফগান কর্তৃত্বের দ্বন্দ্বকে পরিসমাপ্তির দিকে ধাবিত করে ।

হিমুর মৃত্যুতে আদিল শাহ্ অসহায় হয়ে পড়েন । অন্যদিকে এ যুদ্ধে আফগান বাহিনী পরাজিত হওয়ার ফলে পাঞ্জাব থেকে আগ্রা পর্যন্ত এলাকা আফগানদের হস্তচ্যুত হলেও তখনও ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের কর্তৃত্ব আফগানদের হাতেই ছিল[৩৯] । কিন্তু আফগানরা তাদের অভ্যন্তরীণ দলাদলির কারণে ভারতে তাদের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতি নজর দিতে পারেনি । এ চরম দুর্দশার দিনেও তারা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখে এবং নিজেরাই নিজেদের কবর রচনা করে । একদিকে কিছু সংখ্যক আফগান প্রধান এককভাবে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় ও পরাজয়বরণ করে, অন্যদিকে অন্যান্য আফগানরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে এবং স্বজাতীয়দের পরাজয়ের মধ্যে নিজের লাভ সন্ধান করে । যাহোক, যখন আদিল শাহের সেনাপতি হিমু পানিপথের যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তখন বাংলার গিয়াস আল - দীন বাহাদুর শাহ্ বিহার দখল করেন এবং পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আদিল শাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন । বাহাদুর শাহ্ দক্ষিণ বিহারের সুলায়মান কাররানীর সহায়তায় ১৫৫৭ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে সুরুজগড়ের অদূরে ফতেহ্পুর নামক স্থানে আদিল শাহ্কে পরাজিত ও হত্যা করেন[৪০] । আফগানদের এ গৃহ-যুদ্ধ আকবরের সৌভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায় । কেননা আকবরের আফগান শত্রুরা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে এবং একে অপরকে হত্যা করে উত্তর ভারতে মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দেয় । ১৫৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে জুলাই পাঞ্জাবের সিকান্দর খান সুর মুঘল বাদশাহ্ আকবরের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় । এছাড়া মুঘল বাহিনী হাজী খানকে বিতাড়িত করে আলোয়ার ও মেওয়াট দখল করে নেয় । অন্যদিকে একই বছরে মুঘল সেনাপতি খান-ই-যামান সম্বল থেকে রুকন খান নুহানীকে

Dhaka University Institutional Repository

বিতাড়িত করেন এবং লখনৌর নিকটে জালাল খান সূর নামক অন্য একজন আফগান প্রধানকে পরাজিত করেন। এর ফলে আফগানদেরকে সম্বল থেকে লখনৌ পর্যন্ত এলাকা মুঘলদের নিকট ছেড়ে দিতে হয়[৪১]। ১৫৫৮ খ্রীস্টাব্দে খান-ই-যামান ইব্রাহিম শাহ্কে পরাজিত করে জৌনপুর দখল করেন। পরাজিত হয়ে ইব্রাহিম শাহ্ উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। একই বছরে বাংলার গিয়াস আল-দীন বাহাদুর শাহ্ মুঘলদেরকে উত্তর ভারত থেকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে জৌনপুরের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু খান- ই- যামানের নিকট পরাজিত হয়ে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন[৪২]।

অন্যান্য আফগান প্রধানরা তখনও উত্তর- ভারত পুনরধিকারের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। আদিলের পক্ষীয় লোকজন তাঁর পুত্র শের খানকে (২য় শের শাহ্) চুনারের সিংহাসনে বসান এবং ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মুঘলদের নিকট থেকে জৌনপুর পুনর্দখলের জন্য অগ্রসর হয়। প্রথম দিকে আফগানরা মুঘল সেনাপতি খান-ই-যামানকে এক যুদ্ধে পরাস্ত করতে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত মুঘলদের নিকট পরাজিত হয় এবং শের খান নির্জনবাসী হন। অন্যদিকে চুনারে আফগান কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব মনে করে আদিল শাহের এক অমাত্য ফত্তুখান মসনদ - আলী মুঘল সেনাপতি আসফ খানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং বাদশাহ্ আকবরের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন[৪৩]। এছাড়া আদিলের অমাত্যরা যখন দ্বিতীয় শের শাহ্কে চুনারের সিংহাসনে বসান তখন ইসলাম শাহের পরিবারের সমর্থকরা তাঁর পুত্র আওয়াজ খানকে রোহ্তাসে তাঁদের বাদশাহ্ মনোনীত করেন। মুঘল সেনানায়ক খান-ই-যামান ও ২য় শের শাহের মধ্যকার সংঘর্ষের সুযোগ গ্রহণ করে তাঁরা মুঘল অধিকৃত কিছু অঞ্চল দখল করে নেন। অতপর ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দে ২য় শের শাহের পরাজয়ের পর তাঁরা জৌনপুরের দিকে অগ্রসর হন। আন্ধিয়ারী (ANDHIARI) নামক স্থানে আফগান বাহিনী মুঘল সেনানায়ক খান- ই- যামানের একটি সৈন্য দলকে পরাস্ত করতে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত আফগানরা এই বিজয় ধরে রাখতে পারেনি। আওয়াজ খানের নেতৃত্বেই আফগানরা হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের শেষ চেষ্টা করেছিল। এর পর আফগানরা মুঘলদের বিরুদ্ধে কোনরূপ নিয়মাবদ্ধ আক্রমণ চালনা থেকে নিবৃত্ত থাকে এবং তারা ভারতে তখনও তাদের যেটুকু অধিকার ছিল তা সংরক্ষণে মনোনিবেশ করে[৪৪]। কিন্তু মুঘল বাদশাহ্ আকবরের উদ্দেশ্য হচ্ছে আফগানদেরকে সম্পূর্ণরূপে ভারত থেকে বিতাড়িত করা। যাহোক, ১৫৬১-১৫৬২ খ্রীস্টাব্দে

Dhaka University Institutional Repository

বাজ বাহাদুরকে পরাজিত করে মুঘলরা মালব দখল করে নেয়[৪৫]। এই ভাবে আকবর আফগানদের আত্মকলহের সুযোগ নিয়ে বাংলা ও বিহার ব্যতীত প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারত আফগানদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেন। আকবর তাঁর শক্তিশালী প্রতিপক্ষ আফগানদেরকে উত্তর -ভারত থেকে বিতাড়নের মাধ্যমে ভারতে অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হন এবং রাজপুতদেরকে পরাজিত করে চিতোর, রণথম্ভোর[৪৬] ও অন্যান্য অঞ্চল দখল করে নেন। এছাড়া ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দে ৩য় মুজফফর শাহ্‌কে পরাজিত করে আকবর গুজরাটেও তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন[৪৭]।

আফগানরা উত্তর ভারত থেকে বিতাড়িত হলেও তখনও পূর্ব ভারতে তাদের কর্তৃত্ব অটুট ছিল। মুঘল বাদশাহ্‌ আকবর তাঁর রাজত্বের প্রথম থেকেই আফগানদেরকে পূর্ব ভারত তথা বাংলা ও বিহার থেকে বিতাড়নে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দে আফগান শাসক সুলায়মান কাররানীর মৃত্যুর পূর্বে তিনি বাংলা ও বিহার আক্রমণ করেননি। যাহোক, বাংলার আফগান সুলতান গিয়াস আল-দীন বাহাদুর শাহ্‌ ১৫৫৮ খ্রীস্টাব্দে মুঘলদের নিকট থেকে জৌনপুর দখল করতে ব্যর্থ হয়ে বাংলা ও বিহার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন। ১৫৬০ খ্রীস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। গিয়াস আল-দীন বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা গিয়াস আল -দীন জালাল শাহ্‌ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। ১৫৬৩ খ্রীস্টাব্দে জালাল শাহ্‌ মৃত্যুবরণ করলে তাঁর এক পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু সাতমাস নয় দিন রাজত্ব করার পর এক জবর দখলকারী তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেন। এ জবর দখলকারী গিয়াস আল-দীন উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু এ গিয়াস আল-দীন এক বছর এগার দিন রাজত্ব করার পর তাজ খান কাররানী তাঁকে হত্যা করে বাংলায় কাররানী বংশের শাসনের প্রতিষ্ঠা করেন।

তাজ খান কাররানী ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কয়েক মাস রাজত্ব করার পর ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাজখানের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা ও বিহারের শাসন কর্তা সুলায়মান কাররানী গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুঘল বাদশাহ্‌ হুমায়ুন কর্তৃক দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধার এবং হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবর কর্তৃক উত্তরোত্তর সাম্রাজ্য বিস্তারের মুখে আফগান শক্তি যখন দিন দিন ক্ষয় হতে থাকে তখন বাংলা ও বিহারে সুলায়মান কাররানীই আফগান শক্তির ধারক ও বাহক হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

উঠেন। উত্তর - ভারতে মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে পরাজিত আফগানরা বাংলা- বিহারের দিকে ছুটে আসে এবং সুলায়মান কারারানীর চাকুরী গ্রহণ করতে থাকে । ফলে দিন দিন তাঁর শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুলায়মান কারারানীর অধীনে ৩৬০০ হাতী, ৪০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ১৪,০০০ পদাতিক সৈন্য এবং ২০, ০০০ কামান ছিল[৪৮]। তিনি অন্যান্য আফগানদের মতো উগ্র ছিলেন না এবং পররাষ্ট্র নীতিতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। দিল্লীতে মুঘল সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনি অনুধাবন করেন যে, বিবদমান এবং উগ্র মস্তিষ্ক সম্পন্ন আফগানদের পক্ষে মুঘলদের বিরুদ্ধে টিকে থাকা সম্ভব নয়। তাই তিনি মুঘলদের সাথে সংঘর্ষে না জড়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সময় সময় উপহার সামগ্রী পাঠিয়ে তিনি মুঘল বাদশাহ্ আকবরের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করেন[৪৯]। বাংলা ও বিহারের সার্বভৌম নরপতি হওয়া সত্ত্বেও তিনি সুলতান উপাধি ধারণ করেননি। সুলায়মান কারারানী শুধুমাত্র আফগান অমাত্যদের মতো হযরত - ই- আলা উপাধি ধারণ করেন। এমনকি জৌনপুরের মুঘল শাসন কর্তা খান-ই-যামানের সাথেও তিনি সদ্ভাব বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। এভাবেই সুলায়মান কারারানী মুঘল বাদশাহ্ আকবরের সম্প্রসারণ নীতির ছোবল থেকে বাংলা ও বিহারকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হন। তাঁর জীবদ্দশায় আকবর বাংলা ও বিহার বিজয়ের চেষ্টা করেন নি[৫০]। সুলায়মান কারারানীর রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ১৫৬৭ খ্রীস্টাব্দে উড়িষ্যা বিজয়। কেননা ইতোপূর্বে কোন মুসলিম শাসকই উড়িষ্যা জয় করতে পারেন নি[৫১]। এমন কি ১৫৬৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি কুচবিহার আক্রমণ করেন। কিন্তু সুলায়মান কারারানী অনুধাবন করেন যে, সম্প্রসারণশীল মুঘল সাম্রাজ্য এবং শক্তিশালী মুঘল বাদশাহ্ আকবরের সাথেই অনিবার্যভাবে তাঁর শক্তি পরীক্ষা হতে পারে। সুতরাং পিছনে শত্রু রাখাকে তিনি নিরাপদ মনে করেন নি এবং এ জন্যই তিনি কুচবিহারের রাজার সাথে বিরোধ মিটিয়ে ফেলেন এবং মৈত্রী স্থাপন করেন[৫২]।

প্রায় সাত বছর সফলতার সথে রাজত্ব করার পর ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দের ১১ই অক্টোবর তারিখে সুলায়মান কারারানী মৃত্যুবরণ করেন[৫৩]। তাঁর এ সফলতার পশ্চাতে কতিপয় কারণ ছিল। প্রথমতঃ এ সময় উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারতে স্বীয় অবস্থান দৃঢ়ীকরণে ব্যস্ত থাকায় মুঘল বাদশাহ্ আকবর বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যার দিকে নজর দিতে পারেন নি। দ্বিতীয়তঃ পূর্বের আলোচনায় দেখা গেছে যে, উত্তর ভারতে মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে অনেক আফগান

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান ও অভিজাতবৃন্দ বাংলা ও বিহারে এসে স্বগোত্রীয়দের সাথে যোগদান করেন। তাদের সহায়তায় সুলায়মান কারারানী একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠনে সক্ষম হন। তৃতীয়তঃ তিনি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন এবং লোদী খান নামক তাঁর একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন উযীর ছিল। এই উযীর তাঁকে যথাযথ পরামর্শ দান করতেন। চতুর্থতঃ সুলায়মান কারারানী অত্যন্ত সতর্ক ও হুঁশিয়ার লোক ছিলেন। তাই কোনরূপ রাজচিহ্নাদি ধারণ করে আকবরের রোষানলে পড়েননি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের হঠকারীতা,অযোগ্যতা ও অদূরদর্শিতার কারণে আফগানরা পুনরায় দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং আফগান রাজ্যে বিশৃংখলা দেখা দেয়। এ বিশৃংখলার সুযোগ নিয়ে মুঘলরা বাংলা আক্রমণ করে এবং ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মার্চ তুকারায়ের যুদ্ধে সুলায়মান কারারানীর দ্বিতীয় পুত্র দায়ূদ খান কারারানীকে পরাজিত করে[২৪]। দায়ূদ যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে কটকের দিকে পলায়ন করেন। কটকে পৌঁছে দায়ূদ প্রথমে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেও শেষ পর্যন্ত মুঘল সেনানায়ক মুনিম খান খান-ই-খানানের সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হন। চুক্তি অনুযায়ী দায়ূদ খান কারারানী মুঘল বাদশাহ্ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং মুঘল সামন্ত হিসেবে উড়িষ্যা শাসনের ভারপ্রাপ্ত হন। ইতিহাসে ইহা কটকের চুক্তি নামে পরিচিত[২৫]।

দায়ূদখান কারারানী মুঘলদের সাথে কটকের চুক্তি স্বাক্ষর করলেও অন্যান্য আফগানরা এ চুক্তি গ্রহণ করেনি। আফগানরা বিহার, ঝাড়খন্ড, ঘোড়াঘাট, গৌড় ইত্যাদি এলাকায় মুঘলদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আফগানদের উপর দায়ূদের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিলনা; অন্যদিকে মুনিম খান যে উদ্দেশ্যে দায়ূদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন, তা সম্পূর্নরূপে ব্যর্থ হয়[২৬]। যাহোক, মুনিম খান ঘোড়াঘাটের আফগানদেরকে দমনে সুবিধা হবে চিন্তা করে রাজধানী তাঁড়া থেকে গৌড়ে স্থানান্তর করেন[২৭]। গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরের ঠিক একমাস পরে দূষিত আবহাওয়ার কারণে গৌড়ে মহামারী দেখা দেয়। মহামারীর কবলে পড়ে অনেক মুঘল সৈন্য মারা যায়। তখন মুনিম খান তাঁর অনুচরদেরকে তাঁড়ায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি তাঁড়ায় প্রবেশ করতে পারেননি। তাঁড়ার উপকণ্ঠেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দের ২৩ শে অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন[২৮]। মুনিম খানের মৃত্যুর পর মুঘলরা যখন তাদের নতুন নেতা নির্বাচনে ব্যস্ত তখন দায়ূদ খান কারারানী কটকের চুক্তি ভঙ্গ করে মুঘলদের উপর আক্রমণ চালান। তিনি ভদ্রকের মুঘল সেনাপতি নজর

Dhaka University Institutional Repository

বাহাদুরকে হত্যা করেন। অন্যদিকে জালেশ্বরের মুঘল সেনাপতি মুরাদ খান ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বিনা যুদ্ধেই তাঁড়ায় পলায়ন করেন । এইরূপ বিশৃংখলাপূর্ণ পরিস্থিতিতে ঈসা খান পূর্ব বাংলা থেকে মুঘল নৌ-সেনাপতি শাহ্ বর্দীকে বিতাড়িত করেন[১৯]। এখানেই সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থ আবুল ফযলের আকবরনামায় আলোচ্য ব্যক্তিত্ব ঈসা খান মসনদ-ই-আলা'র প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। বলা যায় যে, তখন থেকেই বাংলার স্বাধীনতা রক্ষায় ঈসা খানের মুঘল বিরোধী সংগ্রামী জীবনের শুভ সূচনা হয়।

তথ্য নির্দেশ

১। ১৪০১ খ্রীস্টাব্দে গুজরাটের শাসনকর্তা জাফর খান দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। An Advanced History of India ; R.C. Majumdar, H.C, Ray Chaudhuri, Kalikinkar Datta, Second Edition (With Corrections), London, 1965. পৃষ্ঠা ঃ ৩৫১, (পরবর্তীতে Ad. Hist. হিসেবে উল্লিখিত)।

২। ১৪০১ খ্রীস্টাব্দে মালবের শাসনকর্তা দিলাওয়ার খান ঘুরী দিল্লীর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে কার্যতঃ স্বাধীন হয়ে যান। প্রাগুক্ত, পৃঃ৩৪৮।

৩। ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দে তায়মুরলঙের ভারত আক্রমণের ফলে ভারতীয় রাজ নীতিতে যে বিশৃংখল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়,সে পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে খাজা জাহান দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করে জৌনপুরে এক স্বাধীন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ "শর্কীরাজবংশ" নামে পরিচিত। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৬ এবং ৩৪৭।

৪। ১৩৪২ খ্রীস্টাব্দে লখনৌতি, ১৩৪৬ খ্রীস্টাব্দে সাতগাঁও এবং ১৩৫২ খ্রীস্টাব্দে সোনারগাঁও দখল করে শামস্ আল-দীন ইলিয়াস শাহ্ বাংলায় এক স্বাধীন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। আবদুল করিম ঃ বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৮৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ ১৫২ এবং ১৫৫, (পরবর্তীতে সুলতানী আমল হিসেবে উল্লিখিত)।

৫। সুলতান বাহ্লুল লোদী ১৪৫১ খ্রীস্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারতে আফগান সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। ১৪৮৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি জৌনপুরের শর্কী সুলতান হুসাইন শাহ্কে পরাজিত করে জৌনপুরকে দিল্লীর নিয়ন্ত্রণাধীনে

Dhaka University Institutional Repository

আনয়ন করেন। Abdul Halim : History of the Lodi Sultans of Delhi and Agra. University of Dacca, 1961, পৃঃ ১৮ এবং ৪৪-৪৫।

৬। Riyazu -s-Salatin by Ghulam Hussain Salim, Translated by Abdus Salam. Reprint Delhi, 1975, পৃঃ ১৩৪-১৩৫, (পরবর্তীতে রিয়ায হিসেবে উল্লিখিত)।

৭। Momtazur Rahman Tarafdar : Husain Shahi Bengal, First published , Dacca, 1965, পৃঃ ৩৮, (পরবর্তীতে Husain Shahi হিসেবে উল্লিখিত)।

৮। প্রাগুক্ত , পৃঃ ৩৮।

৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৮।

১০। মেওয়ারের রাণা সংগ্রাম সিংহ আশা করেছিলেন যে, বাবর দিল্লীর লোদী সালতানাতের ধ্বংস সাধন করে তায়মুরের ন্যায় ভারত ত্যাগ করে যাবেন । কিন্তু বাবর তা না করায় সংগ্রাম সিংহ ১২০ জন হিন্দু প্রধানের সহায়তায় ৮০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ও ৫০০ রণ-হস্তীর এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বাবরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন । Muhammad Mohar Ali: History of the Muslims of Bengal, Volume IA, First Edition, Riyadh, 1985, পৃঃ - ২১৭-২১৮, (পরবর্তীতে Muslims of Bengal হিসেবে উল্লিখিত)।

১১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৮।

১২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৮।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৮।

১৪। Ad. Hist., পৃঃ ৪২৯।

১৫। Muslims of Bengal , পৃঃ ২১৮।

১৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৮।

১৭। প্রাগুক্ত, Ad. Hist., পৃঃ ৪৩৩ এবং Husain Shahi, পৃঃ ৭৬।

১৮। The History of Bengal volume II, Edited by Sir Jadu-Nath Sarkar, Dacca University, Third Impression August 1976, পৃঃ ১৫৭, (পরবর্তীতে H. Bengal হিসেবে উল্লিখিত), এবং সুলতানী আমল, পৃঃ ৩২৮।

১৯। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন The Tarikh - i - Sher Shahi (of Abbas Khan Sarwani) Vol. II, Translated by S.M. Imamuddin, University of Dacca, 1964, পৃঃ ৪৪-৭৮ (পরবর্তীতে তারীখ হিসেবে উল্লিখিত) এবং Muslims of Bengal, পৃঃ ২২৩-২২৪ এবং ২২৮। আব্বাস খান সরওয়ানী শের

Dhaka University Institutional Repository

শাহের সুরুজগড়ের যুদ্ধে জয়লাভ এবং গৌড় দখলের কোন সন উল্লেখ করেন নি।

২০। তারীখ, পৃঃ ৮১-৮২ এবং Muslims of Bengal, পৃঃ ২২৮।

২১। সুলতানী আমল,পৃঃ ৩৬১।

২২। মুঘলদের বিরুদ্ধে শের শাহের যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং শের শাহ ও হুমায়ুনের মধ্যকার যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন তারীখ, পৃঃ ৯০-১১৬ এবং সুলতানী আমল, পৃঃ ৩৬২-৩৬৪।

২৩। সুলতানী আমল, পৃঃ ৩৬৮।

২৪। Muhammad Abdur Rahim : The History of The Afghans in India, First Edition, Karachi, 1961, পৃঃ ১২০-১২১ (পরবর্তীতে The Afghans হিসেবে উল্লিখিত)।

২৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২১।

২৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২১।

২৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২২।

২৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২২-২৪।

২৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৪।

৩০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৪।

৩১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৪।

৩২। Muslims of Bengal, পৃঃ ২৪১ এবং The Afghans, পৃঃ ১২৪-১২৫।

৩৩। সুলতানী আমল, পৃঃ ৩৬৯।

৩৪। The Afghans, পৃঃ ১২৫-১২৬।

৩৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৬-২৭।

৩৬। Ad. Hist,পৃঃ ৪৪৫।

৩৭। The Afghans, পৃঃ ১২৭।

৩৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১-১৩৩।

৩৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৪।

৪০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৪, সুলতানী আমল, পৃঃ ৩৬৯ এবং Muslims of Bengal, পৃঃ ২৪১-২৪২।

৪১। The Afghans, পৃঃ ১৩৫-১৩৬।

৪২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৬।

৪৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৬-১৩৭।

৪৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৭-১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

৪৫। Ad. Hist.পৃঃ ৩৫০।

৪৬। মুঘলরা ১৫৬৭-৬৮ খ্রীস্টাব্দে চিতোর এবং ১৫৬৯ খ্রীস্টাব্দে রণথম্ভোর দখল করে নেয়। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪৯-৪৫০।

৪৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৫৩ এবং ৪৫১।

৪৮। The Afghans, পৃঃ ১৬৭ - ১৬৮, ১৭৩-১৭৪ এবং সুলতানী আমল, পৃঃ ৩৭০-৩৭১।

৪৯। সুলতানী আমল, পৃঃ ৩৭২।

৫০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭২।

৫১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭২।

৫২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৩।

৫৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৩।

৫৪। Akbarnama (Abul Fazl), Translated by H, Beveridge, Vol. III, Second Indian Reprint, Delhi, 1977, পৃঃ ১৭৪-১৭৫ (পরবর্তীতে আকবরনামা ৩য় হিসেবে উল্লিখিত)।

৫৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮২-১৮৫, Iqtidar Alam Khan : The Political Biography of A Mughal Noble : Munim Khan Khan - i- Khanan 1497-1575, Aligarh Muslim University, 1973, পৃঃ ১৪৩-১৪৪ (পরবর্তীতে Iqtidar Alam হিসেবে উল্লিখিত).The Afghans, পৃঃ ২০২ এবং সুলতানী আমল, পৃঃ৩৮২।

৫৬। সুলতানী আমল, পৃঃ ৩৮২।

৫৭। আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ২২৬ এবং Iqtidar Alam, পৃঃ ১৪৫।

৫৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৬-২২৭, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৬ এবং The Afghans,পৃঃ ২০৩-২০৪।

৫৯। আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ২২৬ এবং ২২৮।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ঈসা খানের বংশ পরিচয়

সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মুঘল বাদশাহ্ আকবরকে বিভিন্ন প্রদেশের মুঘল-অধীনতা অস্বীকারকারীদের বিচিত্র বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের সন্মুখীন হতে হয়েছিল। বাদশাহ্ আকবরের প্রিয়পাত্র এবং দরবারী ঐতিহাসিক আবুল ফযল প্রণীত আকবরনামা-এর বরাত দিয়ে এক গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, আকবরের সুদীর্ঘ শাসনামলে মুঘল বিরোধী ১৪৪টি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়[১]। তন্মধ্যে ৮০টি বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করেছিল দূরবর্তী প্রদেশের সর্দারগণ[২]। গুজরাট, বাংলা, আফগানিস্তান ও কাশ্মীরে মুঘলরা বিদ্রোহীগণ কর্তৃক বেশ নিস্তানাবুদ হয়েছিল। আকবর বিদ্রোহীদের দমনে গুজরাট আফগানিস্তান ও কাশ্মীরে যতটা সফল হয়েছিলেন বাংলায় ততটা সফল হননি[৩]। বাংলায় মুঘলদেরকে ঈসা খান মসনদ-ই-আলার বলিষ্ঠ নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন আফগান সর্দার ও ভূঁঞা - জমিদারদের তেজস্বী এবং অভূতপূর্ব প্রতিরোধের সন্মুখীন হতে হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে আকবরের পক্ষে তাঁর জীবদ্দশায় বাংলায় সুদৃঢ় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি[৪]।

আকবরের শাসনামলে পূর্ব বাংলার ঈসা খান মসনদ-ই- আলা ছিলেন একমাত্র মুকুট ধারী ভূঁঞা - নেতা, যিনি মুঘল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ঈসা খান তাঁর সীমিত শক্তি দ্বারা প্রায় সিকি শতাব্দী ব্যাপী বাংলায় মুঘল আগ্রাসন বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম কার্যকরভাবে অব্যাহত রাখেন। তিনি মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রাণপণ শক্তিতে লড়াই করেন এবং তাদেরকে অশেষ ঝঞ্ঝাটে ফেলেন। স্বদেশ ভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় তাঁর গৌরবময় ভূমিকার উজ্জ্বলদীপ্তি সমসাময়িক ব্যক্তিদের চক্ষুবিস্ফারিত করে এবং জীবদ্দশাতেই তাঁকে কিংবদন্তির নায়কে পরিণত করে। কিন্তু এ ক্ষণজন্মা বীরপুরুষের বংশ পরিচয়, বাল্যজীবন, এবং কর্মময় সংগ্রামী জীবন ইতিহাস এখনও তমসাচ্ছন্ন।

ইহা সর্বজনবিদিত যে, মুসলিমগণ ইতিহাস-সচেতন জাতি। মুসলিমগণই সর্বপ্রথম ভারত উপমহাদেশে ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার প্রচলন ঘটায়। দিল্লীর সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় অথবা পৃষ্ঠপোষণ ব্যতিরেকেই সমসাময়িক কালে অনেক ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়। প্রায় প্রত্যেক মুঘল বাদশাহ্ই

Dhaka University Institutional Repository

সরকারীভাবে ঐতিহাসিক নিযুক্ত করে নিজ - নিজ সময়ের ইতিহাস রচনার রীতির প্রচলন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন সমসাময়িক ঐতিহাসিক বাংলার মুসলিম শাসনের ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে যান নি। ফলশ্রুতিতে, বাংলার স্বাধীন সুলতান ও ভূঁঞা - জমিদারদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস অনেকাংশেই অস্পষ্ট রয়ে যায়। তাই বাংলার স্বাধীন সুলতান এবং ভূঁঞা- জমিদারদের ইতিহাস আলোচনার জন্য দিল্লী এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে লিখিত বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থের উপর বহুলাংশেই নির্ভরশীল হতে হয়। অনুরূপভাবে বার-ভূঁঞা নেতা ঈসা খানের জীবন ইতিহাস আলোচনার প্রধান অবলম্বন হচ্ছে মুঘল ঐতিহাসিক আবুল ফযল রচিত আকবরনামা ও আইন -ই-আকবরী। আবুল ফযল আকবর নামায় ঈসা খানের পিতৃপরিচয়, তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরিত মুঘল অভিযান, মুঘল অভিযানের বিরুদ্ধে ঈসা খানের নেতৃত্বে ভূঁঞাদের গৃহীত প্রতিরোধ ব্যবস্থা, ঈসা খানের মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। আবুল ফযলের বিবরণ অনেক ক্ষেত্রেই পক্ষপাতপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তৎপ্রণীত উপরোক্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থদ্বয়ই ঈসা খানের জীবন ইতিহাস আলোচনার জন্য একমাত্র সমসাময়িক দলিল। এতদভিন্ন, দেশে প্রচলিত বিভিন্ন লোকগীতি, গাথা বা কিংবদন্তিতে ঈসা খান সম্পর্কে সত্য -মিথ্যায় পরিপূর্ণ অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ী ও হায়বত নগর এ বসবাসকারী ঈসা খানের বংশধররা ঈসা খানের ইতিহাস উদ্ধারের জন্য উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল বলে জানা যায়। এরই ফলশ্রুতিতে ঈসা খানের দিওয়ান উপাধিধারী বংশধর শোভন দাদ খান ও আজিম দাদ খানের নির্দেশে মুন্সি রাজ চন্দ্র ঘোষ এবং পন্ডিত কালীকুমার চক্রবর্তী মসনদালি ইতিহাস নামে বাংলা ভাষায় এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করেন[৫]। কিন্তু এ জীবনী গ্রন্থ খানিতে বহুলাংশেই সত্যঘটনার চেয়ে কল্পকাহিনীই প্রাধান্য পেয়েছে[৬]। পূর্ব ভারতে আকবরের আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে ঈসা খানের বীরত্বপূর্ণ কর্মকান্ড এদেশের সাধারণ মানুষের মনোজগতে গভীর রেখাপাত করেছিল এবং এতে অনুপ্রাণিত হয়ে গ্রাম বাংলার পল্লী কবিরা ঈসা খানকে নিয়ে বিভিন্ন গাথা - সঙ্গীত রচনা করে। এমনি একটি গাথার সংবাদ 'প্রতিভা' পত্রিকার ১৩২৪, আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যায় ২৫২-২৫৯ পৃষ্ঠায় "বীরাঙ্গনা স্বর্ণময়ী" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুধাংশু শেখর মুখোপাধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশন করেছিলেন[৭]। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনও ময়মনসিংহ গীতিকার দ্বিতীয় খন্ড দ্বিতীয় সংখ্যায় "দেওয়ান ইশা খাঁ মসনদালি" নামে অনুরূপ একটি গাথা প্রকাশ করেন[৮]। এ ছাড়া ঈসা খান ও তাঁর বংশধরদের কীর্তি কাহিনী অবলম্বনে অজ্ঞাতনামা লেখক কর্তৃক রচিত আরো কয়েকটি পালা গানের সংবাদ পাওয়া যায়[৯]। কিন্তু পালাগান গুলোতে জনপ্রবাদের ঈসা খানকেই পাওয়া যায়, ইতিহাসের ঈসা খানকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আর এভাবেই জনপ্রবাদ ও কল্পকাহিনীর অন্তরালে ঈসা খানের প্রকৃত পরিচয় ঢাকা পড়ে যায়। যার ফলে ঈসা খানের প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা অধিকতর কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে। তবে উৎসুক এবং সত্য-সন্ধানী পন্ডিতগণ নিশ্চেষ্ট থাকেন নি। উনবিংশ শতকের শেষ অধ্যায় এবং বিংশ শতকের নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত অনেক স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ঈসা খানের জীবন ইতিহাস আলোচনা করেছেন এবং তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ বর্তমানে ঈসা খান সম্পর্কে বেশ কিছু জানা যায়। যে সকল ঐতিহাসিক ঈসা খানের ইতিহাস পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন জেম্‌স্ ওয়াইজ[১০], হেনরী ব্লখমান[১১], হেনরী বেভেরীজ[১২] এবং নলিনী কান্ত ভট্টশালী[১৩]। এদের মধ্যে ঈসা খানের ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে ভট্টশালী অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তবে ভট্টশালী অনেক ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর দেন নি বা এড়িয়ে গেছেন। সাম্প্রতিক কালের গবেষকদের মধ্যে অন্যতম আবদুল করিম তাঁর রচিত History of Bengal Mughal Period, Vol. I. এবং বাংলার ইতিহাস ঃ মোগল আমল প্রথম খন্ডে ঈসা খান সম্পর্কে অনেক মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন[১৪]। তিনি তাঁর এ গ্রন্থ দ্বয়ে ঈসা খান সম্পর্কিত রচনায় পূর্বোল্লিখিত ঐতিহাসিকদের গবেষণামূলক প্রবন্ধ এবং আকবর নামা, আইন - ই- আকবরী, রাজমালা[১৫] ইত্যাদি গ্রন্থ হতে উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু ঈসা খানের বংশ পরিচয় সংক্রান্ত অনেক ঐতিহাসিক প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর তিনি প্রদান করেন নি। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি ঈসা খানের বংশ পরিচয় ও বাল্য ইতিহাস সম্পর্কিত পূর্বোল্লিখিত ঐতিহাসিকদের বক্তব্য পুনঃনিরীক্ষণ ব্যতিরেকেই গ্রহণ করেছেন। এছাড়া তাঁর আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আকবর নামা ও আইন-ই-আকবরী ব্যবহারের ক্ষেত্রেও যথাযথ ধৈর্য প্রদর্শন করেন নি এবং রাজমালার বিভ্রান্তি থেকেও মুক্ত থাকতে পারেন নি। এতদসত্ত্বেও, ইহা অনস্বীকার্য যে, তাঁর মৌলিক গবেষণা এ প্রজন্মের গবেষকদের পথ বহুলাংশেই প্রশস্ত ও সুগম করেছে। যাহোক,বর্তমান গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে আকবর নামা, আইন-ই-আকবরী, অন্যান্য ঐতিহাসিক উৎস

Dhaka University Institutional Repository

এবং পূর্বোল্লিখিত ঐতিহাসিকদের গবেষণা কর্মের পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে ঈসা খানের বংশ পরিচয় সম্পর্কে যথাসম্ভব সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

উনবিংশ শতকের শেষপাদ থেকে বিংশ শতকের নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত অনেক ইউরোপীয় এবং বাংগালী ঐতিহাসিক বিভিন্ন সাময়িকী ও ইতিহাস গ্রন্থে বাংলার বার-ভূঁঞা এবং ভূঁঞা-নেতা ঈসা খান সম্পর্কে বেশ কিছু আলোকপাত করেছেন। তবে তাঁদের লিখিত প্রবন্ধ ও ইতিহাস গ্রন্থে পরিবেশিত ঈসা খানের বংশ পরিচয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। নিম্নে তাঁদের পরিবেশিত তথ্যাবলী কালক্রমানুযায়ী ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে সেগুলো আদর্শ ইতিহাসের আলোকে বিচারপূর্বক কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হলঃ

জেম্‌স্‌ ওয়াইজ সর্ব প্রথম বার-ভূঁঞার ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করেন এবং তিনি তাঁর প্রচেষ্টার ফল ১৮৭৪ সালে "On the Barah Bhuyas of Eastern Bengal" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে প্রকাশ করেন[১৬]। এ প্রবন্ধে জেম্‌স ওয়াইজ বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ী ও হায়বত নগরে বসবাসকারী ঈসা খানের বংশধরদের নিকট হতে এবং ব্লখমান অনূদিত আইন-ই-আকবরী প্রথম খন্ড থেকে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে ঈসা খান সম্পর্কে লিখেন যে, "The family tradition is , that during the reign of Husain Shah (1493 to 1520)[১৭], Kali Das Gajdani, a Bais Rajput of Audh, became a Muhammadan, and received the title of Sulaiman Khan. He afterwards married a daughter of the reigning monarch. He is said to have been killed in battle by Salim Khan and Taj Khan. He left three children, Isa, Ismail. and a daughter afterwards known as Shahinshah Bibi. Their father being slain, the two sons were taken prisoners and sold as slaves. They were subsequently traced to Turan, whence they were brought back by their uncle Qutb uddin .

Isa Khan is said to have married Fatimah Khatun, a cousin of his own, and grand - daughter of Husain Shah of Bengal".

জেম্‌স্‌ ওয়াইজের বিবরণ থেকে ঈসা খান সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী জানা যায়ঃ

ক) ঈসা খানের পিতা কালিদাস গজদানী ছিলেন অযোধ্যার বাঈস গোত্রীয় একজন রাজপুত।

Dhaka University Institutional Repository

খ) হুসাইন শাহের রাজত্বকালে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সুলায়মান খান নাম ধারণ করেন।

গ) পরবর্তীকালে তিনি ক্ষমতাসীন শাসকের (?) কন্যার পাণি গ্রহণ করেন।

ঘ) কথিত আছে যে, তিনি সেলিম খান ও তাজ খান কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হন।

ঙ) মৃত্যুকালে তিনি ঈসা, ইসমাইল নামে দু'টি পুত্র সন্তান এবং এক কন্যা সন্তান রেখে যান। কন্যা সন্তানটি পরে শাহিনশাহ্ বিবি নামে পরিচিতি লাভ করে।

চ) তাঁদের (ঈসা ও ইসমাইল) পিতার হত্যার পর দু'পুত্রকে বন্দী করা হয় এবং দাস হিসেবে বিক্রয় করা হয়।

ছ) পরবর্তী কালে তাঁদেরকে তুরাণ থেকে খুঁজে বের করা হয় এবং সেখান থেকে তাঁদের পিতৃব্য/মাতুল(?) কুতব্ আল দীন তাঁদেরকে ফিরিয়ে আনেন।

জ) কথিত আছে যে, ঈসা খান ফাতিমাহ্ খাতুন নাম্নী তাঁর এক Cousin (?) কে বিবাহ করেন এবং ফাতিমাহ্ ছিল বাংলার হুসাইন শাহের পৌত্রী।

ঈসা খানের বংশ পরিচয় তথা পিতৃপরিচয় সংক্রান্ত জেমস্ ওয়াইজের উপরোক্ত বিবরণ পরবর্তীকালের প্রায় সকল লেখকই ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন, কোনরূপ জিজ্ঞাসা ব্যতিরেকেই। কিন্তু যুক্তিসংগত কারণেই জেমস্ ওয়াইজের পরিবেশিত সকল তথ্য ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে মেনে নেয়া যায় না। প্রথমতঃ ওয়াইজের বিবরণানুযায়ী অযোধ্যার কালিদাস গজদানী হুসাইন শাহের রাজত্বকালে বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সুলায়মান খান নাম ধারণ করেন। ওয়াইজ প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ না করলেও তাঁর বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, সুলায়মান খান হুসাইন শাহের এক কন্যার পাণি গ্রহণ করেন, আর এতেই রয়েছে ঘোর-আপত্তি। কেননা একজন সাধারণ নবমুসলিমের নিকট হুসাইন শাহের মতো একজন প্রতাপান্বিত সুলতানের কন্যাকে বিয়ে দেয়ার কথিত ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকা স্বাভাবিক। এ নবমুসলিমের এমন বিশেষ কি গুণ বা যোগ্যতা ছিল, যাতে মুগ্ধ হয়ে হুসাইন শাহ্ তার নিকট নিজের কন্যাকে বিয়ে দিয়েছিলেন? যদি এ নবমুসলিম কোন বিশেষ গুণাবলী বা যোগ্যতার অধিকারী হতেন বা যদি তিনি হুসাইন শাহের কোন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হতেন তাহলে হয়তো ঘটনাটির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে কোন সন্দেহের উদ্রেক হতোনা। কিন্তু ওয়াইজের বিবরণ হতে এ নব মুসলিমের কোন বিশেষ যোগ্যতা বা তিনি যে

Dhaka University Institutional Repository

হুসাইন শাহের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন এ ধরনের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়না। অন্যদিকে সুলায়মান খান নামক হুসাইন শাহের কোন আত্মীয় বা কর্মকর্তা ছিলেন, এরূপ কোন ইঙ্গিতও কোন ঐতিহাসিক সূত্রে পাওয়া যায় না[১৮]। এছাড়া জেমস্ ওয়াইজের দাবী মতে ঈসা খানের বংশধরদের পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতেই প্রতীয়মান হয় যে, কালিদাস গজদানী তথা সুলায়মান খান হুসাইন শাহের কোন এক কন্যার পাণি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ঈসা খানের বংশধরদের নির্দেশে রচিত বলে কথিত মসনদালি ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, কালিদাস গজদানী তথা সুলায়মান খান জালাল শাহের তৃতীয় কন্যার পাণি গ্রহণ করেছেন[১৯]। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ঈসা খানের বংশধরদের পরিবেশিত দু'টি তথ্যের মধ্যে কোন পারস্পরিক মিল নেই, বরং বিভ্রান্তিকর। তাই ওয়াইজ ও মসনদালি ইতিহাস-এর বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা সন্দেহ সাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ ওয়াইজের বিবরণানুযায়ী কালিদাস গজদানী তথা সুলায়মান খান সেলিম খান [২০] ও তাজ খান কর্তৃক[২১] যুদ্ধে নিহত হওয়ায় তাঁর দু'পুত্র ঈসা ও ইসমাইলকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং দাস হিসেবে বিক্রয় করা হয়। ওয়াইজ পরিবেশিত এ তথ্যটিও নির্ভরযোগ্য মনে হয় না। সুলায়মান খানের সাথে সেলিম খান ও তাজ খানের যুদ্ধের কারণ ওয়াইজের এ বিবরণ থেকে জানা যায় না। তবে ইহাও সত্য যে,কোনরূপ কারণ ব্যতিরেকে সেলিম খান সুলায়মান খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নি, নিশ্চয়ই এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পশ্চাতে যুক্তি সঙ্গত কারণ ছিল- যা ওয়াইজ উল্লেখ করেন নি বা যা ছিল তাঁর নিকট অজানা। তবে ধারণা করা যায় যে, সুলায়মান খান সেলিম খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়ায় তাঁকে দমনের জন্যই সেলিম খান এ যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং যুদ্ধে সুলায়মান খান নিহত হন। এ ধারণা সঠিক হিসেবে ধরে নিলেও সুলায়মান খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের দাস হিসেবে বিক্রয়ের ঘটনা প্রশ্নাতীত নয়। কেননা যতদূর জানা যায় কোন সুলতান বা শাসক কর্তৃক যুদ্ধে নিহত কোন বিদ্রোহীর পুত্রদেরকে দাস হিসেবে বিক্রয় করার মতো ঘটনার উল্লেখ ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাসে পাওয়া যায়না এবং এর কোন নযীরও পরিদৃষ্ট হয় না । সুতরাং এদেশের ইতিহাসে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা এবং এ সম্পর্কে সন্দেহ থাকাও অযৌক্তিক নয়। উল্লেখ্য যে, বাংলার দুই বা ততোধিক প্রাদেশিক শাসন কর্তা বা গভর্নরদের[২২] দিল্লীর সুলতানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা, দিল্লীর সুলতান কর্তৃক তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা অভিযান পরিচালনা এবং যুদ্ধে বিদ্রোহীদেরকে পরাজিত ও হত্যার দৃষ্টান্ত ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাসে পাওয়া গেলেও পরাজিত এবং নিহত বিদ্রোহীর স্ত্রী-পুত্র বা

Dhaka University Institutional Repository

আত্মীয় স্বজনদেরকে দাস হিসেবে বিক্রয়ের কোন নযীর পাওয়া যায় না। তাছাড়া মুসলিম রাজত্বে মুসলমানদেরকে দাসরূপে বিক্রয়ের কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে কিনা তাও জানা যায় না। অন্যদিকে সুলায়মান খানের দু'পুত্র ঈসা ও ইসমাইলকে দাস রূপে বিক্রয়ের ঘটনা সত্য হিসেবে ধরে নিলেও এ সম্পর্কে প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক যে, পিতার মৃত্যু এবং ভ্রাতাদের দাস হিসেবে বিক্রীত হওয়ার পর শাহিনশাহ্ বিবির ভাগ্যে কি ঘটেছিল ? শাহিনশাহ্ বিবিকেও কি দাস হিসেবে বিক্রয় করা হয়, যদি না হয় তবে কেন ? কিন্তু ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনীতে এ প্রশ্নগুলোর কোন উত্তর নেই। তৃতীয়ত ঃ ওয়াইজের বিবরণানুযায়ী পরবর্তীকালে ঈসা ও ইসমাইলকে তাঁদের পিতৃব্য/মা'তুল কুত্ব আল- দীন তুরাণ থেকে উদ্ধার করে বাংলায় ফিরিয়ে আনেন। ওয়াইজ সংগৃহীত এ তথ্যটিও প্রশ্নাতীত নয়। দাস হিসেবে বিক্রীত হওয়ার কত সময় পর তাদেরকে বাংলায় ফিরিয়ে আনা হয় ? দাস হিসেবে বিক্রীত হওয়ার পর থেকে তাদেরকে বাংলায় ফিরিয়ে আনা পর্যন্ত এ মধ্যবর্তী সময় তাঁরা কি অবস্থায় এবং কা'দের তত্ত্বাবধানে ছিলেন? ঈসা ও ইসমাইল পুনরায় অন্য কোন দাস ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রীত হয়েছিলেন কি? শেষ প্রশ্নটির যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। কেননা ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, দাস ব্যবসায়ীরা এক স্থান থেকে দাস ক্রয় করে অন্যস্থানে বিক্রয় করে। এভাবে একজন দাসের একাধিক দাস ব্যবসায়ীর হাত বদল হওয়ার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে দিল্লীর প্রথম স্বাধীন সুলতান কুত্ব্ আল-দীন আইবকের বাল্য ইতিহাসের উল্লেখ করা যায় যে, "Qutb-ud-din Aibak was originally a slave of Turkestan. In his childhood he was brought by a merchant to Nishapur, where its Qazi, Fakhr-ud-din Abdul Aziz Kufi, purchased him … After the Qazi's death, he was sold by the Qazi's sons to a merchant, who took him to Ghazni, where he was purchased by Muhammad of Ghur."[২৩] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কুত্ব্ আল-দীনের ভাগ্যেও একাধিকবার হাত বদলের ঘটনা ঘটেছিল। তাই ঈসা খান ও ইসমাইল সম্পর্কেও এধরনের ধারণা অমূলক নয়। ওয়াইজের কাহিনীতে উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া কয়েক বৎসর পর কুত্ব্ আল-দীন কর্তৃক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ভ্রাতুষ্পুত্র/ভাগ্নেয়দেরকে তুরাণ থেকে খুঁজে বের করে বাংলায় ফিরিয়ে আনা কতখানি সহজসাধ্য ছিল তাও ভাবনার বিষয় নয় কি? যাহোক, সংগত কারণেই অন্যকোন প্রামাণ্য দলিল দ্বারা সমর্থিত হওয়া ব্যতীত ওয়াইজ পরিবেশিত এ তথ্যটিও গ্রহণযোগ্য নয়। চতুর্থতঃ ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনীর সবচেয়ে সন্দেহজনক ও কৌতুহল উদ্দীপক বিষয় হচ্ছে পিতৃব্য/মা'তুল হিসেবে কুত্ব্

Dhaka University Institutional Repository

আল-দীনের উল্লেখ। কেননা একজন নবদীক্ষিত রাজপুত মুসলিমের পুত্রদ্বয়ের পিতৃব্য/মা'তুল একটি মুসলিম ও স্পষ্টতঃ আফগান নামের অধিকারী হলেন কীভাবে? তিনিও কি ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন? যদি হয়ে থাকেন তবে তাঁর হিন্দু নাম কি ছিল? এ প্রশ্নগুলোর উত্তরও ওয়াইজের বিবরণে পাওয়া যায় না। তাছাড়া কুতুব আল-দীন ঈসা খানের মা'তুল না পিতৃব্য ছিলেন তাও তিনি উল্লেখ করেননি। পঞ্চমত : ওয়াইজের বিবরণানুযায়ী ঈসা খান ফাতিমাহ্ খাতুন নাম্নী তাঁর এক Cousin কে বিবাহ করেন এবং ফাতিমাহ্ ছিলেন হুসাইন শাহের পৌত্রী। ওয়াইজ তাঁর একই প্রবন্ধের ২১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন যে, ফাতিমাহ্ এর পিতার নাম সৈয়দ ইব্রাহিম মালিক - উল - উলামা। এ অনুযায়ী সৈয়দ ইব্রাহিম মালিক - উল - উলামা ছিলেন হয় হুসাইন শাহের পুত্র, না হয় তাঁর জামাতা । কিন্তু সৈয়দ ইব্রাহিম মালিক-উল-উলামা নামধারী হুসাইন শাহের কোন পুত্র কিংবা জামাতার উল্লেখ কোন ইতিহাস গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। এছাড়া ওয়াইজ ফাতেমা ও ঈসা খান সংক্রান্ত তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে তথাকথিত "Family Tradition"ব্যতিরেকে অন্যকোন নির্ভরযোগ্য দলিল উপস্থাপন করেননি। যাহোক, তাঁর সংগৃহীত কাহিনীতে পরিবেশিত তথ্যের উপর নির্ভর করে ঈসা খানের পিতৃ পরিচয় বা বংশ পরিচয় সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

১৮৯১ সালে শ্রী স্বরূপ চন্দ্র রায় তাঁর সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস রচনা করেন। এ পুস্তকে ঈসা খান এবং তাঁর শাসিত অঞ্চল সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি ঈসা খানের পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে নতুন কোন তথ্যের উপস্থাপন করতে পারেন নি। স্বরূপ চন্দ্র রায় লিখেন যে, "হোসেন সাহার রাজত্ব সময়ে ১৪৯৪ হইতে ১৫২০ খৃঃঅব্দের মধ্যে অযোধ্যা নিবাসী কালিদাস গজদানী নামক এক ব্যক্তি বাণিজ্য বা বিষয় কার্য্য উপলক্ষে আসিয়া পূর্ব্ব বঙ্গে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইঁহারই পুত্র সুপ্রসিদ্ধ ঈশা খাঁ"[১৮]।

স্বরূপচন্দ্র রায়ের বিবরণ পাঠে মনে হয় যে, ইহা জেম্‌স্ ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি বৈ-অন্য কিছু নয় । এ ধারণা অমূলক নয়। কেননা তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কোন ঐতিহাসিক সূত্রের উল্লেখ না করলেও তিনি নিজেই এ পুস্তিকার "বিজ্ঞাপন"-এ জেম্‌স্ ওয়াইজের রচনাবলীর সাহায্য নিয়েছেন বলে স্বীকারোক্তি করেছেন।

ঈসা খান সম্পর্কিত পরবর্তী লেখক হচ্ছেন হেনরী বেভেরীজ। বেভেরীজ ১৯০৪ সালে On Isa Khan, the ruler of Bhati, in the time of Akbar, শিরোনামে

Dhaka University Institutional Repository

একটি প্রবন্ধ রচনা করেন[২৫]। বেভেরীজ তাঁর অনূদিত আকবরনামা এবং জেম্‌স ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনীর সাহায্যেই এ প্রবন্ধ রচনা করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, " The object of this present paper is to add some particulars about Isa Khan from the third volume of the Akbarnama..."[২৬] বেভেরীজ ঈসা খানের বংশ পরিচয় কিংবা বাল্য ইতিহাস সম্পর্কে কোন নতুন তথ্য পরিবেশন করেন নি, বরং তিনি ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনী এবং আকবরনামায় আবুল ফযল কর্তৃক প্রদত্ত ঈসা খানের পিতৃপরিচয় ও বাল্য ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন মাত্র। তবে দু'টি বিষয়ে বেভেরীজ তাঁর নিজস্ব ধারণার কথা ব্যক্ত করেছেন। ঈসা খানের পিতৃব্য কুতব্ আল-দীন সম্পর্কে তিনি লিখেন যে, "One would like to think that this good uncle was the Qutbu- d- din who left Sher Shah and became a recluse in disgust of the king's breach of faith towards Puran Mal."[২৭] বেভেরীজ তাঁর ধারণার স্বপক্ষে কোন ঐতিহাসিক সূত্রের উল্লেখ না করলেও আব্বাস খান সরওয়ানীর তারীখ-ই-শেরশাহী- তে কুতব্ খান নায়িব নামক শেরশাহের একজন অমাত্যকে শেরশাহ্ ও পুরান মলের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। তবে তারীখ-ই-শেরশাহী-তে উক্ত কুতব্ খানের স্বেচ্ছা নির্বাসিত হওয়ার কথা উল্লেখ না থাকলেও এই ঘটনার পর উক্ত গ্রন্থে তাঁর আর উল্লেখ পাওয়া যায় না(তারীখ, পৃঃ৯২, ১৪৪-৫)। দ্বিতীয়ত ঃ তিনি ধারণা করেন যে, ঈসা খানের পিতা হিন্দুই ছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর মত হচ্ছে, "As Isa Khan and his brother were sold as slaves, it may be presumed, in spite of the tradition mentioned by Dr. Wise, that their father remained a Hindu, for it seems that a Muhammadan can not be sold into slavery by a Muhammadan".[২৮] বেভেরীজ এক্ষেত্রে "ঈসা খানের পিতা হিন্দুই ছিলেন" বলে স্ববিরোধীতার পরিচয় দিয়ে ঈসা খানের পিতৃ পরিচয় সংক্রান্ত এ বিতর্ককে আরো জটিলতর করেছেন মাত্র।

১৯০৫ সালে E.A. Gait রচিত A History of Assam গ্রন্থে ঈসা খান সম্পর্কে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। তিনি লিখেন যে, "An Afghan named Isa Khan, the Bhuiya of Khizrpur, near Narayanganj in Dacca, was already a powerful chief in the time of Daud. When the latter was overthrown by Khan Jahan, Isa Khan became the leader of the Afghans throughout the eastern part of Bengal, and at one time he ruled the whole country from Ghoraghat to the sea." [২৯]

Dhaka University Institutional Repository

E.A. Gait এর বিবরণ থেকে ঈসা খানের বংশপরিচয় সংক্রান্ত কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও তাঁর বক্তব্যের যথেষ্ট তাৎপর্য রয়েছে। কেননা জেম্‌স ওয়াইজ এবং অন্যান্যরা যেখানে ঈসা খানকে হিন্দু তথা রাজপুত বংশোদ্ভূত হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন সেখানে E. A. Gait ঈসা খানকে সুস্পষ্টরূপে একজন আফগান এবং আফগান নেতা হিসেবে অভিহিত করেছেন। E. A. Gait তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে কোন ঐতিহাসিক সূত্রের উল্লেখ না করলেও তাঁর বিবরণ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি আবুল ফযলের আইন -ই - আকবরী-এর অনুসরণ করেছেন। আবুল ফযল আইন-ই- আকবরী-তে ঈসা খানকে "ঈসা আফগান" হিসেবে অভিহিত করেন[৩০]। সুতরাং ইহা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, E. A. Gait ঈসা খানের "Hindu- Origin" সম্পর্কে অন্যান্যদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন।'

F.B. Bradley-Birt, ১৯০৬ সালে রচিত তাঁর The Romance of an Eastern Capital - এ ঈসা খান সম্পর্কে লিখেন যে, "...the famous Isha Khan, ...This chief was the grandson of Kalidas Gozdani, a Hindu, who, it is said, delighted in religious controversies, and having been worsted in argument by a learned Mussalman, acknowledged his defeat and embraced the faith of Islam ".[৩১] F. B. Bradley-Birt এর এ বিবরণ থেকে জানা যায় যে ঃ

ক) ঈসা খানের পিতামহ/ মাতামহ কালিদাস গজদানী ছিলেন একজন হিন্দু।

খ) কালিদাস গজদানী একজন মুসলিম পন্ডিতের নিকট ধর্মীয় বিতর্কে পরাজিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

Bradley-Birt তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে কোন ঐতিহাসিক সূত্রের উল্লেখ করেন নি, এমনকি তিনি ঈসা খানের পিতামহ/ মাতামহের নাম উল্লেখ করলেও ঈসা খানের পিতার নাম বা তাঁর পিতা কে ছিলেন সে সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। যে কারণে তাঁর বক্তব্য অসম্পূর্ণ ও সন্দেহ জনক প্রতীয়মান হয়। অন্যদিকে কালিদাস গজদানী ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর নিশ্চয়ই কোন মুসলিম নাম বা উপাধি ধারণ করেছিলেন। কালিদাস গজদানীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘটনা যদি সত্যও হয়, তবে তাঁর মুসলিম নাম কি ছিল? কিন্তু Bradley-Birt এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। অধিকন্তু, কোন ঐতিহাসিক সূত্রের উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে কালিদাস

Dhaka University Institutional Repository

গজদানীকে ঈসা খানের পিতামহ বা মাতামহ হিসেবে অভিহিত করে তিনি নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন। তাই সঙ্গত কারণেই F.B. Bradley-Birt এর এই অসম্পূর্ণ, সন্দেহজনক এবং বিভ্রান্তিকর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

রাম রাম বসু ১৮০২ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে তাঁর প্রতাপাদিত্য চরিত প্রকাশ করেন এবং নিখিল নাথ রায় ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে এ বই সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। নিখিল নাথ রায়ের এ সম্পাদনা কর্ম আধুনিক ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে[৩২]। যাহোক, তিনি ঈসা খান সম্পর্কে লিখেন যে, "ষোড়শ শতাব্দীর বার ভূঁইয়াগণের মধ্যে ইশা খাঁ সর্ব্ব প্রধান ছিলেন। অন্যান্য ভূঁইয়াগণ তাঁহাকে আপনাদের সর্দ্দার বলিয়া মান্য করিতেন। ...মোগল বিজয়ের সময় উক্ত বারজনের মধ্যে নয়জন মুসলমান ও তিনজন হিন্দু ছিলেন জানা যায়। ... মুসলমান নয়জনের মধ্যে সকলেই পাঠান ছিলেন। ...এই নয়জন মুসলমানের মধ্যে ইশা খাঁ সর্ব্ব প্রধান ছিলেন। ...কিন্তু প্রথমতঃ আমরা ভূঁইয়াগণের সর্ব্ব প্রধান ইশা খাঁর কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। কারণ, তদ্দ্বারা পাঠানেরা বঙ্গদেশে মোগলদিগকে কিরূপ ভাবে বাধা দিয়াছিল, তাহার বিশদ বিবরণ অবগত হওয়া যাইবে।... বাঙ্গলার শেষ পাঠান নরপতি দায়ূদের অবসানের পর যদিও মোগলেরা গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করিয়া বঙ্গরাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি পাঠানেরা ও অন্যান্য ভূঁইয়ারা প্রথমে তাঁহাদিগের অধীনতা স্বীকার করিতে চাহেন নাই। এই সময়ে উড়িষ্যায় এবং পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে পাঠান বংশীয়েরা আপনাদিগের ক্ষমতা সঙ্কোচের কোন প্রকার চেষ্টা করেন নাই। উক্ত পাঠান বংশীয় গণের মধ্যে উড়িষ্যার কতলুখাঁ ও বঙ্গের ইশা খাঁই প্রধান। ইশা খাঁর পিতা প্রথমে হিন্দু ছিলেন, তাঁহার নাম কালিদাস গজদানী। ইঁহারা বাইশ রাজপুত শ্রেণী। হোসেন খাঁর রাজত্ব সময়ে তিনি অযোধ্যা হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। পরে মুসল্মান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সলিমান খাঁ নাম ধারণ করিয়া এক পাঠান রমণীর পাণি গ্রহণ করেন। তিনি সমস্ত ভাটি প্রদেশের অধীশ্বর হন। সেলিম খাঁ ও তাজ খাঁ কর্তৃক তিনি নিহত হইলে, তাঁহার পুত্রদ্বয় ইশা ও ইস্মাইল দাসরূপে বিক্রীত ও দূরদেশে নীত হন। সাউন্নেসা তাঁহার এক কন্যারও উল্লেখ দেখা যায়। ইশা ও ইস্মাইল খাঁ পরে তাঁহাদের মাতুল কুতুবউদ্দিন কর্তৃক বঙ্গদেশে আনীত হন।... তিনি হোসেন সাহ বংশীয়া ফাতেমা খানম নাম্নী কোন রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন[৩৩]।"

Dhaka University Institutional Repository

নিখিল নাথ রায় প্রদত্ত ঈসা খানের বাল্য ইতিহাস ও বংশ পরিচয় সংক্রান্ত তথ্যাবলীর অধিকাংশই ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। এ রূপ ধারণার কারণ হচ্ছে এই যে, তাঁর প্রদত্ত বিবরণ পাঠেই বুঝা যায় যে, তিনি ঈসা খান সংক্রান্ত তাঁর রচনায় ব্লখমান অনূদিত আইন-ই-আকবরী, ওয়াইজ ও বেভেরীজের লিখিত প্রবন্ধের সাহায্য নিয়েছেন। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, বেভেরীজও আকবরনামা, আইন-ই-আকবরী এবং ওয়াইজের লিখিত প্রবন্ধের সাহায্যেই ঈসা খান সংক্রান্ত তাঁর বিবরণ প্রস্তুত করেন। যে কারণে নিখিলনাথ রায়ের বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি শুধু ঈসা খানের বংশ পরিচয় ও বাল্য ইতিহাস সংক্রান্ত উল্লিখিত লেখকদের পরিবেশিত তথ্যাবলীর একত্রীকরণ করেছেন মাত্র। লক্ষণীয় যে, আইন - ই- আকবরীর অনুসরণে তিনি ঈসা খানকে একজন পাঠান ও পাঠান বংশীয় তথা একজন আফগান ও আফগান বংশীয় হিসেবে অভিহিত করেছেন[৩৪]। দ্বিতীয়ত ঃ আকবর নামার অনুসরণে তিনি ঈসা খানের পিতাকে বাঈস রাজপুত্র সম্প্রদায়ভুক্ত বলে উল্লেখ করেন। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। তৃতীয়তঃ ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনীর আলোকে উল্লেখ করেন যে, ঈসা খানের পিতার নাম কালিদাস গজদানী এবং তিনি হুসাইন শাহের রাজত্বকালে বাংলায় আসেন ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে "সলিমান" তথা সুলায়মান খান নাম ধারণ করেন- ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নিখিল নাথ রায় কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা বা যুক্তি প্রদর্শন ব্যতিরেকেই আইন-ই-আকবরী, আকবর নামা ও ওয়াইজের কাহিনীতে পরিবেশিত তথ্যাবলী গ্রহণ করেছেন। ফলশ্রুতিতে নিখিল নাথ রায়ের বিবরণ থেকে ঈসা খানের বংশ পরিচয় সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। কেননা তিনি একই সাথে ঈসা খানকে একজন পাঠান ও পাঠান বংশীয় তথা একজন আফগান ও আফগান বংশীয় এবং তাঁর পিতাকে একজন রাজপুত হিন্দু হিসেবে অভিহিত করে স্ববিরোধীতারই পরিচয় দেন।

এবারের আলোচ্য লেখক হচ্ছেন H. E. Stapleton. ১৯০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী ঈসা খানের বংশধরদের আবাসস্থল ঢাকার নিকটবর্তী দিওয়ান বাগ গ্রামে ৭টি কামান আবিষ্কৃত হয়। এর উপর ভিত্তি করে H. E. Stapleton Note on Seven Sixteenth Century Cannon recently Discovered in the Dacca district.[৩৫]- শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেন । এ কামান গুলোর একটিতে ঈসা খানের নাম ও সন খোদাইকৃত রয়েছে। যাহোক, Stapleton তাঁর প্রবন্ধের ৩৭১ পৃষ্ঠায় ঈসা খানের একটি বংশ তালিকা প্রদান করেছেন। এ বংশ তালিকা থেকে জানা যায় যে, "কালিদাস গজদানী ওরফে সুলায়মান খান বাংলার শাসক জালাল শাহ

Dhaka University Institutional Repository

সূরীর তৃতীয় কন্যাকে বিবাহ করেন। কালিদাস গজদানীর ঈসা ও ইসমাইল নামে দু'টি পুত্র সন্তান এবং শাহিনশাহ্ বিবি নামে একটি কন্যা সন্তান ছিল।"

Stapleton দাবী করেন যে, তিনি ঈসা খানের বংশধরদের নির্দেশে মুন্সি রাজচন্দ্র ঘোষ ও পন্ডিত কালীকুমার চক্রবর্তী বিরচিত মসনদালি ইতিহাস-এ পরিবেশিত তথ্যের আলোকে এ বংশতালিকা প্রস্তুত করেছেন[৩৬]। কিন্তু মসনদালি ইতিহাস এ পরিবেশিত তথ্যাবলী ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। প্রথমত ঃ ঈসা খানের বংশধরদের পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত জেম্‌স্ ওয়াইজের বিবরণানুযায়ী কালিদাস গজদানী তথা সুলায়মান খান হুসাইন শাহের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু ঈসা খানের বংশধরদের নির্দেশে রচিত মসনদালি ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সুলায়মান খান জালাল শাহ্ সূরের তৃতীয় কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। অন্যদিকে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন যে, "দেওয়ানদের কাহারও কাহারও আদেশে বিরচিত আবদুল করিমের পালা গানে পাইতেছি যে, ইশা খাঁ বাবরের জামাতা"[৩৭]। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ঈসা খানের বংশধরদের পরিবেশিত তিনটি তথ্যই শুধুমাত্র অসামঞ্জস্যপূর্ণই নয় বরং কাল্পনিকও বটে। দ্বিতীয়তঃ মসনদালি ইতিহাস এর লেখক দ্বয় কালিদাস গজদানী তথা সুলায়মান খানকে সুলায়মান কারারানী[৩৮] হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।[৩৯] তৃতীয়তঃ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মসনদালি ইতিহাস সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, "This is a poor attempt lacking in historical insight and is full of fables and fictions."[৪০] অতএব, মসনদালি ইতিহাস এর উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত Stapleton এর বংশ তালিকার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকাটাই বাঞ্চনীয়।

পরবর্তী লেখক প্রভাস সেন তাঁর বগুড়ার ইতিহাস[৪১]-এ ঈসা খানের পিতৃপরিচয় ও বাল্য ইতিহাস সম্পর্কে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে কোন নতুন তথ্য সংযোজন করতে পারেন নি বরং তিনি আকবরনামায় বর্ণিত আবুল ফযলের বিবরণই হুবহু তুলে ধরেছেন। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

সতীশ চন্দ্র মিত্র ১৯২২ সনে (১৩২৯ বঙ্গাব্দ) তাঁর যশোহর-খুলনার ইতিহাস দ্বিতীয় খন্ড, প্রকাশ করেন। তিনি এ গ্রন্থে প্রধানতঃ প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে আলোকপাত করলেও অন্যান্য ভূঁঞাদের সম্পর্কেও কিছুটা আলোকপাত করেন। ঈসা খানের পিতৃ পরিচয় ও বাল্য ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি এ বইয়ের ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠায় foot note-এ লিখেছেন যে, "ঈশা খাঁর জীবনী বিচিত্র। কথিত আছে, কালিদাস গজদানী নামক একজন বৈশ্য রাজপুত অযোধ্যা প্রদেশ হইতে গৌড়ে আসেন এবং তথায় মুসলমান হইয়া সুলেমান খাঁ নাম ধারণ করেন। তিনি বাদশাহ হুসেন শাহের এক কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। ঈশা ও ইসমাইল নামে তাহার দুই পুত্র হয়। কিছুদিন পরে সের খাঁর পুত্র সেলিম খাঁ যখন গৌড় আক্রমণ করেন, তখন সুলেমান যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন, এবং তাহার পুত্র ঈশা ও ইসমাইল তুর্কী হস্তে বন্দী হন। পরে তাহার খুল্লতাত কুতুব উদ্দীন উহাদিগের উদ্ধার সাধন করিয়া নিজের দুই কন্যার সহিত উহাদের বিবাহ দেন। ইহার সকল কথা বিশ্বাস যোগ্য নহে। প্রথমতঃ তাহার খুল্লতাত কুতুবউদ্দীন - কে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। কেহ কেহ তাহাকে 'মাতুল' বলেন, কিন্তু উহারও প্রমাণ নাই। মুসলমানেরা কখনও মুসলমান বন্দীকে দাস রূপে বিক্রয় করেন না; তাহা হইলে মুসলমানের পুত্রগণ কিরূপে বিক্রীত হইলেন, বুঝা যায় না। কেহ কেহ বলেন হুসেন শাহের ভ্রাতুষ্পুত্রী ফাতেমা ঈশার মাতা ছিলেন"।

সতীশ চন্দ্র মিত্রের বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আবুল ফযলের বক্তব্যের পরিপূর্ণ যথার্থতা সম্পর্কে সতর্ক সংশয় প্রকাশ করেছেন। অন্যান্য লেখকরা যেখানে আবুল ফযলের বক্তব্য বিনা বাক্য ব্যয়ে গ্রহণ করেছেন তিনি সেখানে আবুল ফযলের সাথে একমত হতে পারেন নি। এক্ষেত্রে তাঁর সাথে একমত পোষণ করা যায়। কেননা আবুল ফযল আকবরনামায় প্রথমে ঈসা খানের পিতাকে বাঈস রাজপুত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করে পরে কুত্‌ব্ আল-দীনকে ঈসা খানের পিতৃব্য হিসেবে উল্লেখ করে স্ববিরোধীতার পরিচয় দেন।[৪২] দ্বিতীয়ত ঃ ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, যুদ্ধে নিহত কোন বিদ্রোহীর স্ত্রী-পুত্র বা আত্মীয় স্বজনকে দাসরূপে বিক্রয়ের ঘটনা ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায়না। ইহা একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা এবং এ সম্পর্কে সন্দেহ থাকা অমূলক নয়।

নলিনী কান্ত ভট্টশালী বাংলার বার-ভূঁঞাদের সম্পর্কে "Bengal Chiefs Struggle for independence in the reign of Akbar and Jahangir". - এ শিরোনামে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন।[৪৩] ভট্টশালী তাঁর রচনায় ঈসা খানের অভ্যুদয়, ঈসা খানের রাজ্য, ঈসা খানের বংশ পরিচয় এবং মুঘল সুবাহ্‌দার খান-ই-জাহানের সাথে ঈসা খানের সংঘর্ষ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন। ঈসা খানের ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে ভট্টশালী তাঁর পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের তুলনায় অনেক বেশী সফল হন। কিন্তু তিনি কোনরূপ প্রশ্ন উত্থাপন ব্যতিরেকেই ঈসা খানের

Dhaka University Institutional Repository

পিতৃপরিচয় সংক্রান্ত জেম্‌স্ ওয়াইজ, আবুল ফযল এবং অন্যান্যদের বক্তব্য গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, ভট্টশালী জেম্‌স্ ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনী, মসনদালি ইতিহাস এবং পূর্ববঙ্গগীতিকার দেওয়ান ইশাখাঁর পালায় পরিবেশিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ঈসা খানের পিতা হিসেবে কথিত কালিদাস গজদানীর সম্ভাব্য শ্বশুর অর্থাৎ তিনি বাংলার কোন সুলতানের কন্যার পাণি গ্রহণ করতে পারেন, সে বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। ভট্টশালী ধারণা করেন যে, ঈসা খানের পিতা হিসেবে কথিত কালিদাস গজদানী হুসাইন শাহী বংশের শেষ সুলতান গিয়াস আল-দীন মাহমুদ শাহের (১৫৩২-১৫৩৮) কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে আবুল ফযলের আকবর নামায় প্রদত্ত ঈসা খানের পিতৃ পরিচয় সংক্রান্ত বিবরণ তুলে ধরেন এবং এর পর জেম্‌স্ ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনী, মসনদালি ইতিহাস ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার দেওয়ান ইশা খাঁর পালার উপর ভিত্তি করে আলোচনা শুরু করেন। এছাড়া তিনি ১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দ অর্থাৎ সুলতান আলা-আল-দীন হুসাইন শাহের সিংহাসনে আরোহণ থেকে শুরু করে ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে ঈসা খান কর্তৃক মুঘল নৌ-সেনাপতি শাহ্ বর্দীকে বাংলার পানি-সীমা থেকে বিতাড়ন পর্যন্ত সময়ের বাংলার সৈয়দ বংশীয়, সূর আফগান ও কাররানী শাসকদের নাম এবং তাঁদের ক্ষমতা লাভ ও রাজত্বকালের সময় সীমার একটি ধারাবাহিক চিত্র উপস্থাপন করেন। এর পর তিনি মত প্রকাশ করেন যে, "What led Kalidas to rebel again and again in the reign of Islam Shah ? From his repeated rebellions, it appears as if he had particular animosity against the reigning family. Sher Shah became master of Bengal after ousting Sultan Mahmud Shah, the last of the Husseini Sultans. This took place in 1538 A.D. Rebellion or insubordination was inopportune during the vigorous rule of Sher Shah up to 1545 A.D. Kalidas's rebellion came in the next and comparatively weaker reign of Islam Shah . The rebellion of Kalidas looks like an attempt to re-establish the lost political power of the Husseini dynasty ousted by Sher Shah... The only Ghiyasuddin before Islam Shah who had a reign long enough and who came only a few years before Islam Shah is Ghiyasuddin Mahmud Shah and possibly he was the father-in-law of Kalidas. With the massacre of Ghiyasuddin Mahmud Shah's sons by the son of Sher Shah after the capture of Gaur, Kalidas,as the husband of a daughter of Mahmmud Shah, possibly considered himself de jure successor to the Kingdom of Mahmud Shah and as such entitled to rebel against the usurping family" [৮৮].

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তি সঙ্গত কারণেই ভট্টশালীর সকল বক্তব্যের সাথে একমত হওয়া যায় না। প্রতমতঃ ভট্টশালী যে তিনটি উৎসের উপর ভিত্তি করে (যেমন- জেম্‌স্ ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনী, মসনদালি ইতিহাস ও দেওয়ান ইশাখাঁর পালা) কালিদাস গজদানীকে ঈসা খানের পিতা হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন এর কোনটিই নির্ভরযোগ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ যে যুক্তিতে ভট্টশালী গিয়াস আল-দীন মাহ্‌মুদ শাহের কন্যার পাণি গ্রহণের কারণে কালিদাস গজদানীর বারংবার বিদ্রোহের যৌক্তিকতা নির্দেশ করেছেন, সুলতান আলা আল-দীন হুসাইন শাহ্ কিংবা হুসাইন শাহের ১৮ জন পুত্র-কন্যার [৪০] মধ্যে যে কোন একজনের কন্যা বিয়ে করলেও সে একই যৌক্তিকতা নির্দেশ করা যায়। কেননা গিয়াস আল-দীন মাহ্‌মুদ শাহ্ এবং অন্যান্যরাও আলা আল -দীন হুসাইন শাহের পুত্র বা কন্যা, এরা সকলেই একই পরিবার বা বংশের সদস্য এবং শের শাহ্ এ হুসাইন শাহী বংশকে উৎখাত করেই বাংলা দখল করেন। সুতরাং ইহা নির্দিষ্ট করে বলা যুক্তি সঙ্গত হবে না যে, কালিদাস গজদানী গিয়াস আল-দীন মাহ্‌মুদ শাহের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। তৃতীয়ত ঃ একজন সাধারণ নবমুসলিমের নিকট বাংলার সুলতানের কন্যাকে বিয়ে দেয়ার কথিত ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কথা পূর্বের আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে। চতুর্থতঃ কালিদাস গজদানীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ সম্পর্কে দেওয়ান ইশা খাঁর পালায় যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার উপর আস্থা স্থাপন করাও প্রায় অসম্ভব[৪১]। যাহোক, ভট্টশালীর বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে ঈসা খানের বংশ পরিচয় সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেমনি যৌক্তিক হবেনা তেমনি ইহাও সন্দেহাতীত ভাবে বলা যাবেনা যে ঈসা খানের পিতা প্রথমে হিন্দু ছিলেন এবং পরে বাংলার কোন এক সুলতানের কন্যার পাণি গ্রহণ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

সুধীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য তাঁর <u>A History of Mughal North-East frontier policy</u> গ্রন্থে ঈসা খান সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, "The removal of Daud from the political arena in Bengal... The central figure of the Afghan national opposition was indeed gone, but isolated Afghan chiefs... were too firmly entrenched in the soil to be rooted out without a stubborn and a protracted struggle. Mahmud Khan khashkhail and Jamshid Khashkhail in Satgaon, Karimdad Musazai, Ibrahim Narail, Masum Kabuli, Majlis Dilawar and Majlis Pratap in the south and the east of Bengal - all under the leadership and inspiration of Isa Khan, the chief of Bhati, were the

Dhaka University Institutional Repository

prominent Afghan leaders who proved to be the sleepless disturbers of the Mughal peace during this period."[৪৭]

সুধীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে দায়ূদের অপসারণে আফগানদের জাতীয় প্রতিরোধের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য তিরোহিত হলেও বিচ্ছিন্ন আফগান সর্দারগণ বাংলার মাটিতে সুদৃঢ় ঘাঁটি গড়ে তোলে। তাঁর দাবীমতে যে সকল আফগান সর্দার বাংলায় মুঘল বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মাহ্‌মুদ খান খাসখেইল , জামশেদ খাসখেইল, করিমদাদ মুসাজাই, ইব্রাহিম নারাল, মাসুম কাবুলি, মজলিস দিলাওয়ার, মজলিস প্রতাপ এবং ভাটি-প্রধান ঈসা খান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সুধীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য ঈসা খানকে শুধুমাত্র একজন আফগান সর্দার হিসেবেই অভিহিত করেন নি বরং আফগানদের মুঘল বিরোধী সংগ্রামে একজন আফগান প্রতিনিধি হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পান। তাই ইহা ধারণা করা অমূলক নয় যে, সুধীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য আবুল ফযলের আইন-ই-আকবরীর অনুসরণেই ঈসা খানকে একজন আফগান সর্দার হিসেবে অভিহিত করেন।[৪৮]

যদুনাথ সরকার সম্পাদিত The History of Bengal Volume II - এ নীরদ ভূষণ রায় ঈসা খানের পিতৃপরিচয় সম্পর্কে মত প্রকাশ করেন যে, "Bengal, particularly the eastern part of it, had become a land of adventure and romance in the 16th century. The Afghans, the Maghs and the Portuguese all sought here the field for their enterprise and energy. During the reign of Islam Shah (1545-1553 A.D.) one of such adventurers who came to Bengal was Kalidas Gajdani, a Bais Rajput converted to Islam under the name of Sulaiman Khan , who carved out an independent principality in the Bhati region comprising the north-eastern portion of the Dacca and Mymensingh districts. His royal pretensions provoked Islam Shah to send Taj and Dariya Khan who tracked him to his inaccessible base and forced him to submit after hard fighting. Sulaiman could not long remain quiet ; the abundant fertility of Bengal again bred ambitious designs in his brain, whereupon Taj and Dariya Khan returned at the head of an army, treacherously murdered him at a private interview, and made an example of him by selling his sons Isa and Ismail to

Dhaka University Institutional Repository

Turani merchants.'' [৩৮] নীরদ ভূষণ রায়ের বিবরণ থেকে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী পাওয়া যায় ঃ

ক) ষষ্ঠ দশ শতকে বাংলার পূর্বাঞ্চল আফগান, মগ ও পর্তুগীজ অভিযানকারীদের দুঃসাহসিক কর্মকান্ডের লীলাভূমিতে পরিণত হয়।

খ) ইসলাম শাহের রাজত্বকালে (১৫৪৫-১৫৫৩) বাঈস রাজপুত সম্প্রদায়ভুক্ত কালিদাস নামক এ ধরনের একজন অভিযানকারী বাংলায় এসে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে সুলায়মান খান নাম ধারণ করেন। কালিদাস গজদানী ভাটি অঞ্চলের ঢাকা এবং ময়মনসিংহ জেলার উত্তর - পূর্বাংশে একটি স্বাধীন রাজ্য গঠন করেন।

গ) তাঁর রাজকীয় আচার আচরণে ক্রোধোদীপ্ত হয়ে ইসলাম শাহ্ কালিদাস গজদানীর বিরুদ্ধে তাজ খান ও দরিয়া খানকে প্রেরণ করেন এবং তুমুল লড়াইয়ের পর কালিদাস তথা সুলায়মান খান বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু সুলায়মান পুনরায় বিদ্রোহ করায় তাজ ও দরিয়া খান সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়ে তাঁকে হত্যা করে তাঁর পুত্র ঈসা ও ইসমাইলকে তুরাণী ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করে দেয়া হয়।

নীরদ ভূষণ রায়ের পরিবেশিত সকল তথ্য নির্দ্ধিধায় ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। প্রথমত ঃ কালিদাস গজদানীর মতো একজন নবাগত ব্যক্তি ভিন্ন দেশ থেকে বাংলায় এসে একটি স্বাধীন রাজ্য গঠন করার কথিত ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক। কেননা এ নবাগত ব্যক্তি একটি স্বাধীন রাজ্য গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্যবল, অস্ত্রবল এবং ধনবল কোথায় পেলেন? যদি তিনি যে অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করেছিলেন বলে কথিত হয়েছে সে অঞ্চলের অধিবাসী হতেন কিংবা আফগান বা অন্যান্য অভিযানকারীদের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি হতেন তা হলে হয়তো তাঁর রাজ্য স্থাপনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠতোনা। কিন্তু নীরদ ভূষন রায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন যে, কালিদাস নামক কথিত ব্যক্তি ইসলাম শাহের রাজত্বকালেই ভিন্ন দেশ থেকে বাংলায় এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন এবং তাঁর বক্তব্য থেকে ইহাও প্রতীয়মান হয়না যে, এ ব্যক্তি আফগান অভিযানকারীদের সমগোত্রীয় বা সমজাতীয় লোক ছিলেন। কাজেই একজন

Dhaka University Institutional Repository

নবাগত ব্যক্তির পক্ষে আফগান অভিযানকারীদের ঘাঁটিতে তথা ভাটি অঞ্চলে একটি স্বধীন রাজ্য গঠন করা অসম্ভব না হলেও দস্তুরমত সন্দেহজনক। দ্বিতীয়তঃ পূর্বের আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে যে, একজন বিদ্রোহীকে হত্যার পর তাঁর পুত্রদেরকে ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করার ঘটনা ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাসে একটি নযীর বিহীন এবং ব্যতিক্রমী ঘটনা এবং এ সম্পর্কে সন্দেহ থাকা অযৌক্তিক নয়। তৃতীয়ত ঃ ঈসা ও ইসমাইলকে তুরাণী ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয়ের পর তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল? পরবর্তীকালে ঈসা খান তুরাণ থেকে ফিরে আসলেন কীভাবে? দ্বিতীয় প্রশ্নটির যুক্তি সঙ্গত কারণ রয়েছে, কেননা একই গ্রন্থের ১৯৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈসা খান ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে মুঘল সুবাহ্দার মুনিম খানের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মুঘল নৌ-সেনাপতি শাহ্ বর্দীর অধীন মুঘল নৌ-বহরকে বাংলার নদী-নালা থেকে বিতাড়িত করেন। কিন্তু নীরদ ভূষণ রায়ের বিবরণে এ প্রশ্ন দু'টির উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়না । আর এতেই তাঁর পরিবেশিত তথ্যের অপূর্ণতা প্রতীয়মান হয়। যাহোক, উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, নীরদ ভূষণ রায়ের পরিবেশিত সকল তথ্যের উপর আস্থা স্থাপন করা অমূলকই বটে।

এ বিষয়ে পরবর্তী লেখক হচ্ছেন সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর। তিনি তাঁর রচিত Glimpses of old Dhaka গ্রন্থে ঈসা খানের পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে লিখেন যে, "Readers would be interested to know about the birth and rise of Isa Khan. His father was a Rajput Brahmin named Kalidas Gajdani, who was afterwards ennobled to Islam and was named Suleiman Khan. He came to Bengal as an adventurer in the reign of Islam Shah son of Sher Shah and it was somewhere in Bengal that Isa Khan was born . In some engagement with Islam Shah's army Kalidas (Suleiman) was killed and his two sons Isa and Ismail were sold to a Turanian (Central Asian) merchant ."[৫৩]

সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুরের বিবরণ গতানুগতিক। এতে কোন নতুন তথ্য নেই। বলা যায় যে, তিনি তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদেরই পদাংক অনুসরণ করেছেন মাত্র।

The History of the Afghans in India গ্রন্থে এম, এ, রহিম ঈসা খানের পিতৃপরিচয় সম্পর্কে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

"The most powerful and influential of the Bara Bhuyans was Masnad-i-Ali Isa Khan of Sonargaon . His father Sulaiman was originally a Hindu, belonging to a tribe of Bais Rajputs of Baiswara in Oudh . His early name was Kalidas. Klidas came to Gaur in search of fortune and got a job in the revenue department of the Saiyid sultans. By merit he rose to the position of the finance minister . It is said that Kalidas used to give away in charity to the Brahmins golden elephants and earned the title of Gazdani . Afterwards he accepted Islam and was named Sulaiman Khan . Sulaiman married a daughter of Sultan Ghiyath al-Din, the last ruler of the Saiyid sultanate of Bengal. After the fall of this dynasty at the hands of Sher Shah, Sulaiman retreated to Bhati in Eastern Bengal and organised a rebellion there against the newly-established Afghan rule, with the support of the nobles of the ousted royal family . After several contests,Taj Khan and Dariya Khan, the generals of Islam Shah, defeated and killed Sulaiman and sold his two sons Isa and Musa, whom they captured, to merchants. When in 1564 Taj Khan became the ruler of Bengal, Isa Khan's maternal uncle Qutb-al-Din won Taj Khan's favour by means of good service and brought back his nephews from Turan. Isa Khan was at that time a youngman of about twenty five." [৩১] এম,এ,রহিমের বিবরণ হতে ঈসা খানের বংশ পরিচয় সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী পাওয়া যায় ঃ

ক) ঈসা খানের পিতা সুলায়মান মূলতঃ অযোধ্যার বয়েসওয়ারার বাঈস রাজপুত সম্প্রদায়ভুক্ত একজন হিন্দু ছিলেন। তাঁর হিন্দু নাম ছিল কালিদাস। কালিদাস ভাগ্যান্বেষণে গৌড়ে আসেন এবং সৈয়দ সুলতানদের রাজস্ব বিভাগে চাকুরী লাভ করেন এবং যোগ্যতাবলে অর্থ-মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন।

খ) কথিত আছে যে,কালিদাস ব্রাহ্মণদেরকে সোনার হাতি দান করে গজদানী উপাধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে সুলায়মান খান নাম ধারণ করেন।

গ) সুলায়মান বাংলার শেষ সৈয়দ সুলতান গিয়াস আল-দীন মাহমুদ শাহের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। শের শাহের হস্তে এ বংশের পতনের পর সুলায়মান পূর্ব-বাংলার ভাটি অঞ্চলে পশ্চাদপসরণ করেন এবং

Dhaka University Institutional Repository

অপসারিত রাজ পরিবারের অভিজাতদের সহযোগিতায় সেখানে নব-প্রতিষ্ঠিত আফগান শাসনের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ সংগঠিত করেন।

ঘ) একাধিক লড়াইয়ের পর ইসলাম শাহের সেনাপতি তাজ খান ও দরিয়া খান সুলায়মানকে পরাজিত ও হত্যা করেন এবং তাঁর দু'পুত্র ঈসা ও মুসাকে বন্দী করে ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করে দেন। ১৫৬৪ সালে তাজ খান বাংলার শাসন ক্ষমতা লাভ করলে ঈসা খানের মাতুল কুত্ব্ আল-দীন উত্তম-সেবার দ্বারা তাজ খানের আনুকূল্য লাভ করেন এবং তাঁর ভাগ্নেয়দেরকে তুরাণ থেকে ফিরিয়ে আনেন। এ সময় ঈসা খান প্রায় ২৫ বছর বয়সের একজন যুবক ছিলেন।

এম,এ,রহিমের পরিবেশিত সকল তথ্য ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে সন্দেহাতীত ভাবে গ্রহণ করা যায় না। প্রথমতঃ এম,এ,রহিম দীনেশ চন্দ্র সেনের পূর্ব বঙ্গ গীতিকার বরাত দিয়ে দাবী করেন যে, কালিদাস ভাগ্যান্বেষণে গৌড়ে আসেন এবং সৈয়দ সুলতানদের রাজস্ব বিভাগে চাকুরী লাভ করেন এবং যোগ্যতা বলে অর্থ- মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু এম,এ,রহিমের এ তথ্য সঠিক নয়। কেননা পূর্ববঙ্গ গীতিকার কোথাও কালিদাস নামক কোন ব্যক্তির ভাগ্যান্বেষণে গৌড়ে আগমনের উল্লেখ নেই। তবে পূর্ব বঙ্গ গীতিকায় উল্লেখ আছে যে, "রাজা ভগীরথ" নামক এক ব্যক্তি পুণ্য-অর্জনার্থে বাংলায় আসেন এবং গৌড়ের "নবাব গয়াস উদ্দিন" (?) কর্তৃক দিওয়ান নিযুক্ত হন"[২]। তাছাড়া এম, এ, রহিম সৈয়দ সুলতানদের অর্থাৎ যাঁদের রাজস্ব বিভাগে কালিদাস চাকুরী লাভ করেছিল এবং অর্থ-মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁদের নাম উল্লেখ করেন নি। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, সৈয়দ-বংশীয় চারজন সুলতান বাংলা শাসন করেছিলেন এবং তাঁরা হলেন সুলতান আলা আল-দীন হুসাইন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯), নাসির আল - দীন নুসরাত শাহ্ (১৫১৯-১৫৩২), আলা আল-দীন ফিরুয শাহ্ (১৫৩২) এবং গিয়াস আল-দীন মাহ্মুদ শাহ্ (১৫৩২-১৫৩৮)[৩৩]। এ চারজনের মধ্যে কোন সুলতানেরই কালিদাস বা সুলায়মান খান নামক কোন অর্থ-মন্ত্রী কিংবা উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন এ মর্মে কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থেই উল্লেখ পাওয়া যায়না। তবে পূর্ব বঙ্গ গীতিকায় উল্লেখ আছে যে, রাজা ভগীরথের "বংশের বেটা" অর্থাৎ এক বংশধর কালিদাস, জাইনুদ্দিন, বাহাদুর এবং জেলাল উদ্দিন (?) পর পর এ তিন জনের দিওয়ান ছিলেন"[৪]। কিন্তু এ তিন জনকে কোন ক্রমেই সৈয়দ সুলতানদের সাথে অভিন্ন হিসেবে প্রতিপন্ন

Dhaka University Institutional Repository

করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত ঃ এম,এ,রহিমের বিবরণ হতে বুঝা যায় যে, ক্যালিদাস একজন একনিষ্ঠ ও ধর্ম-প্রাণ হিন্দু ছিল। তাই কোনরূপ বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে তাঁর পক্ষে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। কিন্তু এম,এ,রহিম এ সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। তৃতীয়তঃ একজন নব দীক্ষিত মুসলমানের নিকট সৈয়দ বংশীয় কোন সুলতানের কন্যাকে বিয়ে দেয়ার কথিত ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ ও আপত্তির কথা পূর্বের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থত ঃ এম, এ, রহিম উল্লেখ করেন যে , সুলায়মানের মৃত্যুর পর তাঁর দু'পুত্র ঈসা ও মুসাকে ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করে দেয়া হয়। অথচ অন্যত্র তিনি উল্লেখ করেন যে, সুলায়মানের দু'পুত্র ঈসা ও ইসমাইলকে বিক্রয় করে দেয়া হয়[৫৫]। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, তাঁর পরিবেশিত দুটি তথ্যের মধ্যে পারস্পরিক মিল নেই। পঞ্চমত ঃ তিনি আকবরনামার বরাত দিয়ে দাবী করেন যে, কুত্ব্ আল- দীন ঈসা খানের মাতুল । তাঁর এ তথ্যটিও সঠিক নয়। কেননা আকবর নামায় কুত্ব্ আল-দীনকে ঈসা খানের পিতৃব্য বলা হয়েছে[৫৬]। অন্যদিকে সুলায়মান খান যদি গিয়াস আল-দীন মাহ্মুদ শাহের কন্যার পাণি গ্রহণ করে থাকেন এবং কুত্ব্ আল-দীন ঈসা খানের মাতুল হন তবে তিনি অবশ্যই গিয়াস আল-দীন মাহ্মুদ শাহের পুত্র ছিলেন। কিন্তু রিয়ায আল-সালাতীন ,[৫৭] Husain Shahi Bengal[৫৮] এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, শের শাহের পুত্র জালাল খান এবং শের শাহের সেনাপতি খাওয়াস খান গৌড় অধিকারের সময় গিয়াস আল-দীন মাহ্মুদ শাহের দু'পুত্রকেই হত্যা করেন। পুত্র শোকে গিয়াস আল-দীন মাহ্মুদ শাহ্ মৃত্যুবরণ করেন। অতএব যেখানে গিয়াস আল-দীন মাহ্মুদ শাহের কোন পুত্রই জীবিত ছিলনা সেখানে এম, এ, রহিম কুত্ব্ আল-দীনকে কীভাবে ঈসা খানের মাতুল হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন বুঝা যায় না। যাহোক এম, এ, রহিমের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে ঈসা খানের পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

অতুল চন্দ্ররায় তাঁর History of Bengal- Mughal Period - গ্রন্থের ৫০ নং পৃষ্ঠায় "A short note on Isa Khan " শীর্ষক একটি অধ্যায় রচনা করেন[৫৯]। কিন্তু সেখানে তিনি ঈসা খানের বংশ পরিচয় সম্পর্কে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তাতে কোন নতুনত্ব নেই। বরং তিনি শুধু ঈসা খানের বংশ পরিচয় সংক্রান্ত আবুল ফযল, জেম্স্ ওয়াইজ , হেনরী বেভেরীজ ও এফ,বি, ব্রাডলী-বার্ট এর পরিবেশিত

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সমূহ এক স্থানে জড়ো করেছেন মাত্র। সুতরাং এ সম্পর্কে নতুন করে আলোচনার কিছুই নেই।

এবিষয়ে পরবর্তী আলোচ্য গবেষণাকর্ম হচ্ছে সাম্প্রতিক কালের গবেষকদের মধ্যে অন্যতম আবদুল করিম প্রণীত History of Bengal - Mughal Period - Vol I এবং বাংলার ইতিহাস ঃ মোগল আমল প্রথম খন্ড[৬০]। আবদুল করিম তাঁর রচনায় ঈসা খানের বংশ পরিচয় , বাল্য ইতিহাস, ঈসা খানের মসনদ-ই- আলা উপাধি, মুঘলদের সাথে ঈসা খানের সংঘর্ষ, ঈসা খানের রাজ্য এবং ঈসা খানের মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। ঈসা খানের পিতৃপরিচয় তথা বংশ পরিচয় সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি প্রথমে জেম্‌স্ ওয়াইজ কর্তৃক সংগৃহীত কাহিনী এবং আবুল ফযলের আকবরনামায় প্রদত্ত বিবরণ তুলে ধরেন এবং মত প্রকাশ করেন যে, "There is agreement between Abul Fazal and Wise, but very little is known about Isa Khan's early life." [৬১] এ যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তিনি জেম্‌স্ ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনী ও আবুল ফযলের আকবরনামার বিবরণ সত্য হিসেবে গ্রহণ করেন। এরপর তিনি ঈসা খানের পিতার নাম, ঈসা খানের পিতা হিসেবে কথিত কালিদাস গজদানীর সম্ভাব্য শ্বশুর অর্থাৎ তিনি বাংলার কোন সুলতানের কন্যার পাণি গ্রহণ করতে পারেন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে ভট্টশালীর অনুকরণে ১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দে আলা আল-দীন হুসাইন শাহের সিংহাসন আরোহণ থেকে শুরু করে ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে ঈসা খান কর্তৃক মুঘল নৌ-সেনাপতি শাহ্ বর্দীকে বাংলার পানি-সীমা থেকে বিতাড়ন পর্যন্ত সময়ের বাংলার সৈয়দ বংশীয়, সূর আফগান ও কাররানী সুলতানদের নাম এবং ক্ষমতায় আরোহণ ও শাসন কালের সময় সীমার একটি ধারাবাহিক চিত্র তুলে ধরেন। এক কথায় বলা যায় ঈসা খানের পিতৃপরিচয় তথা বংশ পরিচয় সংক্রান্ত ভট্টশালীর মতামতকেই তিনি সমর্থন করেন এবং পরিশেষে বলেন যে, "ঈসা খানের পিতার নাম কালিদাস গজদানী, মুসলমানী নাম সোলায়মান খান। সোলায়মান মূলতঃ অযোধ্যা থেকে আগত এবং বাইশ রাজপুত সম্প্রদায়ভুক্ত। পূর্ববঙ্গ গীতিকার মতে, ঈসা খানের পিতামহ ভগীরত প্রথমে ভাগ্যান্বেষণে বাংলায় আসেন এবং বাংলায় সুলতানের অধীনে দীওয়ানের চাকুরী গ্রহণ করেন। ঈসা খানের পিতা কালিদাসও পিতার মৃত্যুর পরে বাংলার সুলতানের দীওয়ানের পদ লাভ করেন। কালিদাস বাংলার সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্‌র মেয়ে বিয়ে করেন এবং মুসলমান হয়ে সোলায়মান খান নাম গ্রহণ করেন । সোলায়মান দিল্লীর সুর সুলতান সলীম শাহ্‌র (ইসলাম শাহ্)

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধে অন্ততঃ দুইবার বিদ্রোহ করেন। শেষ বারে তিনি নিহত হন এবং তাঁর দুই পুত্র ঈসা ও ইসমাইলকে বন্দী করে বিক্রি করে দেয়া হয়। কয়েক বৎসর পরে আনুমানিক ১৫৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ঈসা ও ইসমাইল তুরান থেকে আনীত হন এবং এর পরে ঈসা খানের কর্মময় ও গৌরবময় জীবনের শুরু হয়"[৬২]।

যুক্তিসঙ্গত কারণেই আবদুল করিমের সকল বক্তব্যের সাথে একমত হওয়া যায় না। প্রথমতঃ আবদুল করিম " There is agreement between Abul Fazal and Wise." অর্থাৎ "জেম্‌স্ ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনী এবং আবুল ফযলের বক্তব্যের মধ্যে মিল আছে" - বলে যে যুক্তি নির্দেশ করেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তিনি জেম্‌স্ ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনী এবং আবুল ফযলের বক্তব্য এ দু'টিকে পৃথক অর্থাৎ স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে উপস্থাপন করেন এবং এ দু'টি দলিলের মধ্যে পারস্পরিক মিল আছে - এ যুক্তির উপর ভিত্তি করেই ঈসা খানের পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন ; আর এতেই রয়েছে ঘোর- আপত্তি। এক্ষেত্রে সঠিক বক্তব্য হচ্ছে জেম্‌স্ ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনী এবং আবুল ফযলের বক্তব্য এ দু'টি পৃথক বা স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক দলিল নয়, বরং দু'টিই আবুল ফযলের বক্তব্য এবং আবুল ফযলের আইন- ই - আকবরীর সাহায্যেই ওয়াইজ ঈসা খানের পিতৃ পরিচয় সংক্রান্ত তাঁর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাই এ দু'টির মধ্যে পাস্পরিক মিল থাকা স্বাভাবিক। আবদুল করিম আরো উল্লেখ করেন যে, "ওয়াইজের সময়ে আবুল ফজলের আকবরনামা বা আইন-ই- আকবরী ইংরেজী ভাষায় অনুদিত হয়নি, ফলে তিনি ঐ প্রামাণ্য তথ্য ব্যবহার করতে পারেননি[৬৩]।" কিন্তু এমন অনেক তথ্য প্রমাণ রয়েছে যার ভিত্তিতে বলা যায় যে, জেম্‌স্ ওয়াইজ শুধু আবুল ফযলের আইন-ই-আকবরী ই ব্যবহার করেননি, বরং আকবরনামা ব্যবহার করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। এক্ষেত্রে প্রথম প্রমাণ জেম্‌স্ ওয়াইজ নিজেই। জেম্‌স্ ওয়াইজ ঈসা খান সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য প্রদানের সময় বলেন যে, "The Diwan Sahibs of Jangalbari and Haibatnagar in the Maimansingh district have furnished much of the following information ; but it is from Mr. Blochmann's invaluable Ain-i-Akbari that the authentic dates and actions of this great Bhuya have been obtained."[৬৪] জেম্‌স্ ওয়াইজের এ বক্তব্য থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ঈসা খানের বংশধরদের প্রদত্ত বিবরণ এবং ব্লখমানের আইন-ই-আকবরীর সাহায্যেই তাঁর বক্তব্য প্রণয়ন করেন। অন্যদিকে ব্লখমান কর্তৃক ১৮৭৩ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল -পত্রিকায় " Contributions to the Geography and History of

Dhaka University Institutional Repository

Bengal"[৬৫] - শীর্ষক রচিত প্রবন্ধের অনেক ক্ষেত্রেই আইন-ই-আকবরী ও আকবরনামা ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। এখন ব্লখমান কর্তৃক আইন-ই-আকবরী ও আকবরনামা ব্যবহারের কতিপয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা গেল: (ক) "Gaur lies in the middle between the Ganges and the Mahananda, thus occupying, as is the case in all Deltaic lands, the lowest site ; and east of it lies the Kallak Sajamarsh, called in the Ain Chuttia - pattia, into which the drainage of the town opened ."[৬৬] (খ) " the extent of Muhammadan Bengal was the same as what we find it in A.D. 1582, the year in which Todar Mall prepared his rent - roll of Bengal, a copy of which Abul Fazl has given in the Ain." [৬৭] (গ) "The losses of Akbar's Bengal army in Gaur will be found in my Ain translation, P 376."[৬৮] (ঘ) "In the Ain we find that Bengal proper was divided into 19 Sirkars, and 682 Mahalls."[৬৯] (ঙ) "The name B'azuha' is the plural of the Persian word bazu, 'an arm' a wing',... To this Sirkar belonged Dhaka, and Sherpur Murcha, or Mihmanshahi, south of Bagura on the Karataya, which is several times mentioned in the Akbarnamah as a military station."[৭০] (চ) "The Akbarnamah mentions a Makhcuc Khan, brother of Said Khan ; Vide my Ain translation, P.388. Makhcuc Khan served in Bengal and Bihar , and his brother Said Khan was for some time governor of Bengal."[৭১] (ছ) "As the name of Jahanabad occurs in the Akbarnamah , it has no connexion with Shahjahan's name, but refers more likely to one of the numerous Khan Jahans of the Pathan rule."[৭২] (জ) "So according to the Akbarnamah Stirling fixes an earlier date ; but Sulaiman reigned from A.H. 975 to 980. Besides, Akbar sent in 972 - 973 ambassadors to Mukand Deb."[৭৩] (ঝ) "Isa Khan. Abul Fazl calls him 'King of Bhati', and says that twelve zamindars were under him. He was powerful enough to make war with Koch Bihar. Vide Ain translation, P. 342, note." [৭৪]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ব্লখমান ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দেই আইন-ই-আকবরী ও আকবরনামা ব্যবহার করেছেন। ব্লখমান যেখানে ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে আইন-ই-আকবরী ও আকবরনামা ব্যবহার করতে পেরেছেন সেখানে জেম্‌স্‌ ওয়াইজ ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে এদু'টি উৎস ব্যবহার করেছেন বললে সম্ভবতঃ অযৌক্তিক হবে না। কেননা জানা যায় যে, ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে ব্লখমান ও জেম্‌স্‌ ওয়াইজের মধ্যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য আদান প্রদানের সম্পর্ক ছিল-যা ব্লখমানের নিম্নোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বক্তব্যই প্রমাণ করে; "For this period I shall take the kings singly , and collect for each reign whatever new information I have been able to gather from the rubbings received from General Cunningham, Dr. J. Wise , and Mr. E.V. Westmacott, C.S., and from unpublished Bengal coins in the Society's cabinet."[৭৫] এতদভিন্ন, জেম্‌স্‌ ওয়াইজের প্রবন্ধ পাঠ করলেই বুঝা যায় যে, তিনি আইন-ই-আকবরীর সাহায্য নিয়েছেন এবং ঈসা খানের পিতৃ পরিচয় (ঈসা খানের পিতার নাম, ধর্মান্তরণ ও মুসলিম সুলতানের কন্যার পাণি গ্রহণ ব্যতীত) সংক্রান্ত বক্তব্যের স্বপক্ষে আইন-ই-আকবরীর উল্লেখ করেছেন। যাহোক, ইহা পরিষ্কার যে, জেম্‌স্‌ ওয়াইজ ঈসা খানের বংশধরদের পরিবেশিত তথ্য এবং ব্লখমানের অনূদিত আইন-ই-আকবরীর সাহায্যেই ঈসা খান সম্পর্কিত বিবরণ প্রস্তুত করেন। আইন-ই-আকবরীর প্রথম খন্ডে ব্লখমান ঈসা খান সম্পর্কে টীকা লিখেন যে, "Isa's father, according to Abu'l Fazl, was a Rajput of the Bais clan, if I read correctly my MSS. He came in contact with Salim Khan and Taj Khan of Bengal, was killed ; and his two sons , Isa and Ismail, were sold as slaves. They were subsequently traced by Qutbu'd-Din Khan, Isa's uncle to Turan, and brought back."[৭৬] এ বিবরণে প্রতীয়মান হয় যে, ব্লখমান, আবুল ফযলের আকবরনামা থেকেই এ তথ্যাবলী সংগ্রহ করেন এবং জেম্‌স্‌ ওয়াইজও তাঁর প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে এখান থেকেই সাহায্য গ্রহণ করেন। ফলশ্রুতিতে জেম্‌স্‌ ওয়াইজের পরিবেশিত তথ্যাবলী ও আবুল ফযলের বক্তব্য এদু'য়ের মধ্যে মিল থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই জেম্‌স্‌ ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনী ও আবুল ফযলের বক্তব্যকে দু'টি পৃথক বা স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক দলিল বলা যাবে না, বরং বলা যায় যে, জেম্‌স্‌ ওয়াইজ ঈসা খান সম্পর্কে কোন নতুন তথ্য পরিবেশন করেননি, তিনি শুধু আবুল ফযলের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। এবং ইহা বলাও যৌক্তিক হবে না যে, জেম্‌স্‌ ওয়াইজ আইন-ই-আকবরী কিংবা আকবরনামা ব্যবহার করতে পারেন নি। যাহোক, জেম্‌স্‌ ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনী থেকে আইন-ই-আকবরীর তথ্যাবলী পৃথক করে নিলে অবশিষ্ট যা থাকবে তা ঈসা খানের বংশধরদের পরিবেশিত তথ্যাবলী এবং তা হচ্ছে এই যে, "The family tradition is , that during the reign of Husain Shah (1493 to 1520), Kalidas Gajdani, … of Audh, became a Muhammadan, and received the title of Sulaiman Khan . He afterwards married a daughter of the reigning monarch …… He left three children, Isa, Ismail, and a daughter afterwards known as Shahinshah Bibi.

Dhaka University Institutional Repository

Isa Khan is said to have married Fatimah Khatun, a cousin of his own, and grand-daughter of Husain Shah of Bengal." সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আবদুল করিম,জেম্‌স্‌ ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনী ও আবুল ফযলের বক্তব্যের মধ্যে মিল রয়েছে বলে যে মত প্রকাশ করেন - তা শুধু আইন-ই-আকবরী থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলীর সাথেই। কিন্তু ঈসা খানের বংশধরদের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলীর সাথে আবুল ফযলের বক্তব্যের কোন মিল নেই। তাই যুক্তি সংগতভাবেই নির্দ্বিধায় বলা যাবেনা যে, জেম্‌স্‌ ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনীর সাথে আবুল ফযলের বক্তব্যের মধ্যে মিল রয়েছে । অন্যদিকে ঈসা খানের বংশধরদের প্রদত্ত তথ্যাবলীর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আবদুল করিম নিজেই স্বীকার করেছেন যে, মসনদালি ইতিহাস, দেওয়ান ইশা খাঁর পালা এবং দেশে প্রচলিত কিংবদন্তী এ তিনটির কোনটি সূত্রই প্রামাণ্য নয়[৭৭]। তাই এ সূত্রগুলোর উপর ভিত্তি করে ঈসা খানের বংশ পরিচয় সম্পর্কে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অমূলকই বটে। তৃতীয়তঃ আবদুল করিম ভট্টশালীর পদাংক অনুসরণ করে দাবী করেন যে, কালিদাস গজদানী ওরফে সুলায়মান খান বাংলার সুলতান গিয়াস আল-দীন মাহ্‌মুদ শাহের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে, যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে তা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। অন্যদিকে ইহা সর্বজনবিদিত যে, শের শাহের শাসন আমলে বাংলার শাসনকর্তা খিযির খান যখন গিয়াস আল-দীন মাহ্‌মুদ শাহের কন্যার পাণি গ্রহণ করে বাংলার সুলতানদের মত চৌকিতে বসেন তখন খিযির খানের বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের চরম আকার ধারণ করার সুযোগ না দিয়ে প্রথমেই তাঁকে শাস্তি প্রদান করা হয়[৭৮]। কিন্তু গিয়াস আল-দীন মাহ্‌মুদ শাহের জামাতা হিসেবে কথিত কালিদাস গজদানী তথা সুলায়মান খান যখন ইসলাম শাহের বিরুদ্ধে প্রথমবার বিদ্রোহ করেন তখন খিযির খানের ন্যায় প্রথমেই তাঁকে শাস্তি প্রদান না করে ক্ষমা প্রদর্শনপূর্বক দ্বিতীয়বার বিদ্রোহ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে কেন, তা বোধগম্য নয়। এ ক্ষেত্রে সঠিক বক্তব্য হচ্ছে এই যে, কালিদাস গজদানী তথা সুলায়মান খানকে গিয়াস আল-দীন মাহ্‌মুদ শাহের জামাতা হিসেবে প্রতিপন্ন করা যাবে না, কেননা তিনি যদি গিয়াস আল-দীন মাহ্‌মুদ শাহের জামাতাই হতেন তবে নিশ্চয়ই খিযির খানের মতো তাঁকেও দ্বিতীয়বার বিদ্রোহ করার সুযোগ না দিয়ে প্রথমেই শাস্তি প্রদান করা হতো। তাই আবদুল করিমের এ ধারণার সাথে একমত হওয়া যায় না। চতুর্থতঃ আবদুল করিম উল্লেখ করেন যে, " পূর্ববঙ্গ গীতিকার মতে , ঈসা খানের পিতামহ ভগীরত প্রথমে ভাগ্যান্বেষণে বাংলায় আসেন এবং বাংলায় সুলতানের

Dhaka University Institutional Repository

অধীনে দীওয়ানের চাকুরী গ্রহণ করেন। ঈসা খানের পিতা কালিদাসও পিতার মৃত্যুর পরে বাংলার সুলতানের দীওয়ানের পদ লাভ করেন। কালিদাস বাংলার সুলতান গিয়াস উদ-দীন মাহমুদ শাহ্‌র মেয়ে বিয়ে করেন এবং মুসলমান হয়ে সোলায়মান খান নাম গ্রহণ করেন''। পূর্ব বঙ্গ গীতিকার দেওয়ান ইশা খাঁর পালায় এ বিষয়ে কি বলা হয়েছে তা এখন নিম্নে উপস্থাপন করা হচ্ছেঃ

" দিশা বাজে রে বাজে রে ডঙ্কা
দেওয়ান ঈশা খাঁর নামে।।
পশ্চিম মাহালে দেশ ভাই রে, শুন দিয়া মন।
ধনপত্ সিং নামে আছিল এক জন।
তালেবর সেইনা রাজা, রাজার ধন অদুন্যাই।
বান্দী গোলাম কত আছিল লেখা জুখা নাই।।

দিল্লীর বাদশার সাথে দুস্তি তার ভারী।
আপদে বিপদে থাকে ছেঁওয়ার মতন ঘিরি।।
তার বংশের এক বেটা রাজা ভগীরথ।
জান দিয়া করে মিয়া পরজার যত হিত।।

সেই না দয়াল রাজার কথা শুন্ খাইন্ দিয়া মন।
হজ কামাইতে আইস্‌লাইন রাজা বাংলা ভুবন।।
নানান জাগা ঘুইরা আইল গৌড়ের সরে।
গয়াস উদ্দিন নবাব যথায় রাজত্তি করে।।
....
ভগীরথরে চিন্যা ভালা কত যতন করিয়া।
নবাব রাখিল তারে দেওয়ান গিরি দিয়া।।
....
তার যে বংশের বেটা দেওয়ান কালিদাস।
জইনুদ্দিনের দেওয়ান হইয়া গৌড়ে করে বাস"[১৬]।।

এ বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পশ্চিম দেশে (?) ধনপত সিংহ নামে দিল্লীর বাদশাহের (?) একজন ক্ষমতাশালী মিত্র রাজা ছিলেন। ভগীরথ নামক তাঁর এক বংশধর তীর্থ পর্যটন উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে আগমন করেন। বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

"নবাব গয়াস উদ্দিন" (?) তাঁকে যথোচিত সমাদর করেন এবং দিওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। রাজা ভগীরথের পরে কালিদাস নামে তাঁর এক বংশধর বাংলার "নবাব জইনুদ্দিনের"(?) অধীনে দিওয়ানের পদ লাভ করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এ বিবরণে ভগীরথকে ধনপত সিংহের পুত্র বলা হয়নি, বরং তাঁকে ধনপত সিংহের "বংশের এক বেটা" অর্থাৎ একজন বংশধর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া ভগীরথের বাংলায় আগমনের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে পুণ্য অর্জনার্থে বা তীর্থ পর্যটন উপলক্ষে আগমন, ভাগ্যান্বেষণের জন্য নয়। অন্য দিকে কালিদাসকে ভগীরথের "বংশের বেটা" তথা বংশধর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, ভগীরথের পুত্র হিসেবে নয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আবদুল করিম পূর্ববঙ্গ গীতিকার বরাত দিয়ে ভগীরথকে ঈসা খানের পিতামহ তথা কালিদাসের পিতা হিসেবে চিহ্নিত করার যে প্রয়াস করেন তা সঠিক নয়। এমনকি পূর্ববঙ্গ গীতিকার সাথে তাঁর বক্তব্যের পারস্পরিক মিলও নেই। উপরন্তু পূর্ববঙ্গ গীতিকার দেওয়ান ইশা খাঁর পালার ভূমিকায় দীনেশ চন্দ্রসেন বলেন যে, " এই পালায় আরও উক্ত হইয়াছে, ধনপতের বংশধর ভগীরথ বঙ্গদেশে বসতি স্থাপন করেন এবং কালিদাস এই ভগীরথের বংশধর। পূর্বোক্ত রাজপুতদের মধ্যে কেহ কাহারও পিতা বা পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হন নাই। কালিদাসকে ভগীরথের এবং ভগীরথকে ধনপতের বংশধর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে"[৬৩]। যাহোক, আবদুল করিমের প্রদত্ত ঈসা খানের কথিত পিতা ও পিতামহ সম্পর্কিত মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। পঞ্চমতঃ আবদুল করিম জেম্‌স্ ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনী, মসনদালি ইতিহাস এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকা এ তিনটি সূত্রের উপর ভিত্তি করেই কালিদাস গজদানীকে ঈসা খানের পিতা হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু জেম্‌স্ ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনী ও মসনদালি ইতিহাস - এ দু'টির কোনটিই নির্ভরযোগ্য নয়। তাছাড়া কোন সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থে ঈসা খানের পিতা হিসেবে কথিত ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় না। অন্যদিকে ঈসা খানের পিতা হিসেবে কথিত কালিদাস গজদানীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সুলায়মান খান নাম ধারণ এবং বাংলার সুলতানের কন্যার পাণি গ্রহণ সংক্রান্ত পূর্ববঙ্গ গীতিকার দেওয়ান ইশা খাঁর পালায় প্রদত্ত বিবরণ যে, অবাস্তব ও অযৌক্তিক তা নিম্নোক্ত বিবরণ পাঠে অনুভূত হবে।

> " তার (ভগীরথ) যে বংশের বেটা দেওয়ান কালিদাস।
> জইনুদ্দিনের দেওয়ান হইয়া গৌড়ে করে বাস।।

Dhaka University Institutional Repository

না আছিল সুন্দর পুরুষ ভাইরে দুনিয়ায় এমুন।
ঝিলি মিলি করে রূপ জিনিয়া তপন।।

আন্ধাইর ঘরেতে দেওয়ান থাকে যুদি বইয়া।
গায়ের জোচ্‌নায় যায় ঘর পশর হইয়া।।
এমন সুন্দর রূপ না হয় কদাচন।
রূপেত জিইন্যাছে দেওয়ান রতির মদন।।

নিত্যি নিত্যি সোনার হাত্তি বামুনরে করে দান।
কালিদাস গজদানী তেই হইল তার নাম।।

বাহাদুর ছায়েব হইল পরে গৌড়ের নবাব।
রোজা নামাজ দান খয়রাতে কামাইল ছওহাব।।

বেটা পুত্র নাই সে হইল তান্‌ দিলে হইল দুখ্‌।
রাজার সোংসার ছাইড়্যা তানি গেলাইন্‌ বেস্ত লোক।।
তার পর হইল নবাব মিয়াঁ জেলাল উদ্দিন।
তান্‌ আমলেও আছলাইন্‌ কালিদাস দেওয়ান।।

মমিনা খাতুন তানার কইন্যা একজন।
এমুন সুন্দর যেমুন আশমানের চান।।

সেইত সুন্দর কইন্যা একদিন গুছুল কইরতে যায়।
হাবসি সকলে তার চলে পায় পায়।।
উলা মেলা কইরা কন্যা পন্থে দিল মেলা।
পন্থ মধ্যে কালিদাসেরে দেখিল একেলা।।
নয়ান ভরিয়া কইন্যা দেওয়ানরে দেখিল।
দেইখ্যা সুন্দর কইন্যা উন্মত্ত পাগল হইল।।

তার পরে কি হইল ভাইরে, শুন দিয়া মন।
লিখন লিখিল কনন্যা করিয়া যতন।।

Dhaka University Institutional Repository

মন দিয়া কালিদাস লিখন পড়িল।।
লিখন পড়িয়া দেওয়ান হাসে মনে মনে।
তার পরে লিখিল উত্তর অতি সঙ্গোপনে।।
শুন কইন্যা, আরজ আমার শুন দিয়া মন।
তোমার লাগিয়া আমার দুঃখিত পরাণ।।
আমি হই হিন্দু আর তুমি মুছুল মান।
সাদী কেমনে হইব নইলে সমানে সমান।।
পরাণ থাকিতে নাই সে আমি মুছুলমান হইব।
রূপের লাগিয়া আমি জাতি নাই সে দিব।।
দুয়ারে দুয়ারে খাইবাম্ ভিক্ষা সে মাগিয়া।
ধর্ম না ডুবাইবাম কইরা মুছুলমান বিয়া।।

ধরম যদি ডুবাই কইন্যা হেলা সে করিয়া
সাত জন্ম যাইব আমার দুজক ভুগিয়া।।

মমিনা খতুন লিখন পইড়্যা পাইল লাজ।
দেওয়ানের কথা শুইন্যা পইড়ল মাথায় বাজ।

ভাইব্যা চিন্ত্যা কইন্যা আরে কিকাম করিল।
ছলে কালিদাসের জাতি মাইরতে যুক্তি কইরল।

ফন্দি করিল গোস্তের খানা তৈয়ার করিয়া।
এইনা চাকররে দিয়া দিব পাঠাইয়া।।

গরুর গোস্ত দিয়া আর ছালুন বানাইয়া।
কুর্মা কোপ্তা, আর ও কতখানা দিল পাঠাইয়া।।

খানা খায়্যা কালিদাস খুশী হইল মনে।
রজনী গুয়াইল বড়ো হরষিত মনে।।
পরভাতে উইঠ্যানা চাকর কয় তার নিকটে।
কালুকা রাইতে গরুর গোস্ত খাওয়াইছে কপটে।।

Dhaka University Institutional Repository

গরুর গোস্ত খাইছ তুমি জাইত্না রহিল।
এই না বইলা চাকর বেটা চম্পট মারিল।।

চাকরের কথা শুইন্যা কান্দে দেওয়ান কালি দাস।
কার সল্লাতে চাকর আমার কইরল সর্বনাশ ।।

জাইত যাউয়া হয়্যা আরনা রাইখ্বাম্ পরাণি।
গলাতে কলসী বাইন্ধ্যা ডুবি বাম অখনি।।
জেলাল উদ্দিন নবাব না এই কথা শুনিয়া।
পন্থ হইতে দেওয়ানরে আনিল ধরিয়া।।
বারাৎ বসাইয়া তারে মধুর বচনে।
বুঝাইল তারে মিয়া ডাইক্যা সঙ্গোপনে।।

মুছুলমান হইছ যদি শুন মনদিয়া।
আমার যে কইন্যা আছে তারে কর বিয়া।।

বেটা পুত্র নাই মোর জানো তুমি ভালো।
আমি মইলে আমার যত পাইবা সগল।।
ধন দৌলত্ যত আছে সগল তোমার।
মুছলমান হইছ তাতে সুখ হইব অপার ।।
এই কথা শুইন্যা দেওয়ান চিন্তে মনে মনে।
পাগলামি করি আমি কিসের কারণে।।

তার পরেত শুইন্যা রাখো যত মমিন গণ।
কালিদাসের নাম হইল দেওয়ান ছোলেমান।।

সাদী কইর্যা সোলেমান চিত্তে খুশী হইয়া ।
মমিনা খাতুনের সাথে গেল যে মিলিয়া।।
তার গর্ভে পয়দা হইল পুত্র দুইজন।
বাইছ্যা রাখে দাউদ, ইশা খাঁ নাম।।

Dhaka University Institutional Repository

পনর বছর সোলেমান নবাবী করিয়া।
খোদার আদেশে গেল বেহেস্তে চলিয়া।।

তার পরে দাউদ খাঁ গৌড়ের মালিক হইল।
গর্ব কইরা দিল্লীর খেরাজ বন্ধ কইর‍্যা দিল।।

ভারী জঙ্গ হইল সেঈনা গৌড়ের ময়দানে।
মরিল দাউদ খাঁ জঙ্গেনা বাঁইচল পরাণে।।
তার পরেনা মালিক হইল ঈশা খাঁ দেওয়ান।
জানদিয়া পালে পরজা পুত্রের সমান"[৮১]।।

উপরোক্ত বিবরণ থেকে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী পাওয়া যায়ঃ

ক) ভগীরথের এক বংশধর দিওয়ান কালিদাস ছিলেন বাংলার শাসক "জইনুদ্দিনের" দিওয়ান। কালিদাস অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন এবং ব্রাহ্মণদেরকে সোনার হাতী দান করে গজদানী উপাধি লাভ করেন।

খ) কালিদাস গজদানী "জইনুদ্দিন", "বাহাদুর", "জেলাল উদ্দিন" (?) পর পর এ তিন জন শাসকের দিওয়ান ছিলেন।

গ) "মমিনা খাতুন" নামে "জেলাল উদ্দিনের" এক সুন্দরী কন্যা ছিল। একদিন স্নান করতে যাওয়ার পথে কালিদাসকে দর্শন মাত্রই "মমিনা খাতুন" তাঁর প্রেমে পড়ে যায় এবং পত্র মারফত কালিদাসকে প্রেম নিবেদন করে। কালিদাস ধর্মের দোহাই দিয়ে "মমিনা খাতুনের" প্রেম নিবেদনে সাড়া প্রদানে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। এর ফলে "মমিনা খাতুন" অনন্যোপায় হয়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কালিদাসের ধর্ম - নাশের পরিকল্পনা করে এবং গরুর গোশ্‌ত খাইয়ে কালিদাসকে বেকায়দায় ফেলে। কালিদাস জাত নাশের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার সংকল্প করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) এ সংবাদ শ্রবণে "জেলাল উদ্দিন" কালিদাসকে নানা ভাবে প্রবোধ দেয় এবং তাঁর কন্যা "মমিনা খাতুন"কে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। কালিদাস "জেলাল উদ্দিনের" মৃত্যুর পর রাজত্ব পাওয়ার লোভে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সুলায়মান খান নাম ধারণ করে "মমিনা খাতুন"কে বিয়ে করেন।

ঙ) "মমিনা খাতুনের" গর্ভে দায়ূদ ও ঈসা খান নামে সুলায়মানের দু'পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে। পনর বছর রাজত্ব করার পর সুলায়মান খান মৃত্যুবরণ করেন এবং দায়ূদ খান রাজত্ব লাভ করেন।

চ) দায়ূদ খান দিল্লীর বাদশাহের (?) সাথে গৌড়ের যুদ্ধে নিহত হওয়ার পর তাঁর অপর ভ্রাতা ঈসা খান রাজত্ব লাভ করেন।

দেওয়ান ইশা খাঁর পালায় পরিবেশিত এ তথ্যাবলীর কোন ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া আবদুল করিম ঈসা খানের পিতা হিসেবে কথিত কালিদাস গজদানী বাংলার সুলতান গিয়াস আল-দীন মাহ্‌মুদ শাহের কন্যার পানি গ্রহণ করেছেন বলে যে মত প্রকাশ করেন তাও যৌক্তিক বলে মনে হয় না। কেননা উপরোক্ত বিবরণে দেখা যায় যে, কালিদাস গজদানী যে তিনজন শাসকের অর্থাৎ "জইনুদ্দিন", "বাহাদুর" ও "জেলাল উদ্দিনের" অধীনে দিওয়ান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলে কথিত হয়েছেন, তাদের কাউকেই যে সৈয়দ সুলতানদের অর্থাৎ হুসাইন শাহ্‌, নুসরাত শাহ্‌, ফিরুয শাহ্‌ কিংবা মাহ্‌মুদ শাহের সাথে অভিন্নরূপে প্রতিপন্ন করা যাবেনা তা পূর্বের আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে।

যাহোক, উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ঈসা খানের পিতৃ পরিচয় সংক্রান্ত আবদুল করিমের বক্তব্য ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে গ্রহণ করা যায় না এবং তাঁর বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে ঈসা খানকে কালিদাস গজদানী নামক কথিত ধর্মান্তরিত ব্যক্তির পুত্র হিসেবেও চিহ্নিত করা যায় না।

এ পর্যন্ত বিভিন্ন ইউরোপীয় ও বাঙালী গবেষকদের প্রদত্ত ঈসা খানের বংশ পরিচয় তথা পিতৃ পরিচয় সংক্রান্ত বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তাঁদের বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে যথা সম্ভব আলোচনা করা হয়েছে। এখন এ বিষয়ে এক মাত্র সমসাময়িক ঐতিহাসিক আবুল ফযল রচিত আইন-ই-আকবরী

Dhaka University Institutional Repository

ও আকবরনামায় পরিবেশিত তথ্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ আবুল ফযল আইন -ই- আকবরীতে ঈসা খান সম্পর্কে বলেন যে, "The tract of country on the east called Bhati. is reckoned a part of this province. It is ruled by Isa Afghan and the Khutbah is read and the coin struck in the name of his present Majesty... Adjoining it, is an extensive tract of country inhabited by the Tipperah tribes. The name of the ruler is Bijay Manik."[৮২] আবুল ফযলের এ বক্তব্য থেকে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী পাওয়া যায় ঃ

ক) এ প্রদেশের (বাংলা) ভাটি নামে পরিচিত পূর্বাঞ্চল এ প্রদেশের অন্তর্গত বলিয়াই গণ্য করা হয়।

খ) ইহা ঈসা আফগানের শাসনাধীন এবং তাঁর বর্তমান বদশাহ্ / সুলতানের নামেই খুৎবা পাঠ ও টাকা মুদ্রিত হয়।

গ) ইহার (ভাটির) সংলগ্ন এক বিস্তৃত অঞ্চলে তিপ্রা জাতির বাস । (তাদের) শাসকের নাম বিজয় মাণিক্য।

আবুল ফযলের বক্তব্যে দেখা যায় যে, তিনি ঈসা খানকে একজন আফগান এবং ভাটি অঞ্চলের শাসক হিসেবে অভিহিত করেছেন। ঈসা খান কর্তৃক খুৎবা পাঠ ও টাকা মুদ্রণের উল্লেখ করলেও আবুল ফযল বলেননি যে, ঈসা খান কার নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রাংকন করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি ঈসা খানের "Present Majesty" বলতে কাকে বুঝিয়েছেন? তবে ঈসা খানের নামোল্লেখের সাথে সাথে ত্রিপুরার রাজা বিজয় মাণিক্যের নাম উল্লেখ করায় বুঝা যায় যে, ঈসা খান বিজয় মাণিক্যের সমসাময়িক ছিলেন। জানা যায় যে, বিজয় মাণিক্য ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫৭১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন [৮৩]। সুতরাং বলা যায় যে, ঈসা খান ১৫৭১ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে এবং ১৫৭১ খ্রীস্টাব্দের দিকে ভাটি অঞ্চলের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। যদি ঈসা খান কোন সুলতান বা শাসকের নামে খুৎবা পাঠ করেই থাকেন তবে তা নিশ্চয়ই কারারানী শাসকের নামেই (যদিও তা প্রমাণ সাপেক্ষ)। অবশ্য ঈসা খান কর্তৃক মুদ্রাজারীর ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। কেননা বংলার কোন সুলতানের নামাংকিত ঈসা খান কর্তৃক জারীকৃত কোন মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। যাহোক , আবুল ফযলের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ১৫৭১ খ্রীস্টাব্দে ভাটি অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন ঈসা খান এবং তিনি ছিলেন একজন আফগান। অন্যদিকে

Dhaka University Institutional Repository

আবুল ফযল আকবর নামায় ঈসা খান সম্পর্কে বলেন যে, "The father of this chief (bumi) belonged to the Bais tribe of Rajputs. In that fluviatile region he continually displayed presumption and refractoriness. In the time of Selim k., Taj K. and Darya K. went to that country with large forces, and after many contests he came in and surrendered. In a short while he again rebelled. They managed by a trick to get hold of him and sent him to the abode of annihilation, and sold his two sons Isa and Ishmael to merchants. When the cup of Selim K.'s life was full , and Taj K. became predominant in Bengal, Qutbu-d-din, the paternal uncle of Isa, obtained glory by good service, and by making diligent search brought back both brothers from Turan." ** আকবরনামায় আবুল ফযল প্রদত্ত বিবরণ থেকে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী পাওয়া যায়ঃ

ক) ঈসা খানের পিতা রাজপুতদের বাঈস সম্প্রদায়ভুক্ত লোক ছিলেন। ভাটি অঞ্চলে তিনি অবিরাম আস্পর্দ্ধা ও অবাধ্যতা প্রদর্শন করতেন। সেলিম খানের শাসনামলে তাজ খান ও দরিয়া খান বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঐ দেশে গমন করেন এবং অনেক সংঘর্ষের পর তিনি পরাজিত হন এবং আত্মসমর্পণ করেন। কিছুদিন পর তিনি পুনরায় বিদ্রোহী হন। তাঁরা (তাজ খান ও দরিয়া খান) কৌশলে তাঁকে আটক করেন এবং হত্যা করেন এবং তাঁর দু'পুত্র ঈসা ও ইসমাইলকে বণিকদের নিকট বিক্রয় করে দেন।

খ) সেলিম খানের মৃত্যুর পর তাজ খান যখন বাংলায় আধিপত্য লাভ করেন, তখন ঈসা খানের পিতৃব্য কুতব্ আল-দীন ভাল কর্মের দ্বারা খ্যাতি অর্জন করেন এবং অনেক অনুসন্ধান করে দু'ভাইকেই (ঈসা ও ইসমাইল) তুরাণ দেশ থেকে ফিরিয়ে আনেন।

প্রায় সকল ইউরোপীয় ও বাঙালী ঐতিহাসিকই কোনরূপ বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকেই আবুল ফযলের বিবরণ ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সঙ্গত কারণেই আবুল ফযলের বক্তব্যের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা যায় না। প্রথমত ঃ আবুল ফযল আইন-ই- আকবরী-তে ঈসা খানকে একজন 'আফগান' হিসেবে অভিহিত করেন। অথচ আকবর নামায় তিনি ঈসা খানকে রাজপুত তথা হিন্দু বংশোদ্ভূত হিসেবে উল্লেখ করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে,

Dhaka University Institutional Repository

আবুল ফযলের পরিবেশিত দু'টি তথ্যের মধ্যে কোন রূপ পারস্পরিক মিল নেই। তাই আবুল ফযলের বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা সন্দেহ সাপেক্ষ । দ্বিতীয়তঃ আবুল ফযলের দাবী মতে ঈসা খান বাঈস রাজপুত সম্প্রদায়ভুক্ত একজন রাজপুতের পুত্র। এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সন্দেহ থাকাই স্বাভাবিক। কেননা একজন রাজপুত তথা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি কীভাবে মুসলিম সন্তানের পিতা হন তা বোধগম্য নয়। যদি তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে থাকেন তা হলে হয়তো বিষয়টির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকতোনা । কিন্তু ঈসা খানের পিতা হিসেবে কথিত রাজপুতের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ সংক্রান্ত কোন ইঙ্গিত আবুল ফযলের বিবরণে পাওয়া যায় না। তাই আবুল ফযলের এ বক্তব্য সত্য বলে প্রতীয়মান হয় না। তৃতীয়তঃ কোন মুসলিম সুলতান বা শাসক কর্তৃক পরাজিত ও নিহত কোন বিদ্রোহীর পুত্রদেরকে ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করে দেয়ার কথিত ঘটনার কোন নযীর ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া এ বিষয়ে সন্দেহের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। চতুর্থতঃ আবুল ফযল তাঁর বক্তব্যের প্রথমে উল্লেখ করেন যে, ঈসা খানের পিতা রাজপুতদের বাঈস সম্প্রদায়ভুক্ত লোক ছিলেন। অথচ পরে উল্লেখ করেন যে, ঈসা খানের পিতৃব্য কুতব্ আল-দীন তাঁদেরকে অনেক অনুসন্ধানের পর তুরাণ থেকে বাংলায় ফিরিয়ে আনেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আবুল ফযলের পরবর্তী বক্তব্যটি তাঁর প্রথম বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে শুধু সন্দেহেরই সৃষ্টি করেনি বরং কয়েকটি প্রশ্নেরও জন্ম দেয়। একজন রাজপুত তথা হিন্দু পিতার পুত্রদের পিতৃব্য একটি মুসলিম এবং স্পষ্টত ঃ আফগান নামের অধিকারী হলেন কীভাবে? কুতব্ আল-দীন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কি? যদি তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে থাকেন তবে ঈসা খান একজন মুসলিম পিতামহ ব্যতিরেকে একজন মুসলিম পিতৃব্য পেলেন কীভাবে? কিন্তু আবুল ফযলের বিবরণে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না । এবং এ কারণেই আবুল ফযলের বক্তব্যের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। অতএব বলা যায় যে, ঈসা খানের পিতৃ পরিচয় তথা বংশপরিচয় সংক্রান্ত আবুল ফযলের বক্তব্য পরস্পরবিরোধী ও বিভ্রান্তিকর।

যাহোক, এ পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে তাতে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রথমতঃ আলোচিত লেখকগণ তাঁদের বক্তব্যের স্বপক্ষে যে সব সূত্রের উল্লেখ করেন সে গুলো হচ্ছে "জেম্স ওয়াইজ কর্তৃক সংগৃহীত কাহিনী", মসনদালি ইতিহাস, দেশে প্রচলিত কিংবদন্তী, সমসাময়িক কালের অনেক পরে গ্রাম্য কবিদের রচিত গাথা-সঙ্গীত বা পালাগান এবং একমাত্র সমসাময়িক

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক আবুল ফযল কর্তৃক রচিত আইন-ই-আকবরী ও আকবরনামা । কিন্তু আইন-ই-আকবরী ও আকবরনামা ব্যতীত এ সূত্রগুলোর কোনটিই সমসাময়িক নয় এবং এ গুলোতে পরিবেশিত ঈসা খানের পিতৃপরিচয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী সন্দেহাতীত প্রমাণিত হয় নি। অন্যদিকে আইন-ই-আকবরী ও আকবর নামায় আবুল ফযল অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও পরস্পরবিরোধী তথ্য প্রদান করে শুধু স্ববিরোধীতারই পরিচয় দেননি বরং বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়তঃ আলোচিত লেখকদের অনেকেই কোনরূপ যুক্তি প্রদর্শন ব্যতিরেকেই তাঁদের পূর্ববর্তীদের বক্তব্য গ্রহণ করেছেন এবং এর উপর ভিত্তি করেই নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করেন। তাই সঙ্গত কারণেই তাঁদের সাথে একমত হওয়া যায় নি। অবশ্য দু'তিন জন ঐতিহাসিক যে নিজস্ব বিচার বিশ্লেষণের আলোকে তাঁদের পূর্ববর্তীদের বক্তব্য সমর্থন করেন নি তাও নয়। তৃতীয়তঃ আলোচিত লেখকদের মধ্যে অনেকেই যেমন- হেনরী বেভেরীজ, ভট্টশালী , এম, এ, রহিম এবং আবদুল করিম আইন -ই-আকবরী ও আকবরনামা ব্যবহার করা সত্ত্বেও তাঁরা একটি বিষয় লক্ষ্য করেন নি বা এড়িয়ে গেছেন, বিষয়টি হচ্ছে এই যে, আবুল ফযল আইন-ই-আকবরী তে ঈসা খানকে একজন আফগান হিসেবে অভিহিত করেন, অথচ আকবর নামায় তাঁকে রাজপুত বংশোদ্ভূত তথা ঈসা খানের পিতাকে রাজপুতদের বাঈস সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন। এ ক্ষেত্রে আলোচিত ঐতিহাসিকগণ আইন-ই-আকবরীর বক্তব্য উপেক্ষা করেন কোনরূপ ব্যাখ্যা - বিশ্লেষণ ব্যতিরেকেই। এবং আকবর নামার বিবরণের উপর ভিত্তি করেই তাঁরা ঈসা খানের পিতৃপরিচয় সম্পর্কে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। তাছাড়া আবুল ফযল প্রথমে আইন-ই-আকবরীতে ঈসা খানকে "ঈসা আফগান" বলে কেন পরে আকবর নামায় রাজপুত বংশোদ্ভূত হিসেবে উল্লেখ করে যে জটিলতার সৃষ্টি করেন সে সম্পর্কে তাঁরা কোন আলোচনাই করেন নি। এতে বুঝা যায় যে, তাঁরা হয়তো বিষয়টি অসাবধানতা বশতঃ লক্ষ্য করেননি নতুবা আবুল ফযল কর্তৃক সৃষ্ট জটিলতা সমাধানের ধৈর্য তাঁদের ছিল না। অবশ্য একমাত্র হেনরী বেভেরীজ আবুল ফযল সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের ক্ষীণ ও দুর্বল প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "This seems to indicate that the Ain was written first, and before Abul Fazl had received correct information."[৮৭] এ ক্ষেত্রে বেভেরীজের বক্তব্যের সাথে একমত হওয়া যায় না । কেননা আবুল ফযল যদি সঠিক তথ্য পাওয়ার পর আকবর নামা লিখে থাকেন তবে তিনি বাংলার রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক বিবরণ প্রদানের সময় ভুল তথ্য পরিবেশন করলেন কেন? উল্লেখ্য যে, আবুল ফযল আকবর নামায় সমগ্র বাংলাকে

Dhaka University Institutional Repository

বাদশাহ আকবরের কর্তৃত্বাধীন বলে উল্লেখ করেন। অথচ বর্তমানে সকলেই স্বীকার করেন যে, আকবরের জীবদ্দশায় মুঘল অধিকার বা আধিপত্য শুধু বাংলার পশ্চিমাংশেই সীমিত ছিল। অন্য দিকে আবুল ফযল আকবর নামায় বাংলার ভৌগোলিক পরিচিতি দিতে গিয়ে বাংলা ও ভাটি অঞ্চলের যে সীমা নির্দেশ করেন তা আধুনিক ঐতিহাসিকদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি[৮৬]। তাই বেভেরীজ, আবুল ফযল কর্তৃক সঠিক তথ্য পাওয়ার পূর্বে আইন-ই-আকবরী রচিত হয়েছে বলে যে যুক্তি প্রদর্শন করেন তা সঙ্গত কারণেই গ্রহণযোগ্য নয়। চতুর্থতঃ অন্ততঃ একজন ঐতিহাসিক (সতীশ চন্দ্র মিত্র) আবুল ফযলের বক্তব্যের পরিপূর্ণ যথার্থতা সম্পর্কে সতর্ক সংশয় প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে দু'জন লেখক আবুল ফযলের আইন-ই-আকবরীর অনুসরণে ঈসা খানকে একজন আফগান ও আফগান নেতা হিসেবে অভিহিত করেন। পঞ্চমতঃ অধিকাংশ লেখকই ঈসা খানকে একজন রাজপুত তথা হিন্দু বংশোদ্ভূত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের স্বপক্ষে কোন সন্তোষজনক যুক্তি প্রদর্শন কিংবা একমাত্র আবুল ফযলের আকবরনামায় প্রদত্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিবরণ ব্যতিরেকে অন্য কোন সমসাময়িক বা প্রামাণ্য দলিল উপস্থাপন করতে পারেন নি।

অতএব দেখা যায় যে, ঐতিহাসিকগণ তাঁদের বক্তব্যের স্বপক্ষে আবুল ফযলের আইন-ই- আকবরী ও আকবরনামা ব্যতীত অন্য কোন সমসাময়িক ও নির্ভরযোগ্য দলিল উপস্থাপন করতে পারেন নি। অন্যদিকে ঐতিহাসিকগণ আবুল ফযলের স্ববিরোধী ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্যের দ্বারা বিভ্রান্তির শিকার হন এবং এক পক্ষ আকবর নামার উপর ভিত্তি করে ঈসা খানকে রাজপুত বংশোদ্ভূত হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং অন্য পক্ষ আইন-ই- আকবরীর অনুসরণে তাঁকে একজন আফগান হিসেবে অভিহিত করেন। সুতরাং বলা যায় যে, ঐতিহাসিকগণ ঈসা খানের পিতৃপরিচয় তথা বংশ পরিচয় সম্পর্কে স্পষ্টতঃ দ্বিধা-বিভক্ত। এ পর্যায়ে নিম্নোক্তভাবে ঈসা খানের সঠিক পিতৃপরিচয় উদ্‌ঘাটন করা গেল ঃ

ঈসা খান একজন আফগান বংশোদ্ভূত ব্যক্তি এবং স্বাভাবিক ভাবে তাঁর পিতাও আফগান। ঈসা খানের পিতা ভাটি অঞ্চলে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন এবং পরবর্তীকালে ঈসা খান পিতৃ রাজ্য লাভ করেন[৮৭]। এ বক্তব্যের

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষে প্রথম প্রামাণিক দলিল হচ্ছে আবুল ফযলের আইন-ই-আকবরী। আবুল ফযল আকবর নামায় অসামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করলেও আইন- ই-আকবরী-তে দ্ব্যর্থহীনভাবে ও পরিষ্কারভাবে ঈসা খানকে ভাটি অঞ্চলের অধীশ্বর ও একজন আফগান হিসেবে অভিহিত করেন। তাই সঙ্গত কারণেই আইন-ই-আকবরী- এর বক্তব্যের সাথে একমত হওয়া সমীচীন। কেননা আফগান পিতা ব্যতিরেকে কোন ধর্মান্তরিত ব্যক্তির পুত্রের পক্ষে কোন ক্রমেই একজন আফগান হওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু "আফগান" শব্দটি দ্বারা কোন ব্যক্তির জাতিগত ও ধর্মীয় উভয় পরিচয়ই নির্দেশিত হয় বটে। কিন্তু একজন রাজপুত ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম হতে পারেন, কিন্তু আফগান হতে পারেন না। তাছাড়া ঈসা খানের পিতা রাজপুত না হয়ে একজন আফগান হলেই আকবরনামায় প্রদত্ত আবুল ফযলের অন্যান্য বক্তব্যের সাথে অনেকাংশেই সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হবে অর্থাৎ ঈসা খানের পিতৃব্য হিসেবে কুতুব্ আল- দীনের পরিচয় সম্পর্কে যে কোন প্রকার সন্দেহের অবসান ঘটবে। অধিকন্তু ঈসা খানের পিতৃব্য কুতুব আল - দীনের পক্ষে একজন রাজপুত অপেক্ষা একজন আফগানের ভ্রাতা হওয়াই স্বাভাবিক ও যৌক্তিক। অন্যদিকে, আফগান সর্দারদের কেন্দ্র স্থলে তথা ভাটি অঞ্চলে কেবল একজন আফগান সর্দারের পক্ষেই একটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলা সম্ভব, অন্যকোন বহিরাগত কিংবা ধর্মান্তরিত ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা ভাটি অঞ্চলে একটি রাজ্য গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্যবল, অস্ত্রবল ও ধনবল অর্জন করা একজন আফগানের জন্য যতোটা সহজ ছিল অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে ততোটা সহজ ছিলনা। যাহোক, এখন প্রশ্ন হচ্ছে আবুল ফযল আকবরনামায় ঈসা খানের পিতাকে একজন রাজপুত হিসেবে উল্লেখ করলেন কেন? এর উত্তরে বলা যায় যে, যেহেতু আবুল ফযল আকবরের বন্ধু ও উযীর ছিলেন সেহেতু আকবরের শত্রু ঈসা খান, আবুল ফযলেরও শত্রু ছিলেন। একারণেই হয়তো আবুল ফযল বিদ্বেষ প্রসূত ঈসা খানের পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে ব্যঙ্গার্থে অনুরূপ বক্তব্য প্রদান করেন। এরূপ ধারণা অমূলক নয়। কেননা আকবর নামা পাঠে জানা যায় যে, আবুল ফযল আকবর নামার অনেক স্থানেই আকবর বিরোধী ব্যক্তিদেরকে তথা যাঁরা আকবরের অধীনতা স্বীকার করতে চাননি তাঁদের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী, কপট, ভবঘুরে, কাপুরুষ ইত্যাদি বক্রোক্তি ব্যবহার করেন। যেহেতু ঈসা খান বাংলায় বিশেষতঃ ভাটি অঞ্চলে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন সেহেতু আবুল ফযল আকবরের এ ঘোর শত্রুর প্রতি বক্রোক্তি করাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে ক্ষুদ্র ভূ-খন্ড ও সীমিত শক্তির অধিকারী ঈসা খান তাঁর চেয়ে বহুগুণ শক্তি ও

Dhaka University Institutional Repository

বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী মুঘল বাদশাহ্ আকবরের বিরুদ্ধে রণ ক্ষেত্রে যে অভাবনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং মুঘল বাহিনীকে যাচ্ছেতাই ভাবে হেনস্তা করে বাংলায় মুঘল অগ্রগতি স্থবির করে দেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। তাছাড়া আকবর প্রথম থেকেই আফগান বিদ্বেষী ছিলেন। তাই আকবরের বন্ধু ও উযীর আবুল ফযলও আফগান বিদ্বেষী হওয়া স্বাভাবিক এবং এ কারণেই হয়তো আবুল ফযল, ঈসা খানের অভাবনীয় কৃতিত্বে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তুচ্ছার্থে রাজপুত তথা হিন্দু বংশোদ্ভূত হিসেবে উল্লেখ করেন এবং ক্ষোভ ও ঘৃণা ভরে ঈসা খানের পিতার নামোচ্চারণ থেকেও বিরত থাকেন বললে অযৌক্তিক হবেনা। দ্বিতীয়তঃ রিয়ায আল-সালাতীন গ্রন্থে গোলাম হুসাইন সলীম জাইদপুরী ঈসা খানকে একজন আফগান হিসেবে উল্লেখ করেন। এ গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদক আবদুস সালামও আইন - ই- আকবরী-এর অনুসরণে ঈসা খানকে একজন আফগান হিসেবে অভিহিত করেন"। তৃতীয়তঃ ঈসা, কুতব্, দায়ূদ ইত্যাদি সর্বজনীন আফগান নাম। এ নামগুলোর প্রতি আফগানদের সহজাত দুর্বলতা রয়েছে। আব্বাস খান সরওয়ানী রচিত তারীখ -ই-শেরশাহী এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থে এ নাম গুলোর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তারীখ - ই- শেরশাহী গ্রন্থে ঈসা, কুতব্, দায়ূদ ইত্যাদি নামধারী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আফগান ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি পরিদৃষ্ট হয় যেমন - ঈসা খান (তারীখ, পৃঃ ১৬৯), ঈসা খান (শের খানের অমাত্য, পৃঃ ৬৮-৬৯,১১৯), ঈসা খান (ওমর খানের পুত্র, পৃঃ xiii, ১০১), ঈসা খান (হায়বত খানের ভ্রাতা পৃঃ ৬৩,৭৯,৮০,১৬৬-৬৭), ঈসা খান হোজ্জাব (পৃঃ ১৪৬, ১৫৬), ঈসা খান কাকবুর (পৃঃ ১০৩-৭, ১১০, ১১৬-২১), ঈসা খান নিয়াজী (পৃঃ ১১০, ১২২, ১২৮, ১৩৯, ১৫২), ঈসা খান সরওয়ানী (পৃঃ ৬৪), কুতব্ খান (পৃঃ ২৯, ৪৪-৫,৫১-২),কুতব্ খান (শের খানের পুত্র, পৃঃ ৬৮,৯৫,১০৭, ১৩০,১৩৮), কুতব্ খান লোদী (পৃঃ১১০), কুতব্ খান মাওজীখেল (পৃঃ৬৯), কুতব্ খান নায়িব (পৃঃ ৮০,৯২,১১০,১১৩, ১১৬-৭,১২২, ১৪৫), কুতব্ খান শাহু খেল লোদী (পৃঃ ১১৩), কুতব শাহ্ (পৃঃ xxiv), দায়ূদ শাহ্ খেল (পৃঃ৬,৩৩), দায়ূদ কারারানী (সুলায়মান খান কারারানীর দ্বিতীয় পুত্র), দায়ূদ খান (বার-ভূঁঞা নেতা ঈসা খানের পুত্র) ইত্যাদি। এছাড়া আকবর নামা এবং অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থেও অনুরূপ নামধারী অনেক আফগান ব্যক্তিত্বের খোঁজ পাওয়া যায়। সুতরাং নামের দিক দিয়ে বিচার করলেও ঈসা খানকে একজন আফগানই বলা যায়। চতুর্থত ঃ ইহা সর্বজনবিদিত যে, ঈসা খানের উপাধি হচ্ছে "মসনদ-ই-আলা"। "মসনদ-ই-আলা" নিসন্দেহে একটি আফগান

Dhaka University Institutional Repository

উপাধি। তারীখ-ই-শেরশাহী গ্রন্থে "মসনদ আলী" উপাধিধারী অনেক আফগান ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় - যেমন - মসনদ আলী আযম হুমায়ুন সরওয়ানী, মসনদ - আলী ঈসা খান সরওয়ানী কাকবুর (পৃঃ ১১০), মসনদ আলী ঈসা খান কাকবুর (পৃঃ ১১৭), মসনদ আলী হায়বত খান (পৃঃ - ১২০), মসনদ আলী ওমর খান (পৃঃ১১৭), মসনদ আলী তাতার খান (পৃঃ ৬) ইত্যাদি। অন্যদিকে শের শাহের প্রথম উপাধি ছিল "হযরত - ই-আলা", তাজ খান কারারানীর উপাধি "মসনদ -ই- আলা" এবং সুলায়মান কারারানীর উপাধি ছিল "হযরত -ই- আলা"[৬৯]। সুতরাং "মসনদ -ই- আলা" উপাধির দিক থেকে বিচার করলেও ঈসা খানকে একজন আফগান বললে অযৌক্তিক হবে না। পঞ্চমতঃ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন যে, দায়ূদ কারারানীর মৃত্যুর পর ভাটি অঞ্চলের আফগান জমিদার ও আফগান সর্দারদের নেতা ছিলেন ঈসা খান এবং তাঁর নেতৃত্বেই আফগানরা এ অঞ্চলে তাঁদের মুঘল - বিরোধী সংগ্রাম অব্যাহত রাখে[৭০]। এক্ষেত্রে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ঈসা খান যদি একজন আফগান না হয়ে অন্য কান জাতীর লোক হতেন তবে তাঁর পক্ষে স্বাধীনচেতা ও দুর্ধর্ষ আফগান জমিদার ও আফগান সর্দারদের নেতার মর্যাদা লাভ করা কতটুকু সম্ভব ছিল তাও ভাবনার বিষয়। কেননা আফগানরা স্ব-জাতীয় ও স্ব-গোত্রীয় ব্যতীত অন্যকারও নেতৃত্বে অস্বস্থি বোধ করতো। এ দিক থেকে বিচার করলেও ঈসা খানকে একজন আফগান হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ষষ্ঠত ঃ প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক যে, জেমস্ ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনী, মসনদালি ইতিহাস এবং দেওয়ান ইশা খাঁর পালায় ঈসা খানের পিতাকে একজন রাজপুত - হিন্দু হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, জেমস্ ওয়াইজ ঈসা খানের বংশধরদের পরিবেশিত তথ্যাবলীর উপর ভিত্তি করেই এমত ব্যক্ত করেন। ঈসা খানের বংশধরদের পরিবেশিত তথ্যাবলী যে নির্ভরযোগ্য নয়, তা পূর্বের আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে। অন্যদিকে এম. মোহর আলীও জেমস্ ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহপোষণ করেন এবং তিনি বলেন, "A further fact showing the untrustworthiness of the tradition may be noted. When James Wise met the descendants of Isa Khan in the early seventies of the nineteenth century an intense public discussion and enquiry was going on about the rights and titles of the Bengal zamindars in general consequent upon the agrarian disturbances of the time and an intended tenancy legislation which in fact took place shortly afterwards. A number of the prominent zamindars had then brought forward historical and ancient claims

Dhaka University Institutional Repository

to their zamindari possessions. In the context of this situation it is just reasonable to assume that the descendants of Isa Khan had recourse to this tradition, ingeniously blended with Abu al - Fadl's information, to emphasize their otherwise not bad title to the zamindaries."[৯১] এক্ষেত্রে মোহর আলীর সাথে একমত হওয়া যায়। কেননা ঐ রূপ অস্থির পরিস্থিতিতে [৯২] ঈসা খানের বংশধররা তাদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার্থে এবং জমিদারী টিকিয়ে রাখার জন্য আবুল ফযলের বক্তব্যের সাথে একাত্মতা ঘোষণা ব্যতিরেকে হয়তো আত্মপক্ষ সমর্থনের অন্যকোন উপায় ছিল না। অধিকন্তু, ইহা সর্বজনবিদিত যে, কোম্পানী শাসনামলে এবং বৃটিশ রাজের শাসনের প্রথম দিকে মুসলমানগণ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইংরেজদের গৃহীত ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার ফলে মুসলিম সমাজ শুধু হারাতেই থাকে এবং হিন্দুরা একজন হারালেও অন্যজন লাভ করে। অর্থাৎ সম্প্রদায়গত ভাবে মুসলমানগণ নিগৃহীত হয় এবং শিক্ষিত ও ঐশ্বর্যশালী মুসলিম সমাজ দরিদ্র হতে দরিদ্রতর হতে থাকে [৯৩]। এরূপ অবস্থায় ঈসা খানের বংশধররা মুসলিম বিদ্বেষভাবাপন্ন হিন্দু ও ইংরেজদের সহানুভূতি লাভের আশায় হয়তো আবুল ফযলের প্রদত্ত বিবরণের আশ্রয় নিয়ে এবং এর সাথে কিছু নিজস্ব মতামত যোগ করে নিজেদেরকে রাজপুত তথা হিন্দু বংশোদ্ভূত হিসেবে পরিচয় প্রদানে বাধ্য হয়েছিল।

মসনদালি ইতিহাস রচিত হয়েছিল ঈসা খানের বংশধরদের নির্দেশে এবং তাদের পরিবেশিত তথ্যের উপর ভিত্তি করেই। ভট্টশালীর মতে মসনদালি ইতিহাস প্রকাশিত হয় ১২৯৮ বঙ্গাব্দে তথা ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে[৯৪] অর্থাৎ জেম্‌স ওয়াইজ কর্তৃক সংগৃহীত কাহিনীর অনেক পরে। তাই জেম্‌স্ ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনীর সাথে মসনদালি ইতিহাসের তথ্যের মিল থাকা স্বাভাবিক এবং এ কারণেই দেখা যায় যে, জেম্‌স্ ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনীতে যেমনি ঈসা খানের পিতাকে এক জন রাজপুত তথা হিন্দু হিসেবে উল্লেখ করা হয় তেমনি মসনদালি ইতিহাসেও তাঁকে রাজপুত হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যেহেতু ঈসা খানের বংশধরদের পরিবেশিত তথ্যের উপর ভিত্তি করেই জেম্‌স ওয়াইজ ঈসা খানের পিতাকে রাজপুত হিসেবে উল্লেখ করেন সেহেতু ঈসা খানের বংশধরদের নির্দেশে রচিত মসনদালি ইতিহাসে তাঁকে রাজপুত হিসেবে অভিহিত করাই স্বাভাবিক ও যৌক্তিক। কেননা জেম্‌স ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনী ও মসনদালি ইতিহাস এ দু'টি সূত্রেরই তথ্যের উৎস এক ও অভিন্ন।

Dhaka University Institutional Repository

দেওয়ান ইশা খাঁর পালার রচনা কাল সম্পর্কে দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন যে, "কোনো অজ্ঞাত নামা কবি কর্তৃক সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত একটি পালা সর্ব প্রথমে সংগ্রহ হয় (এ পালাটিতেই ঈসা খানের পিতা হিসেবে কথিত কালিদাস গজদানীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণপূর্বক সুলায়মান নাম ধারণ ও মুসলিম শাসকের কন্যার পাণি গ্রহণ ইত্যাদি সম্পর্কে বিবরণ দেয়া হয়েছে)"[৯৭] । অন্যদিকে ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক মনে করেন যে, "এই পালা রচনার ভাষা ও ভঙ্গী দেখিয়া বুঝা যায় ইহার প্রথম দিকের পাঁচটি অধ্যায়ের রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের মধ্যে এবং পরবর্তী ছয়টি অধ্যায় বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত। এরূপ অবস্থায় কালিদাস ও মোমিনা ঘটিত ব্যাপার কঠোর সত্য না হইলে মুসলমান কবির পক্ষে উহা বর্ণনা করিয়া মুসলমান শ্রোতৃ সমাজে গান সম্ভব কিনা, তাহা বিশেষ ভাবে চিন্তনীয়" । তিনি আরও বলেন যে, "আমদের একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। এই সমস্ত পালা গান জনসাধারণের সমক্ষে প্রকাশ্যে গাহিবার জন্য রচিত হইয়া থাকে। যে পালা কবির সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত, তাহার মূল কাহিনীতে কবি কল্পনার অবকাশ থাকিতে পারে না, কারণ শ্রোতার আসরে প্রত্যক্ষদর্শী ও ঘটনার সঙ্গে জড়িত শ্রোতাও থাকিতে পারে। ইশা খাঁ সম্বন্ধে যতগুলি পালাগান আমি দেখিয়াছি, উহার একটিও ঘটনার সমসাময়িক কালের রচনা নহে। রচনার ভাষা ও কবির মনোভাব বিচারে ইহাই আমার বিশ্বাস। এইরূপ অবস্থায় দেড়শত দুইশত বৎসরের প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে পালা গান রচনায় কবির কল্পনার যথেষ্ট অবকাশ থাকিলেও কাহিনীর মূল নায়ক ইশা খাঁর বংশাবলী এখনও সসন্মানে মৈমনসিংহ, ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলায় বাস করিতেছেন, তাহারা কেন নিজবংশের অলীক ও অসন্মানজনক কাহিনী প্রচারিত হইতে দিবেন ? সেন মহাশয়ের এই ভূমিকার শেষে আছে, 'দেওয়ান রহিমদাদ খাঁর আদেশে প্রথমতঃ দেওয়ান পরিবারের ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন...' ইত্যাদি। ইহাতে বুঝা যায়,নিজ বংশের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তি এই বংশে ছিল এবং আছে"[৯৮] ।

দীনেশ চন্দ্র সেন ও ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিকের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ পালাটি সমসাময়িক কালে রচিত হয় নি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক মনে করেন যে, ঘটনার প্রায় দেড়'শত / দু'শত বছর পরে রচিত হয়। তাই বলা যৌক্তিক যে, এ দীর্ঘ সময় পর কোন ঘটনারই সত্যতা অটুট থাকা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়, যদি তা কোন ব্যক্তি সযত্নে সংরক্ষণ বা লিপিবদ্ধ করে না থাকেন। কিন্তু কোন

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি কর্তৃক ঈসা খানের পিতৃ পরিচয় ও বাল্য ইতিহাস সংরক্ষণের কোন নযীর এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক মত প্রকাশ করেন যে, "কালিদাস ও মোমিনা ঘটিত ব্যপার কঠোর সত্য না হইলে মুসলমান কবির পক্ষে উহা বর্ণনা করিয়া মুসলমান শ্রোতৃ সমাজে গান সম্ভব কিনা, তাহা বিশেষ ভাবে চিন্তনীয়" । এ প্রসংগে বলা যায় যে, বর্তমানে আমোদ- প্রমোদের নানা রকম ব্যবস্থা থাকলেও সে যুগে পালা গান, পুঁথি পাঠ ইত্যাদিই ছিল আমোদ-প্রমোদের অন্যতম উপকরণ । সেযুগে পালা গানের যাঁরা শ্রোতা ছিলেন তাঁরা পালাগান শুনতেন নির্মল আনন্দ উপভোগের জন্য । তাই শ্রোতাদের কৌতুহল ছিল পালাগানে বর্ণিত কাহিনীর চমৎকারিত্বের দিকে, কাহিনীর বিষয় বস্তুর সত্যতা সম্পর্কে তাঁদের মাথা ব্যথা না থাকাই স্বাভাবিক । তদ্রুপ পালা রচয়িতাদের উদ্দেশ্য ছিল শ্রোতৃ বর্গের মনোরঞ্জন করা, কাহিনীর সত্যতা বর্ণনা করা নয়। সত্য ঘটনায় সাধারণতঃ রোমাঞ্চের মাত্রা কমই থাকে সে জন্য পালা রচয়িতারা শ্রোতাদের মনযোগ আকর্ষণের নিমিত্তে বাস্তব ঘটনার সাথে তাদের নিজস্ব কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কৌতুহল উদ্দীপক ও রোমাঞ্চকর কাহিনীর জন্ম দিয়ে থাকে। এবং এ কারণেই পালাগানে বর্ণিত কাহিনীর সাথে বাস্তব ঘটনার মিল কমই থাকে। অন্যদিকে শ্রোতাদের মধ্যে কেউ কেউ ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা করলেও তাদের পক্ষে বহুকাল পূর্বে সংঘটিত ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপকরণ সংগ্রহ করা সম্ভব নাও হতে পারে। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক আরো প্রশ্ন রাখেন যে, "তাহারা (ঈসা খানের বংশধরগণ) কেন নিজ বংশের অলীক ও অসন্মানজনক কাহিনী প্রচারিত হইতে দিবেন ?" এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক নিজে এবং দীনেশ চন্দ্র সেন স্বীকার করেন যে, "দেওয়ান দিগের দোহাই দিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে সকল পালা গান ও ঐতিহাসিক বিবরণ রচিত হইয়াছে তাহাতে আদৌ বর্ণনা সাম্য নাই"। এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, ঈসা খানের বংশ পরিচয় সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন পালা রচয়িতা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দেন। এ অবস্থায় ঈসা খানের বংশধরদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব ছিল না । তাছাড়া ঈসা খানের বংশধরদের ঈসা খানের পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে হয়তো কোন সঠিক তথ্য জানা ছিলনা । যদি এ সম্পর্কে তাদের সঠিক তথ্য জানা থাকতো তবে তারা ঈসা খানের পিতার বিবাহ সম্পর্কে জেম্‌স ওয়াইজের নিকট একরকম এবং মসনদালি ইতিহাসে ভিন্ন রকম তথ্য সরবরাহ করতো না । অধিকন্তু সমসাময়িক ঐতিহাসিক আবুল ফযল যেখানে ঈসা খান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করা সত্ত্বেও তাঁর পিতার নাম প্রদান করতে পারেন নি সেখানে দেড়'শত/ দু'শত বছর বা আরো পরের

Dhaka University Institutional Repository

বংশধরদের পক্ষে তাঁদের পূর্বপুরুষের পিতার নাম সম্বন্ধে কতটুকু সঠিক তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব তাও ভাবনার বিষয়। আরো বলা যায় যে এমনও তো হতে পরে ঈসা খানের বংশধররা হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের প্রজাদের নিকট তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি কল্পে পালাগানে পরিবেশিত কাহিনী সম্পর্কে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেনি। উল্লেখ্য যে এ পালাগানে হিন্দু - মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের শ্রোতাদের মনযোগ আকর্ষণের জন্য একটি সমতা বা ভারসাম্য রক্ষার প্রয়াস চালানো হয়েছে। পালাগানে প্রথমে ঈসা খানের হিন্দু পিতা ও মুসলিম শাসকের কন্যা মমিনা খাতুনের প্রেম কাহিনীর এবং পরে ঈসা খান ও হিন্দু কন্যা সুভদ্রা বা সোণামণির প্রেমকাহিনীর বিবরণ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে একজন মুসলিম কন্যা কর্তৃক হিন্দু পুরুষের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে প্রেমে উন্মাদ হওয়ার বিবরণ দিয়ে পরে মুসলিম পুরুষ কর্তৃক হিন্দু কন্যার প্রেমে উন্মাদ হওয়ার বিবরণ প্রদান করে পালাগানের কাহিনীতে একটি ভারসাম্য রক্ষা তথা সমতা বিধানের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অধিকন্তু পালা গানে ঈসা খানের পিতা হিসেবে কথিত কালিদাস গজদানীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ, মুসলিম শাসকের কন্যার পাণি গ্রহণ ও ঈসা খানের জন্ম ইত্যাদি সম্পর্কিত ঘটনাবলী ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে ধরে নেয়া যায় না। কেননা ইত্যাকার ঘটনা যদি সত্য হয় তাহলে ঈসা খানের পিতার বিবাহ ও তাঁর জন্ম জালাল শাহের (জেলাল উদ্দিন) শাসনকাল অর্থাৎ ১৫৬০-৬৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই হওয়া বাঞ্চনীয়। এ অনুযায়ী ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে ঈসা খানের বয়স হওয়া উচিত আনুমানিক ১৩/১৪ বছর। কিন্তু আকবরনামা অনুযায়ী ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে ঈসা খান মুঘল নৌ-সেনাপতি শাহ্ বর্দীকে[৮] বাংলার পানি-সীমা থেকে যে ভাবে বিতাড়িত করেন তা ১৩/১৪ বছরের বালকের পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। তাই বলা যায় যে, পালাগানে কালিদাস গজদানী সম্পর্কে যে বিবরণ দেয়া হয়েছে তা শুধু অবিশ্বাস্যই নয় বরং এ ধরনের কোন চরিত্রের সাথে ঐতিহাসিক চরিত্র ঈসা খানের কোন যোগসূত্র থাকাও যৌক্তিক নয়। যাহোক ঈসা খান বস্তুত একজন আফগানই ছিলেন এবং সঙ্গত কারণেই তাঁর পিতাও একজন আফগান ছিলেন। এখন প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে: ঈসা খানের পিতার নাম কী? তিনি কখন ও কীভাবে ভাটি অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করেন?

আবুল ফযলের আকবরনামায় কিংবা অন্যকোন সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থে ঈসা খানের পিতার নামপাওয়া যায় না। তবে জেম্স্ ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনী, মসনদালি ইতিহাস, দেওয়ান ইশা খাঁর পালা এবং দেশে প্রচলিত

Dhaka University Institutional Repository

কিংবদন্তী অনুযায়ী ঈসা খানের পিতার নাম কালিদাস গজদানী এবং তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ পূর্বক সুলায়মান খান নাম ধারণ করেন এবং মুসলিম শাসকের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। যেহেতু ঈসা খান একজন আফগান ছিলেন সেহেতু তাঁর পিতার নাম কালিদাস গজদানী হওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে কালিদাস গজদানীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ, মুসলিম শাসকের কন্যার পাণি গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও সুলায়মান খান নামটির ক্ষেত্রে কোন আপত্তি নেই। এ ক্ষেত্রে সঠিক বক্তব্য হচ্ছে সুলায়মান খান ধর্মান্তরিত ব্যক্তি ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন আফগান সর্দার। এ সংক্রান্ত কোন প্রামাণ্য দলিল না থাকলেও সুলায়মান নামটি যে একটি সর্বজনীন আফগান নাম এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এ নামটির প্রতি আফগানদের সহজাত দুর্বলতা রয়েছে এবং এর কারণ বোধ হয় এই যে, আফগানিস্তানের সুলায়মান পার্বত্য অঞ্চল ছিল আফগানদের একটি অন্যতম আবাস স্থল। তারীখ -ই- শেরশাহী গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে জৌনপুরের শাসক সুলতান মাহ্মুদ শাহ্ দিল্লী অবরোধ করলে বাহ্লুল লোদী রোহ্ উপত্যকার সকল আফগান উপজাতীয় সর্দারদের নিকট ফরমান প্রেরণ করে সাহায্য প্রার্থনা করেন। বাহ্লুল লোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সুলায়মান পার্বত্য অঞ্চলসহ অন্যান্য স্থানের আফগান প্রধানরা ভারত বর্ষে আগমন করেন এবং ভারতে আফগান আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় বাহ্লুল লোদীকে সর্বাত্মক সাহায্য করেন। দিল্লীতে বাহ্লুল লোদী স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার পর রোহ্-উপত্যকা থেকে আগত বিভিন্ন আফগান সর্দারকে আমীরের পদ দান করেন এবং অনেক আফগানকে জায়গীর দান করেন[১৪]। এভাবেই সুলায়মান পার্বত্য অঞ্চল সহ অন্যান্য স্থানের আফগানরা ভারতে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। ধারণা করা যায় যে, সুলায়মান খান, সুলায়মান পার্বত্য অঞ্চল থেকে আগমনকারী কোন এক আফগান প্রধানের বংশধর। অন্যদিকে তারীখ-ই-শেরশাহী এবং অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থে সুলায়মান নামধারী কতিপয় আফগান ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যেমন সুলায়মান (শের শাহের ভ্রাতা), সুলায়মান কারারানী (বাংলার শাসক এবং জামাল খান কারারানীর পুত্র ও তাজ খান কারারানীর ভ্রাতা), সুলায়মান মানকলি (ঘোড়াঘাটের জায়গীরদার) , সুলায়মান নুহানী (উড়িষ্যার কতলু নুহানীর মন্ত্রী ও ভাই ঈসা খান মিয়া খেলের পুত্র) ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যায় যে, সুলায়মান একটি আফগান নাম এবং তিনি একজন আফগানই ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে পানি পথের প্রথম যুদ্ধে আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদী মুঘল বাদশাহ্ বাবরের নিকট পরাস্ত হলে আফগানরা রাজ্য হারা হয়ে পড়ে এবং তারা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করতে থাকে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, এসময় পরাজিত আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মাহমুদ লোদী ও তাঁর পরিবারের কিছু সদস্যসহ একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আফগান অভিজাত বাংলার সৈয়দ সুলতান নুসরাত শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নুসরাত শাহের অনুগ্রহে তাঁরা জায়গীর ও ভাতা পান এবং বাংলায় বসতি স্থাপন করেন। নুসরাত শাহও সুলতান ইব্রাহিম লোদীর এক কন্যার পাণি গ্রহণ করেন[১০০]। ধারণা করা যায় যে, মাহমুদ লোদীর পরিবারের সাথে সুলায়মান খানও এ সময় শরণার্থী হিসেবে বাংলায় আগমন করেন। যেহেতু নুসরাত শাহ্ এ আফগান শরণার্থীদের প্রতি সদয় ছিলেন এবং তাদেরকে জায়গীর ও ভাতা প্রদান করেন এবং তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন সেহেতু ইহা ধারণা করা অমূলক নয় যে সুলায়মান খানও সৈয়দ পরিবারের কোন এক কন্যার পাণি গ্রহণ করে বাংলায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। এই রূপ ধারণার কারণ এই যে, জেম্স্ ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনী, মসনদালি ইতিহাস, দেওয়ান ইশা খাঁর পালা এবং দেশে প্রচলিত কিংবদন্তি অনুযায়ী সুলায়মান খান মুসলিম শাসকের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। জেম্স্ ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনী অনুযায়ী কালিদাস গজদানী ইসলাম ধর্ম গ্রহণপূর্বক সুলায়মান খান নাম ধারণ করেন এবং হুসাইন শাহের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন, মসনদালি ইতিহাস অনুযায়ী সুলায়মান খান জালাল শাহের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন এবং দেওয়ান ঈশা খাঁর পালায় বলা হয় যে, কালিদাস গজদানী ইসলাম ধর্ম গ্রহণপূর্বক সুলায়মান খান নাম ধারণ করেন এবং "জেলাল উদ্দিনের" কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। এ তিনটি সূত্রে সুলায়মান খানের শ্বশুরের নাম ভিন্ন ভিন্ন হলেও দুটি বিষয়ে মিল রয়েছে এবং তা হচ্ছে কালিদাস গজদানীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণপূর্বক সুলায়মান খান নাম ধারণ এবং মুসলিম শাসকের কন্যার পাণি গ্রহণ। কিন্তু এ'দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয়ে অর্থাৎ সুলায়মান খান নামক একজন সাধারণ ধর্মান্তরিত ব্যক্তির নিকট মুসলিম শাসকের কন্যাকে বিয়ে দেয়ার কথিত ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। তবে সুলায়মান খান যদি ধর্মান্তরিত ব্যক্তি না হয়ে একজন আফগান ও আফগান সর্দার হন, বিষয়টির সত্যতা সম্পর্কে হয়তো কোন সন্দেহ নাও থাকতে পারে। যেহেতু পূর্বের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, সুলায়মান খান ধর্মান্তরিত ব্যক্তি ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন একজন আফগান সর্দার সেহেতু সুলায়মান খানের কোন

মুসলিম শাসকের কন্যার পাণি গ্রহণের বিষয়টি হয়তো মেনে নেয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ আধুনিক ঐতিহাসিক ভট্টশালী, এম, এ, রহিম ও আবদুল করিম এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, সুলায়মান খান সৈয়দ বংশীয় কন্যার পাণি গ্রহণ করেন অর্থাৎ তাঁদের মতে সুলায়মান খান বাংলার সৈয়দ বংশীয় শেষ স্বাধীন সুলতান গিয়াস আল-দীন মাহ্মুদ শাহের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, এ ক্ষেত্রে এম, এ, রহিম ও আবদুল করিম ভট্টশালীকেই অনুসরণ করেন। কিন্তু ভট্টশালী তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করেন তা পূর্বোক্ত আলোচনায় গ্রহণযোগ্য হয়নি। কেননা যে যুক্তিতে ভট্টশালী মাহ্মুদ শাহের কন্যার পাণি গ্রহণের কারণে সুলায়মান খানের বারংবার বিদ্রোহের যৌক্তিকতা নির্দেশ করেছেন, সুলতান আলা- আল- দীন হুসাইন শাহ্ কিংবা হুসাইন শাহের আঠারজন পুত্র-কন্যার মধ্যে যে কোন এক জনের কন্যার পাণি গ্রহণ করলেও সে একই যৌক্তিকতা নির্দেশ করা যায়। কেননা মাহ্মুদ শাহ্ ও অন্যান্যরাও হুসাইন শাহের পুত্র বা কন্যা , এরা সকলেই একই পরিবারের বা বংশের সদস্য এবং শের শাহ্ এ হুসাইন শাহী বংশকে উৎখাত করেই বাংলা দখল করেন। এক্ষেত্রে সঠিক বক্তব্য হচ্ছে সুলায়মান খানের পক্ষে মাহ্মুদ শাহ্ অপেক্ষা নুসরাত শাহের কন্যার পাণি গ্রহণ করা অধিকতর যৌক্তিক। কেননা পূর্বের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেহেতু সুলায়মান খান ছিলেন ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে পানি পথের প্রথম যুদ্ধের পর বাংলায় আশ্রয় গ্রহণকারী আফগান শরণার্থী এবং নুসরাত শাহ্ এ আফগানদের প্রতি সদয় ছিলেন এবং তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন সেহেতু সুলায়মান খানের নিকট নুসরাত শাহ্ তাঁর কন্যার বিয়ে দিয়েছেন বললে অত্যুক্তি হবে না । অন্যদিকে নুসরাত শাহের মৃত্যুর পর থেকে শের শাহ্ কর্তৃক বাংলায় কাযী ফজিলত[১০১] নামক কর্মকর্তা নিয়োগ পর্যন্ত সময়ের ঘটনা প্রবাহ আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, সুলায়মান খানের পক্ষে মাহ্মুদ শাহের কন্যার পাণি গ্রহণ যেমনি যৌক্তিক নয় তেমনি তাঁর পক্ষে ইসলাম শাহের শাসনামলে বারবার বিদ্রোহ করার জন্য বেঁচে থাকাও সম্ভব হতোনা । কেননা ইহা সর্বজন বিদিত যে, ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে গৌড় অধিকারের সময় শের শাহের পুত্র জালাল খান ও সেনাপতি খওয়াস খান হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হন এবং মাহ্মুদ শাহের পুত্রদ্বয়কে হত্যা করেন। মাহ্মুদ শাহ্ তাঁর দু'পুত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনিও শোকে দুঃখে মৃত্যুবরণ করেন। স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার পর শের শাহ্, খিযির খানকে বাংলার শাসন কর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু ১৫৪১ খ্রীস্টাব্দে খিযির খান বাংলার পরলোকগত সুলতান মাহ্মুদ শাহের কন্যার পাণি গ্রহণ করে বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

সুলতানদের রীতি অনুসরণ করে চৌকিতে বা উচ্চ মঞ্চে বসেন অর্থাৎ তিনি বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হন। এ সংবাদ শ্রবণ মাত্রই শের শাহ্ পাঞ্জাবের গাক্কার থেকে সরাসরি বাংলায় এসে উপস্থিত হন এবং খিযির খানকে বন্দী করে কারারুদ্ধ করার নির্দেশ দেন[১০৮]। এর পর খিযির খান সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায়না। খিযির খানকে শায়েস্তা করার পর শের শাহ্ ভবিষ্যত বিদ্রোহের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে বাংলাকে কয়েকটি সরকার বা জেলায় বিভক্ত করে এক অভিনব শাসন পদ্ধতি চালু করেন। এভাবেই মাহ্মুদ শাহের পরিবারের সকল সদস্যই মৃত্যুবরণ করে কিংবা কারারুদ্ধ হয়। সুতরাং এরূপ পরিস্থিতিতে মাহ্মুদ শাহের পরিবারের কোন সদস্যের পক্ষে জীবিত থাকা কিংবা পরবর্তীতে ইসলাম শাহের বিরুদ্ধে বার বার বিদ্রোহ করা সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। কেননা খিযির খানকে শায়েস্তা করার পরেও যদি মাহ্মুদ শাহের পরিবারের কোন সদস্য জীবিত থাকতো তবে শের শাহ্ নিশ্চয়ই ভবিষ্যত বিদ্রোহের আশংকা দূরীভূত করার জন্য তাদের বিরুদ্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। তাই সুলায়মান খানের পক্ষে মাহ্মুদ শাহের কন্যার পাণি গ্রহণ করে বার বার বিদ্রোহ করার জন্য ইসলাম শাহের রাজত্ব কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকা যৌক্তিক হিসেবে ধরে নেয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে সঠিক বক্তব্য হচ্ছে এই যে, সুলায়মান খান নুসরাত শাহের কন্যা তথা আলা - আল - দীন ফিরুয শাহের ভগ্নীকেই বিবাহ করেন। নুসরাত শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ফিরূয শাহ্ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই মাহ্মুদ শাহ্, ফিরূয শাহ্কে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করে নেন। এ হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে দেশে অন্তর্বিপ্লব দেখা দেয় এবং নুসরাত শাহের ভগ্নিপতি ও হাজী পুরের শাসন কর্তা মখদুম আলম মাহ্মুদ শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন[১০৯]। এরূপ পরিস্থিতিতে ফিরূয শাহের পক্ষীয় লোকজন এবং সুলায়মান ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা জীবন রক্ষার্থে গৌড় ত্যাগ করে কোন দূরবর্তী নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করা বিচিত্র নয়। সম্ভবতঃ তাঁরা নদী-নালা বেষ্টিত দুর্গম ভাটি অঞ্চলেই আত্মগোপন করেন। ফলশ্রুতিতে তাদের পক্ষে যেমনি মাহ্মুদ শাহের কোপানল থেকে দূরে থাকা সম্ভব হয়, তেমনি পরবর্তীতে শেরশাহের দৃষ্টি এড়িয়ে সুলায়মান খান ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হন। শের শাহের মৃত্যুর পর ইসলাম শাহের রাজত্বকালে সুযোগ বুঝে সুলায়মান খান বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ধরা পড়েন এবং নিহত হন। অতএব বলা যায় যে, সুলায়মান খান নুসরাত শাহের কন্যাকেই বিয়ে করেন। তৃতীয়তঃ খিযির খান যখন মাহ্মুদ শাহের কন্যাকে বিয়ে করে চৌকিতে বা উচ্চমঞ্চে

Dhaka University Institutional Repository

বসেন তখন খিযির খানের বিদ্রোহাত্মক মনোভাব চরম আকার ধারণ করার সুযোগ না দিয়ে প্রথমেই তাঁকে দমন করা হয়। কিন্তু সুলায়মান খান যদি মাহ্মুদ শাহের জামাতাই হতেন তবে তিনি যখন ইসলাম শাহের বিরুদ্ধে প্রথম বার বিদ্রোহ করেন, তখন মাহ্মুদ শাহের জামাতা খিযির খানের মতো প্রথমেই তাঁকে শাস্তি প্রদান করে দ্বিতীয়বার বিদ্রোহ করার সুযোগ দেয়া হতো না। এখানে উল্লেখ্য যে, এ ইসলাম শাহ্ই মাহ্মুদ শাহের দু'পুত্রকে হত্যা করেছিলেন। সুতরাং ইহা সন্দেহাতীত যে, সুলায়মান খান মাহ্মুদ শাহের জামাতা ছিলেন না। চতুর্থতঃ ভট্টশালী এবং আবদুল করিম মত প্রকাশ করেন যে, সূর বংশের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ থাকার কারণেই সুলায়মান খান ইসলাম শাহের রাজত্বকালে বারবার বিদ্রোহ করেন। কেননা শের শাহ্ সৈয়দ বংশকে উৎখাত করেই বাংলা দখল করেন। এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যই সুলায়মান খান ইসলাম শাহের রাজত্ব কালে বারবার বিদ্রোহ করেন[১০৮]। কিন্তু পূর্বের আলোচনায় দেখা গেছে যে, ইসলাম শাহের রাজত্বকাল পর্যন্ত মাহ্মুদ শাহের পরিবারের কোন সদস্যের পক্ষে জীবিত থাকার তেমন কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং যেহেতু হুসাইন শাহী বংশের প্রতিনির্ধিত্ব করার মতো মাহ্মুদ শাহের পরিবারের কোন সদস্য অবশিষ্ট ছিলনা সেহেতু সুলায়মান খান নামক যে ব্যক্তি হুসাইন শাহী বংশের শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন তিনি সম্ভবত ঃ নুসরাত শাহের পরিবারের সদস্য ছিলেন। তাই সুলায়মান খান যে, নুসরাত শাহেরই জামাতা ছিলেন সে সিদ্ধান্তই অধিক যুক্তিপূর্ণ।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ঈসা খানের পিতৃপরিচয় তথা বংশ পরিচয় সম্পর্কে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব ঃ ঈসা খান একজন আফগান ছিলেন এবং তাঁর পিতার নাম ছিল সুলায়মান খান। সুলায়মান খান মূলতঃ আফগানিস্তানের সুলায়মান পার্বত্য অঞ্চল থেকে আগত কোন এক আফগান প্রধানের বংশধর। সম্ভবতঃ তাঁর পিতামহ প্রথমে বাহ্লুল লোদীর শাসনামলে ভারতে আগমন করেন এবং বাহ্লুল লোদী প্রদত্ত জায়গীর লাভ করে ভারতে বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে পানি পথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ের ফলে আফগানরা রাজ্য হারা হয়ে পড়ে এবং এ সময় ইব্রাহিম লোদীর ভাই মাহ্মুদ লোদীর পরিবারের সাথে সুলায়মান খানও বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। সৈয়দ বংশীয় সুলতান নুসরাত শাহ্ এ আফগান শরণার্থীদের প্রতি সদয় ছিলেন। তিনি তাঁদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন এবং অনেককে জায়গীর প্রদান করেন। এরূপ আফগানদের মধ্যে সুলায়মান

Dhaka University Institutional Repository

খানও বাংলায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। সুলায়মান খান নুসরাত শাহের কন্যার পাণি গ্রহণ করে সৈয়দ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হন। কিন্তু নুসরাত শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী সুলতান আলা-আল-দীন ফিরূয শাহ্‌কে হত্যাকরে পিতৃব্য মাহ্‌মুদ শাহ সিংহাসন দখল করে নিলে দেশে অন্তর্বিপ্লব দেখা দেয়ায় আত্মরক্ষার্থে ফিরূয শাহের পক্ষীয় লোকজন এবং সুলায়মান খান ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ভাটি অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এর পর সুলায়মান খান ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকেন এবং ক্ষমতাচ্যুত রাজপরিবারের অভিজাতদের সহায়তায় ও অন্যান্য আফগানদেরকে সংগঠিত করে নদী-নালা বেষ্টিত দুর্গম ভাটি অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্ররাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। শের শাহের মৃত্যুর পর ইসলাম শাহের রাজত্বকালে সুলায়মান খান হুসাইন শাহী বংশের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সুযোগ বুঝে অন্তত দু'বার বিদ্রোহ করেন এবং এ প্রক্রিয়ার মধ্যেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

তথ্য নির্দেশ

১। Hamida Khatoon Naqvi: "Incidents of Rebellions during the reign of Emperor Akbar," Medieval India - A Miscellany Volume Two. Centre of Advanced study, Department of History, Aligarh Muslim University , 1972, পৃঃ ১৫২।

২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫২.

৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৬-১৬১।

৪। আধুনিক ঐতিহাসিক এন, কে, ভট্টশালী, এম, এ, রহিম ও আবদুল করিমসহ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, বাদশাহ্ আকবরের সময় সারা বাংলায় মুঘল অধিকার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।

৫। শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত ঃ প্রাচীন পূর্ব বঙ্গগীতিকা সপ্তম খন্ড, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫ , পৃঃ ১৬১ (পরবর্তীতে পূর্ববঙ্গ গীতিকা হিসেবে উল্লিখিত)। ভট্টশালীর মতে ১২৯৮ বঙ্গাব্দে মসনদালি ইতিহাস ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়, ভট্টশালীর বক্তব্যের জন্য দেখুন "বঙ্গীয় ভৌমিক গণের সহিত মোগলের সজ্ঘর্ষ", ভারত বর্ষ আষাঢ়- ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ১৭শ বর্ষ - ১মখন্ড - ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৫৪ (পরবর্তীতে ভারত বর্ষ

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে উল্লিখিত)। মসনদালি ইতিহাস নামক পুস্তিকাটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

৬। আবদুল করিম ঃ বাংলার ইতিহাসঃ মোগল আমল- প্রথম খন্ড, প্রথম প্রকাশ কাল, ১৫ই জানুয়ারী ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দ, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, পৃঃ ৫৬ (পরবর্তীতে মোগল আমল হিসেবে উল্লিখিত)।

৭। ভট্টশালী মত প্রকাশ করেন যে, শ্রীযুক্ত সুধাংশু শেখর মুখোপাধ্যায় এ "পালা" টি নারায়ণগঞ্জের সোনাকান্দা থেকে সংগ্রহ করেন। "Bengal Chiefs Struggle for independence in the Reign of Akbar And Jahangir", Bengal past and Present - 1929, Vol. XXXVIII, No. 75, পৃঃ ৩২ (পরবর্তীতে বি, পি, পি হিসেবে উল্লিখিত)। এ 'পালা' টি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

৮। দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত এ পালাটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, তবে শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক সম্পাদিত প্রাচীন পূর্ব বঙ্গ গীতিকা সপ্তম খন্ডে দীনেশ চন্দ্র সেনের লিখিত ভূমিকাসহ এ পালাটি দেওয়ান ইশা খাঁর পালা নামে পুনঃ প্রকাশিত হয়। পূর্ব বঙ্গ গীতিকা, পৃঃ ১৫৯-২৪০।

৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬১-১৬২।

১০। জেম্স্ ওয়াইজ ১৮৭০-৫ খ্রীস্টাব্দে ঢাকার সিভিল সার্জন ছিলেন এবং তিনি প্রত্নতত্ত্বে অনুরাগী ছিলেন (Syed Muhammed Taifoor : Glimpses of old Dhaka, Dhaka, 1952, পৃষ্ঠা - ২৫)। জেম্স্ ওয়াইজ সর্ব প্রথম বার-ভূঁঞাদের ইতিহাস উদ্ধারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তিনি ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে "On the Barah Bhuyas of Eastern Bengal," শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন, (Journal of the Asiatic Society of Bengal, No. III-1874, পৃষ্ঠা ১৯৭-২১৪, পরবর্তীতে J.A.S.B. হিসেবে উল্লিখিত)।

১১। ব্লখমান ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই জুলাই ৪০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আবুল ফযল রচিত আইন - ই - আকবরী -এর মূল গ্রন্থ সম্পাদনা করেন এবং আইন - ই - আকবরী প্রথম খন্ডের ইংরেজী অনুবাদ করেন (Ain-i-Akbari -vol. II, Second Edition, corrected and further annotated by sir Jadu-Nath Sarkar, Royal Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1949, পৃঃ III, পরবর্তীতে আইন ২য় হিসেবে উল্লিখিত)। ব্লখ মানের জীবন ও কর্মের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন , Md. Delwar Hussain : A study of nineteenth Century Historical works on Muslim Rule

Dhaka University Institutional Repository

in Bengal (Charles Stewart to Henry Beveridge). Asiatic Society of Bangladesh, First Published october 1987, পৃঃ৬৭-১০৮, (পরবর্তীতে Delwar Hussain হিসেবে উল্লেখিত)।

১২। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে "On Isa Khan, the ruler of Bhati, in the time of Akbar", শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। J.A.S.B ,পৃঃ ৫৭-৬৩। হেনরী বেভেরীজের জীবন ও কর্মের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন Delwar Hussain ,পৃঃ ১৪৫-১৭৮।

১৩। নলিনী কান্ত ভট্টশালী "Bengal Chiefs Struggle for independence in the Reign of Akbar and Jahangir," শিরোনামে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন, বি, পি, পি ভল্যুম ৩৫, নং ৬৯, ৭০ (পৃঃ ২৫-৩৯, ১৩৫-৪২) , ১৯২৮, ভল্যুম ৩৬, নং ৭১ (পৃঃ৩২-৫০) , ১৯২৮ এবং ভল্যুম ৩৮, নং ৭৫ (পৃঃ ১৯-৪৭), ১৯২৯।

১৪। আবদুল করিমের দু'টি পুস্তকই ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দে Institute of Bangladesh studies, University of Rajshahi, Rajshahi, Bangladesh, কর্তৃক প্রকাশিত। এ দু'টি পুস্তকেই তিনি দায়ূদ খান কাররানীর পতন (১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দ) থেকে মুঘল বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের মৃত্যু পর্যন্ত (১৬২৭ খ্রীস্টাব্দ) সময়ের বাংলার ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন।

১৫। স্বাধীন ত্রিপুর রাজবংশের ইতিবৃত্ত।

১৬। J.A. S. B.1874, পৃঃ ১৯৭-২১৪।

১৭। আবদুল করিম মত প্রকাশ করেন যে, আলা আল-দীন হুসাইন শাহ্ ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, ১৫২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত নয়। মোগল আমল ,পৃঃ ১০৪।

১৮। রিয়ায, Husain Shahi, H. Bengal, সুলতানী আমল, বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় খন্ড (রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় , প্রথম দে'জ সংস্করণ ঃ জানুয়ারী ১৯৮৮, কলিকাতা , পরবর্তীতে রাখাল দাস হিসেবে উল্লিখিত) ইত্যাদি কোন গ্রন্থেই সুলায়মান খান নামধারী হুসাইন শাহের কোন আত্মীয় বা কর্মকর্তার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

১৯। J.A. S. B.1909. পৃঃ ৩৭১। জালাল শাহের রাজত্বকাল ১৫৬০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫৬৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। মোগল আমল, পৃঃ ৫৮।

২০। শের শাহের পুত্র , রাজত্বকাল ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫৫৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত H. Bengal , পৃঃ ১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

২১। তাজ খান ছিলেন আফগানদের কারারানী গোত্রের লোক। তাঁর পিতার নাম জামাল খান কারারানী এবং ভ্রাতা সুলায়মান খান কারারানী। তাজ খান শের শাহের পুত্র ইসলাম শাহের একজন অনুগত অনুচর ছিলেন (The Afghans, পৃঃ ১৬৮-১৬৯)। ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে তাজ খান কারারানী জবর দখলকারী গিয়াস আল-দীন ৩য়কে হত্যা করে বাংলায় কারারানী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন (রিয়ায, পৃঃ ১৫০, পাদটীকা - ১)। তাজ খান ও সুলায়মান খানের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় কনৌজের যুদ্ধের সময়। এ যুদ্ধে দু'ভ্রাতাই মুঘল বাদশাহ্ হুমায়ূনের বিরুদ্ধে শের শাহের সেনাপতি হিসেবে কাজ করেন (তারীখ,পৃঃ ১১০,পাদ টীকা-৫)।

২২। এক্ষেত্রে লখনৌতির সহকারী শাসনকর্তা তুগরল খান এবং সোনারগাঁও এর যুগ্ম শাসনকর্তা গিয়াস আল-দীন বাহাদুরের বিদ্রোহ ও পরাজয়ের ঘটনা উল্লেখ করা যায়। তুগরল খান দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে সুলতান মুগীস আল - দীন নাম ধারণ করে লখনৌতিতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দিল্লীর সুলতান গিয়াস আল-দীন বলবন, তুগরল খানকে দমন করার জন্য দু'বার সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু দু'বারই তুগরল খানের নিকট দিল্লীর সুলতানের বাহিনী পরাজিত হলে ১২৮০ খ্রীস্টাব্দে গিয়াস আল-দীন বলবন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বুগরা খানকে নিয়ে এক বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ লখনৌতি আক্রমণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তুগরল খান ধৃত হন এবং তাঁর মস্তক কেটে ফেলা হয়। এতদভিন্ন, গিয়াস আল-দীন বাহাদুর দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং ৭২৮ হিজরীতে শুধু নিজ নামে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে মুদ্রাজারী করেন। কিন্তু গিয়াস আল-দীন বাহাদুরের স্বাধীনতা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। কেননা বাহরাম খান তাঁকে পরাজিত ও হত্যা করেন। বাহাদুরকে হত্যা করার পর তাঁর চামড়া খুলে ফেলা হয় এবং সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের নিকট প্রেরণ করা হলে সুলতান নির্দেশ দেন যেন,বিজয় স্তম্ভে মুলতানের শাসনকর্তা কিশলু খানের চামড়ার সাথে বাহাদুরের চামড়াও ঝুলিয়ে রাখা হয়। যাহোক, উপরোক্ত দু'টি ক্ষেত্রেই বিদ্রোহীদেরকে শুধুমাত্র পরাজিত ও হত্যা করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তাঁদের স্ত্রী-পুত্র বা আত্মীয় স্বজনদের বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়নি (সুলতানী আমল, পৃঃ ১০০-১০৭, ১৩৬-১৩৮ এবং রাখাল দাস,পৃঃ ৪৬, ৬৩)।

২৩। Ad Hist., পৃঃ ২৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

২৪। পৃঃ ৯৬, পরবর্তীতে সুবর্ণ গ্রাম হিসেবে উল্লিখিত।

২৫। J.A. S. B., 1904, পৃঃ ৫৭-৬৩।

২৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭।

২৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮।

২৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩।

২৯। Second Edition, 1926, পৃঃ ৬২। পরবর্তীতে H. Assam হিসেবে উল্লিখিত।

৩০। আইন ২য়, পৃঃ ১৩০।

৩১। Indian Edition, 1975, পৃঃ ৭৬। পরবর্তীতে Eastern Capital হিসেবে উল্লিখিত।

৩২। নিখিল নাথ রায়ের এ সম্পাদনা কর্ম সম্পর্কে নলিনীকান্ত ভট্টশালী মন্তব্য করেন যে, "His is undoubtedly the most serious attempt to recover the true history of Pratapaditya from the mire of legends and it must be said to his credit that his historical insight nearly succeeded in getting at the truth" . বি, পি, পি, ভল্যুম ৩৫, নং ৬৯, পৃঃ২৭। অন্যদিকে আবদুল করিমের মতে,"নিখিল নাথ রায় অত্যন্ত পরিশ্রম করে এবং নিষ্ঠা সহকারে প্রতাপাদিত্যের সঠিক ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করেন।" মোগল আমল , পৃঃ ৩১।

৩৩। নিখিল নাথ রায় ঃ প্রতাপাদিত্য ১৩১৩ বঙ্গাব্দ , পৃঃ ৩৫, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১। পরবর্তীতে প্রতাপাদিত্য হিসেবে উল্লিখিত ।

৩৪। আইন ২য়,পৃঃ ১৩০।

৩৫। J.A. S. B., 1909, পৃঃ ৩৬৭-৩৭৫।

৩৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭১, পাদটীকা- ১।

৩৭। পূর্ববঙ্গ গীতিকা, পৃঃ১৬৯।

৩৮। সুলায়মান কাররানীর শাসন কাল ১৫৬৫ থেকে ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। H. Bengal., পৃঃ ১৮১।

৩৯। Stapleton, J.A. S. B., 1909, পৃঃ ৩৭১, পাদটীকা - ১।

৪০। আবদুল করিম : History of Bengal : Mughal Period, Vol.I, 1992, পৃঃ ৭২ (পরবর্তীতে Mughal Period হিসেবে উল্লিখিত) এবং ভট্টশালী ঃ বি,পি, পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ২২।

৪১। ২য় সংস্করণ , পৃঃ ২৬১-২৬২।

Dhaka University Institutional Repository

৪২। ঈসা খানের পিতৃ পরিচয় সংক্রান্ত আবুল ফযলের বক্তব্যের জন্য দেখুন আকবরনামা ৩য় , পৃঃ ৬৪৭-৬৪৮। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

৪৩। বি, পি, পি, ভল্যুম ৩৫ ও ৩৬, ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ, পৃঃ ২৫-৩৯, ১৩৫-১৪২, ৩২-৫০, এবং ভল্যুম ৩৮, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ, পৃঃ ১৯-৪৭।

৪৪। ভট্টশালীর সুদীর্ঘ বক্তব্যের জন্য দেখুন প্রাগুক্ত, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ৩১-৩৭।

৪৫। মমতাজুর রহমান তরফদারের মতে হুসাইন শাহের ১৮জন সন্তান ছিল (Husain Shahi, পৃঃ ৩৫৫), রিয়ায অনুযায়ী হুসাইন শাহের ১৮ জন পুত্র সন্তান ছিল (পৃঃ ১৩৪) ।

৪৬। কালিদাস গজদানীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণপূর্বক সুলায়মান খান নাম ধারণ সংক্রান্ত ঘটনাবলীর বিবরণের জন্য দেখুন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, পৃঃ ১৯৯-২০৮।

৪৭। Dacca, 1929, পৃঃ ৯৯-১০০ (পরবর্তীতে Frontier Policy হিসেবে উল্লিখিত)।

৪৮। আইন ২য়,পৃঃ ১৩০।

৪৯। Third Impression, পৃঃ ১৭৭-১৭৮।

৫০। Dhaka, 1952, পৃঃ ২৬ (পরবর্তীতে Old Dhaka. হিসেবে উল্লেখিত)

৫১। First Edition, Karachi 1961, পৃঃ ২২৪- ২২৫।

৫২। পূর্ববঙ্গ গীতিকা, পৃঃ ১৯৮।

৫৩। মোগল আমল, পৃঃ ৫৮।

৫৪। পূর্ববঙ্গ গীতিকা, পৃঃ ১৯৮- ২০১।

৫৫। M.A. Rahim : Social and Cultural History of Bengal Vol-II, 1967 , পৃঃ ১৯৮, (পরবর্তীতে Cultural Hist . হিসেবে উল্লিখিত)।

৫৬। আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ৬৪৮।

৫৭। রিয়ায, পৃঃ ১৩৯-১৪০।

৫৮। Husain Shahi, পৃঃ৮৮।

৫৯। First Published- 1968.

৬০। আবদুল করিমের দু'টি পুস্তকই ১৯৯২ খ্রীস্টাব্দে Institute of Bangladesh Studies - Rajshahi University থেকে প্রকাশিত হয়।

৬১। Mughal Period, পৃঃ ৭৩।

৬২। আবদুল করিমের সুদীর্ঘ আলোচনার জন্য দেখুন প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০-৭৭ এবং মোগল আমল , পৃঃ ৫৪-৬০।

Dhaka University Institutional Repository

৬৩। মোগল আমল, পৃঃ২৯।

৬৪। J.A.S.B- 1874, পৃঃ২০৯।

৬৫। J.A.S.B- 1873.

৬৬। J.A.S.B- 1873, পৃঃ২১৩।

৬৭। প্রাগুক্ত , পৃঃ ২১৩।

৬৮। প্রাগুক্ত , পৃঃ ২১৩, পাদটীকা।

৬৯। প্রাগুক্ত , পৃঃ ২১৫।

৭০। প্রাগুক্ত , পৃঃ ২১৬।

৭১। প্রাগুক্ত , পৃঃ ২১৮, পাদটীকা।

৭২। প্রাগুক্ত , পৃঃ ২২৩, পাদটীকা।

৭৩। প্রাগুক্ত , পৃঃ ২২৪, পাদটীকা।

৭৪। প্রাগুক্ত , পৃঃ ২৩১, পাদটীকা ।

৭৫। প্রাগুক্ত , পৃঃ ২৫১।

৭৬। Third Edition, 1977, পৃঃ ৩৬৫। ব্লখমান ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে আইন-ই-আকবরী প্রথম খন্ড ইংরেজীতে অনুবাদ করেন (Delwar Hussain, পৃঃ ৮৩) ।

৭৭। মোগল আমল, পৃঃ ৫৮।

৭৮। রিয়ায, পৃঃ ১৪৫, পাদটীকা - ২ এবং তারীখ, পৃঃ ১২৮-১২৯।

৭৯। পূর্ববঙ্গ গীতিকা, পৃঃ ১৯৮-১৯৯।

৮০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৭।

৮১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৯-২০৯।

৮২। আইন ২য়, পৃঃ ১৩০।

৮৩। Mughal Period, পৃঃ ৭৭।

৮৪। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ৬৪৭-৬৪৮।

৮৫। J.A.S.B, 1904, পৃঃ ৫৭।

৮৬। আবদুল করিম, মোগল আমল, পৃঃ ৪ এবং ৮৭-৮৮।

৮৭। H. Bengal., পৃঃ ১৭৭, মোগল আমল , পৃঃ ৬০ এবং বি,পি,পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ৩৭।

৮৮। রিয়ায, পৃঃ ৮।

৮৯। Baharistan-i- Ghaybi (OF Mirza Nathan) Translated by M.I. Borah, vol. II, Published by the Government of Assam in the department of Historical and

antiquarian studies, Narayni Handiqui Historical institute , Gauhati, Assam. First edition August 1936. পৃঃ ৭৯৬।

৯০। E. A. Gait : H. Assam ,পৃঃ ৬২, নিখিল নাথ রায়: প্রতাপাদিত্য , পৃঃ ৩৫, ৪৬, ৪৮, ৪৯,৫০, ৫১, সুধীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য: Frontier Policy, পৃঃ ৯৯-১০০ এবং M.A. Rahim: The Afghans, পৃঃ ২২৭ ।

৯১। Muslims of Bengal, পৃঃ ২৭৪ ।

৯২। ১৮৭০ এর দশকে বাংলার বিভিন্ন স্থানে কৃষক অসন্তোষ চরম আকার ধারণ করায় কৃষকের অধিকার সংক্রান্ত একটি অধিকতর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার বাধ্য হয়। এ উদ্দেশ্যে ১৮৭৯ সালে একটি Rent Commission গঠন করা হয়। কৃষি সম্পর্কের সঠিক অবস্থা বিচার বিবেচনা করে কমিশন একটি রিপোর্ট প্রদান করে। এ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই প্রণীত হয় ১৮৮৫ সালের বিখ্যাত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন (বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, ২য় খন্ড, বাংলা সংস্করণ ১৯৯৩, পৃঃ ২৪০)।

৯৩। W.W. Hunter : The Indian Musalmans - Reprinted from third edition - 1945. পৃঃ ১৫০, ১৭৭ এবং এম, এ, রহিম : বাংলার মুসলমান দের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৫, পৃঃ ৪৫-৫৪, ৫৫-৬৪ ।

৯৪। ভারত বর্ষ , আষাঢ়, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ১৭শ বর্ষ - ১মখন্ড, ১ম সংখ্যা,পৃঃ ৫৪ ।

৯৫। পূর্ববঙ্গ গীতিকা, পৃঃ ১৬১ ।

৯৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৮ ও ১৮২ পাদটীকা।

৯৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৮ ।

৯৮। আকবরনামা ৩য় , পৃঃ ২২৮ ।

৯৯। তারীখ, পৃঃ ৩-৫ ।

১০০।রিয়ায, পৃঃ ১৩৫ এবং The Afghans, পৃঃ ১৬১ ।

১০১। তারীখ , পৃঃ ১২৯।

১০২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৯ ।

১০৩। Husain Shahi ,পৃঃ ৮২, ৮৪ এবং রিয়ায ,পৃঃ ১৩৮ ।

১০৪। বি,পি,পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ ৩৫ এবং মোগল আমল, পৃঃ ৫৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

ঈসা খানের জন্ম, প্রাথমিক জীবন ও উত্থান

ভাগ ১ – ঈসা খানের জন্ম ঃ

ঈসা খান একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে কোন ঐতিহাসিক সুত্র এমনকি একমাত্র সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থ আকবরনামায়ও ঈসা খানের জন্ম সন বা তারিখ সম্বন্ধে কোনরূপ তথ্য পাওয়া যায় না। ফলশ্রুতিতে ঈসা খানের জন্মের সঠিক সন নির্ণয় করা দুরূহ হয়ে পড়ে। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু গবেষকরা নিশ্চেষ্ট থাকেন নি এবং তাঁরা এ মহান বীরের একটি সম্ভাব্য জন্ম সন নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। এখন নিম্নে তাঁদের আলোচনার সূত্র ধরে ঈসা খানের জন্মের একটি সম্ভাব্য সন নির্ণয়ের চেষ্টা করা গেলঃ

যে সকল পন্ডিত ব্যক্তি ঈসা খানের জন্ম সন নির্ণয়ের চেষ্টা করেন তাঁদের মধ্যে নলিনী কান্ত ভট্টশালী অগ্রগণ্য। তিনি মনে করেন যে, ১৫৩৬ খ্রীস্টাব্দের দিকে ঈসা খানের জন্ম হয়[১]। ভট্টশালীর পদাংক অনুসরণ করে এম,এ, রহিম ও আবদুল করিম ধারণা করেন যে, ঈসা খানের পিতা সুলায়মান খান বাংলার সৈয়দ বংশীয় শেষ সুলতান গিয়াস আল-দীন মাহ্‌মুদ শাহের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন এবং গিয়াস আল-দীন মাহ্‌মুদ শাহের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৫৩২ থেকে ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই সুলায়মানের বিয়ে হয় এবং ঐ সময়ের কোন এক সনে ঈসা খানের জন্ম হয়[২]। কিন্তু ঈসা খানের পিতৃপরিচয় সংক্রান্ত পূর্বের আলোচনায় দেখা যায় যে, সুলায়মান খানের পক্ষে গিয়াস আল-দীন মাহ্‌মুদ শাহ্ অপেক্ষা নুসরাত শাহের কন্যার পাণি গ্রহণই অধিকতর যুক্তি সংগত এবং এ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, সুলায়মান খান নুসরাত শাহের কন্যারই পাণি গ্রহণ করেন। নুসরাত শাহের রাজত্বকাল ১৫১৯ থেকে ১৫৩২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যেই সুলায়মানের বিয়ে হয় এবং এ সময়ের কোন এক সনে ঈসা খানের জন্ম হয়। তবে ধারণা করা যায় যে, ১৫২৭ থেকে ১৫৩২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই সুলায়মান খানের বিয়ে ও ঈসা খানের জন্ম হয়। এরূপ ধারণার কারণ হচ্ছে এই যে, পূর্বের আলোচনায় দেখা গেছে যে, ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দের ২১শে এপ্রিল পানি পথের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরে

Dhaka University Institutional Repository

পরাজিত আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মাহ্মুদ লোদীর পরিবারসহ একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোদী-আফগান অভিজাত বাংলার সৈয়দ সুলতান নুসরাত শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুলায়মান খানও এ সময় শরণার্থী হিসেবে নুসরাত শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পূর্বের আলোচনায় আরো দেখা গেছে যে, নুসরাত শাহ্ তাঁর এ আশ্রয় প্রার্থী আফগানদেরকে ভাতা ও জায়গীর প্রদান করেন এবং নিজে ইব্রাহিম লোদীর কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। নুসরাত শাহ্ কর্তৃক ইব্রাহিম লোদীর কন্যার পাণি গ্রহণের সঠিক তারিখ জানা যায় না । তবে ধারণা করা যায় যে, ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই নুসরাত শাহ্ ইব্রাহিম লোদীর কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। এ ঘটনার পরেই সুলায়মানের সাথে নুসরাত শাহের কন্যার বিয়ে হয়েছিল বলে অনুমেয়। এ অনুযায়ী ১৫২৭/২৮ খ্রীস্টাব্দের দিকে সুলায়মানের বিয়ে হয় এবং সম্ভবতঃ ১৫২৯/৩০ খ্রীস্টাব্দের দিকে ঈসা খানের জন্ম হয়। এ হিসেবে ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুর সময় ঈসা খানের বয়স ছিল ৬৯/৭০ বৎসর। এ বয়স ঈসা খানের কর্মবহুল জীবনের সাথে সংগতিপূর্ণ। জানা যায় যে, মুঘলদের সাথে ঈসা খানের সর্বশেষ সংঘর্ষ হয় ১৫৯৭ খ্রীস্টাব্দে এবং এ সংঘর্ষে ঈসা খান যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দেন এবং মুঘল বাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হন। এ ঘটনার দু'বছর পর ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে ঈসা খান মৃত্যুবরণ করেন, অর্থাৎ মুঘলদের সাথে সর্বশেষ সংঘর্ষের দু'বছর পর শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের সময়েই ঈসা খানের মৃত্যু হয়।এতে বুঝা যায় যে, ঈসা খানের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল এবং ৬৯/৭০ বছর বয়সে বার্ধক্য জনিত কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়। সুতরাং ১৫২৯/৩০ খ্রীস্টাব্দের দিকে ঈসা খানের জন্ম হয় বললে অত্যুক্তি হবে না।

ভাগ ২-ঈসা খানের প্রাথমিক জীবন ঃ

ঈসা খানের বাল্য ইতিহাস অদ্যাবধি ঘোর-রহস্যাবৃত। কেননা এ সংক্রান্ত কোন প্রামাণ্য দলিল এখনও পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া একমাত্র সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থ আকবরনামায় প্রদত্ত ঈসা খানের বাল্য জীবন সংক্রান্ত বিবরণও বিভ্রান্তিকর। এ অবস্থায় ঈসা খানের বাল্য ইতিহাস পুনর্গঠন অনেকাংশেই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। তবে ঈসা খানের পিতৃ পরিচয়, জন্ম ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত

ঘটনাবলীর সাহায্যে নিম্নে তাঁর প্রাথমিক জীবনের ইতিহাস সম্পর্কে একটা চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা গেল ঃ

ঈসা খানের পিতৃপরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করার সময় এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, নুসরাত শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী আলা-আল-দীন ফিরূয শাহ্‌কে হত্যা করে গিয়াস আল-দীন মাহ্‌মুদ শাহ্‌ বাংলার সিংহাসন দখল করে নিলে দেশে অন্তর্বিপ্লব দেখা দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে আলা-আল-দীন ফিরূয শাহের পক্ষীয় লোকজন সহ সুলায়মান খান ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা প্রাণ রক্ষার্থে দুর্গম ভাটি অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহা ১৫৩২ খ্রীস্টাব্দের ঘটনা এবং এ সময় ঈসা খানের বয়স বড়জোর ৩ বছর হওয়ার কথা। সুতরাং বলা যায় যে, ৩ বছর বয়স থেকে পিতার মৃত্যু পর্যন্ত ঈসা খানের শৈশব ও কৈশোর ভাটি অঞ্চলেই কেটেছে। আকবরনামা পাঠে জানা যায় যে, " ইসলাম শাহের (শের শাহের পুত্র) রাজত্বকালে ঈসা খানের পিতা অন্ততঃ দু'বার ভাটি অঞ্চলে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করেন। শেষ পর্যন্ত ইসলাম শাহের সেনাপতি তাজ খান ও দরিয়া খান কৌশলে তাঁকে আটক করেন এবং হত্যা করেন এবং তাঁর দু'পুত্র ঈসা ও ইসমাইলকে বণিকদের নিকট বিক্রয় করে দেন। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর তাজ খান কারারানী যখন বাংলায় ক্ষমতাশালী হন, তখন ঈসা খানের পিতৃব্য কুতব্‌ আল-দীন তাজ খানের খেদমত করে তাঁর সহানুভূতি লাভ করেন এবং ঈসা ও ইসমাইলকে অনেক অনুসন্ধান করে তুরাণ থেকে ফিরিয়ে আনেন । ঈসা খান তাঁর পক্ক বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার দ্বারা খ্যাতি অর্জন করেন এবং বাংলার বার- ভূঁঞাকে তাঁর অধীনে আনয়ন করেন''। আবুল ফযলের বক্তব্যে প্রতীয়মান হয় যে, পিতা সুলায়মান খানের মৃত্যুর পর ঈসা খান ও তাঁর ভ্রাতা ইসমাইল দাস হিসেবে বিক্রীত হন। কিন্তু ঈসা খান ও ইসমাইলের দাস হিসেবে বিক্রীত হওয়ার ঘটনা যেসব সন্দেহ ও আপত্তির জন্ম দেয় ইতোপূর্বে ঈসা খানের পিতার পরিচয় সংক্রান্ত আলোচনায় সে সব সন্দেহ ও আপত্তির কারণ সমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সঠিক বক্তব্য হচ্ছে এই যে, পিতার মৃত্যুর পর ঈসা খান পিতার জায়গীর বা জমিদারী থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন মাত্র, দাস হিসেবে বিক্রীত হয়ে অন্যত্র নীত হননি বরং ভাটি অঞ্চলেই তিনি আত্মগোপন করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ঈসা খান তাঁর পিতৃব্য কুতব্‌ আল-দীনের স্নেহেই লালিত পালিত হন এবং পরবর্তীকালে কারারানী বংশের প্রতিষ্ঠাতা তাজ খান কারারানীর অনুগ্রহে পিতৃ ইকতায় পুনর্বহাল হন। এরূপ ধারণার কারণ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমতঃ আবুল ফযলের বক্তব্যে প্রতীয়মান হয় যে, তাজ খান কারারানীর রাজত্ব কালেই পিতৃব্য কুতব্ আল-দীন অনেক অনুসন্ধানের পর ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বয়কে তুরাণ থেকে বাংলায় ফিরিয়ে আনেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, বাংলায় তাজ খানের শাসন ছিল মাত্র কয়েক মাস বা বড়জোর এক বছর[৫]।এ স্বল্প সময়ের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বয়কে কয়েক হাজার মাইল দূরে অবস্থিত তুরাণ দেশ থেকে খুঁজে বের করা এবং বাংলায় ফিরিয়ে আনার কথিত ঘটনা অতিরঞ্জিতই মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ একদিকে সে যুগের যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনকার মতো এতো উন্নত ছিলনা অন্যদিকে তখন উত্তর ভারতে মুঘল শাসন বর্তমান ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে বাংলা থেকে তুরাণ দেশে গিয়ে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করা যেমনি সময় সাপেক্ষ ছিল তেমনি মুঘল শাসিত অঞ্চলের উপর দিয়ে তুরাণ গিয়ে সেখান থেকে বাংলায় ফিরে আশাও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তৃতীয়তঃ আবুল ফযলের বক্তব্য থেকে ইহাও বুঝা যায় যে, তুরাণ থেকে আগমনের অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ তাজ খানের রাজত্ব কালেই ঈসা খান খ্যাতি অর্জন করেন এবং বাংলার বার-ভূঁঞাকে স্বীয় অধীনে আনয়ন করেন[৬]। আবুল ফযলের পদাংক অনুসরণ করে আধুনিক ঐতিহাসিক এম,এ, রহিম বলেন যে, তুরাণ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই অর্থাৎ ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে তাজ খান কারারানীর রাজত্ব কালে তাজ খান কারারানীর অনুগ্রহে ভাটি অঞ্চলে একটি জায়গীর প্রাপ্ত হয়ে কারারানী আফগানদের একজন সামন্ত হিসেবে ঈসা খান তাঁর কর্মময় জীবন শুরু করেন[৭]। কিন্তু প্রায় ১৫/১৬ বছর বিদেশ বিভূঁইয়ে অবস্থানের পর বাংলায় ফিরে এসে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ পরিস্থিতিতে জমিদারী লাভ করে স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে বার-ভূঁঞাদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যুক্তি সংগত বলে মনে হয় না। সুতরাং বলা যায় যে, ঈসা খান তাঁর পিতার মৃত্যুর পরও ভাটি অঞ্চলেই আত্মগোপন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর পিতৃব্য কুতব্ আল- দীনের সাথে তাজ খানের খেদমত করে তাঁর অনুগ্রহে পিতৃ- জমিদারী পুনঃ প্রাপ্ত হন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঈসা খান ও তাঁর পিতৃব্য কুতব্ আল- দীন এমন কি সাহায্য করেছিলেন যে কারণে তাজ খান কারারানী তাঁদের প্রতি সদয় হন এবং ঈসা খানকে তাঁর পিতৃ জমিদারী প্রত্যর্পণ করেন? এর উত্তরে বলা যায় বাংলায় সূর শাসনের স্থলে কারারানী শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাজ খান কারারানীকে সাহায্য প্রদানই ছিল এর যুক্তি সংগত কারণ। এরূপ ধারণা অযৌক্তিক নয়, কেননা ইসলাম শাহের রাজত্বকালে বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন মুহম্মদ খান সূর[৮] এবং এ সময়েই ঈসা খানের পিতাকে হত্যা করা হয় এবং তাঁর পরিবারবর্গ নিগৃহীত হয়। সুতরাং

সংগত কারণেই সূর শাসকদের প্রতি ঈসা খানের ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক এবং ঈসা খান প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে তাজ খান কারারানী যখন বাংলা আক্রমণ করেন[৯] তখন ঈসা খান ও তাঁর পিতৃব্য কুতুব্ আল- দীন এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন এবং তাজ খানের পক্ষে যোগদান করে তাঁকে বাংলায় কারারানী শাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। ফলশ্রুতিতে তাজ খান তাঁদের প্রতি সদয় হন এবং ঈসা খানকে তাঁর পিতৃ ইকতায় পুনর্বহাল করেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সুলায়মান খান কখন ইসলাম শাহের রাজত্বকালে বিদ্রোহ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন ? কোন ইতিহাস গ্রন্থেই এ সম্বন্ধীয় কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ভট্টশালী মনে করেন যে, ইসলাম শাহের রাজত্বকালে ১৫৪৬/৪৭ খ্রীস্টাব্দের দিকে সুলায়মান খান বিদ্রোহ করেন এবং ১৫৪৮ খ্রীস্টাব্দের দিকে মৃত্যুবরণ করেন[১০]। এ হিসেবে তখন ঈসা খানের বয়স ১৮/১৯ বছর হওয়ার কথা এবং তাজ খানের রাজত্ব কাল ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে ঈসা খানের বয়স ছিল ৩৪/৩৫ বছর।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ঈসা খানের জন্ম সন এবং বাংলায় কারারানী শাসন প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন কালের ঘটনাবলী সম্পর্কে যথা সম্ভব জানা যায়। ঈসা খান বাংলার সৈয়দ বংশীয় সুলতান নুসরাত শাহের দৌহিত্র ছিলেন এবং নুসরাত শাহের রাজত্বকালে ১৫২৯ /৩০ খ্রীস্টাব্দের দিকে ঈসা খানের জন্ম হয়। ১৫৩২ খ্রীস্টাব্দে ঈসা খানের মাতুল আলা আল-দীন ফিরূয শাহের মৃত্যুর পর ঈসা খানের পিতা সুলায়মান খান জীবন রক্ষার্থে ভাটি অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সময় ঈসা খানের বয়স ছিল বড় জোর ৩ বৎসর। এরপরও ১৫৪৮ খ্রীস্টাব্দে পিতার মৃত্যুর সময়েও ঈসা খান ভাটি অঞ্চলেই ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৮/১৯ বছর। পিতার মৃত্যুর পর ঈসা খান পিতৃ জমিদারী থেকে উচ্ছেদ হলেও ভাটি অঞ্চলেই থেকে যান এবং পিতৃব্য কুতুব্ আল-দীনের আশ্রয়েই লালিত-পালিত হন। পরবর্তীকালে ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে তাজ খান কারারানীর রাজত্ব কালে তাঁরই অনুগ্রহে ঈসা খান পিতৃ- ইকতায় পুনর্বহাল হন। এ সময় ঈসা খানের বয়স ছিল ৩৪/৩৫ বছর। এক কথায় বলা যায় যে, ভাটি অঞ্চলেই ঈসা খানের শৈশব, কৈশোর ও যৌবন কাল অতিবাহিত হয়েছে এবং এ ভাটি অঞ্চল থেকেই তাঁর পরবর্তী গৌরবময় কর্মজীবনের সূত্রপাত ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

ভাগ ৩ - আফগান সামন্ত হিসেবে ঈসা খান ঃ

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে জানা যায় যে, ঈসা খান বাংলায় কাররানী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা তাজ খান কাররানীর অনুগ্রহে পিতৃ জমিদারী ফিরে পান। এতে প্রতীয়মান হয়, ঈসা খান কাররানী আফগানদের অধীনে একজন সামন্ত হিসেবে তাঁর কর্মময় জীবন আরম্ভ করেন। ঈসা খান যে, তাজ খান কাররানী থেকে আরম্ভ করে দায়ূদখান পর্যন্ত সকল কাররানী শাসকদের প্রতি অনুগত ছিলেন এবং তাঁদের খেদমত করতেন তা আবুল ফযলের নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে বুঝা যায়। তিনি বলেন ঃ "Out of foresight and cautiousness he refrained from waiting upon the rulers of Bengal , though he rendered service to them and sent them presents. From a distance he made use of submissive language". [১১] আবুল ফযলের বক্তব্যে দেখা যায় যে, ঈসা খান বাংলার শাসকদের (the rulers of Bengal) খেদমত করতেন এবং তাঁদের নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করতেন। কিন্তু দূরদর্শিতা ও সতর্কতাহেতু তাঁদের সাথে সাক্ষাত করতেন না, দূর থেকে আনুগত্যের ভাষা ব্যবহার করতেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঈসা খান বাংলার কোন শাসকদের খেদমত করতেন? এর উত্তরে বলা যায় যে, তিনি বাংলার কাররানী আফগান শাসকদের খেদমত করতেন। কেননা যেহেতু ঈসা খান কখনও মুঘল বাদশাহ্ কিংবা মুঘল সুবাহ্দারদের প্রতি অনুগত ছিলেন না সেহেতু মুঘল শাসকদের খেদমত করার প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, ঈসা খান বাংলার কাররানী আফগান শাসকদের তথা তাজ খান কাররানী থেকে শুরু করে দায়ূদ খান কাররানী পর্যন্ত সকল কাররানী শাসকদের প্রতি অনুগত ছিলেন, তাঁদের খেদমত করতেন এবং উপঢৌকন প্রেরণ করতেন। তবে নিজস্ব স্বকীয়তা রক্ষার্থে তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন না, শুধু দূর থেকেই আনুগত্য প্রদর্শন করতেন।

তাজ খান কাররানীর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা সুলায়মান খান কাররানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার একচ্ছত্র অধিপতি হন। এ সময় আফগানরা উত্তর ভারত থেকে বিতাড়িত হলেও সুলায়মান কাররানীর নেতৃত্বে পূর্বভারতে তাদের কর্তৃত্ব অটুট ছিল। সুলায়মান কাররানী নিসন্দেহে একজন বিচক্ষণ রাজনীতিক ও শাসক ছিলেন। আইন-ই-আকবরী- তে সুলায়মান কাররানীর প্রতি ঈসা খানের অনুগত থাকার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আবুল ফযল বলেন, "The tract of country

Dhaka University Institutional Repository

on the east called Bhati, is reckoned a part of this province. It is ruled by Isa Afghan and the Khutbah is read and the coin struck in the name of his present Majesty ... Adjoining it, is an extensive tract of country inhabited by the Tipperah tribes. The name of the ruler is Bijay Manik" [১১] আবুল ফযলের বক্তব্য থেকে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী পাওয়া যায় ঃ

ক) এ প্রদেশের (বাংলার) "ভাটি" নামে পরিচিত পূর্বাঞ্চল এ প্রদেশের অন্তর্গত বলিয়াই গণ্য করা হয়। ইহা ঈসা আফগানের (ঈসা খানের) শাসনাধীন এবং তাঁর বর্তমান সুলতানের (his present Majesty) নামেই খুৎবা পাঠ ও মুদ্রাংকন করা হয়।

খ) ইহার (ভাটি) সংলগ্ন এক বিস্তৃত অঞ্চলে তিপ্রা জাতির বাস । (তাদের) শাসকের নাম বিজয় মাণিক্য।

আবুল ফযলের বক্তব্যে দেখা যায় যে, তিনি ঈসা খানকে ভাটি অঞ্চলের শাসক হিসেবে অভিহিত করেছেন। তবে ঈসা খান কর্তৃক খুৎবা পাঠ ও মুদ্রাংকনের কথা বললেও ঈসা খান কার নামে তা করতেন সে সম্পর্কে আবুল ফযল কিছুই বলেন নি। অর্থাৎ তিনি ঈসা খানের "Present Majesty" বলতে কাকে বুঝিয়েছেন? কিন্তু ঈসা খানের নাম উল্লেখের সাথে সাথে ত্রিপুরার রাজা বিজয় মাণিক্যের নাম উল্লেখ করায় বুঝা যায় ঈসা খান ত্রিপুরার রাজা বিজয় মাণিক্যের সমসাময়িক ছিলেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ত্রিপুরার রাজা বিজয় মাণিক্য ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫৭১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন[১২]। এ অনুযায়ী ঈসা খান ১৫৭১ খ্রীস্টাব্দ কিংবা এর পূর্ব থেকেই ভাটি অঞ্চলের শাসক ছিলেন। ১৫৭১ খ্রীস্টাব্দে বাংলার শাসক ছিলেন সুলায়মান কাররানী। যদি ঈসা খান কোন সুলতান বা শাসকের নামে খুৎবা পাঠ করেই থাকেন তবে নিশ্চয়ই তা সুলায়মান কাররানীর নামে করেছিলেন (তবে তা প্রমাণ সাপেক্ষ)। কিন্তু ঈসা খান কর্তৃক মুদ্রাংকনের ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেননা বাংলার কোন শাসকের কিংবা নিজের নামাংকিত ঈসা খান কর্তৃক জারীকৃত কোন মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। যাহোক, ঈসা খান কর্তৃক মুদ্রাজারীর ঘটনা সত্য না হলেও আবুল ফযলের বক্তব্য প্রমাণ করে যে, সুলায়মান কাররানীর রাজত্ব কালে (১৫৬৫-৭২) ঈসা খান ভাটি অঞ্চলের শাসক ছিলেন এবং তিনি সুলায়মান কাররানীর প্রতি অনুগত ছিলেন। সুতরাং বলা যায় যে,

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খান, সুলায়মান কারারানীর প্রতিনিধি হিসেবেই ভাটি অঞ্চল শাসন করতেন। সুলায়মান কারারানীর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কারারানী শাসক হচ্ছেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র এবং কারারানী বংশের সর্বশেষ শাসক দায়ূদ খান কারারানী। দায়ূদ খান ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দের ১২ই জুলাই পর্যন্ত রাজত্ব করেন[১৮]। দায়ূদ খান কারারানীর প্রতি ঈসা খানের অনুগত থাকার প্রমাণ আবুল ফযলের আকবর নামা এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক সূত্রে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে এম, এ, রহিমের বক্তব্যই প্রথমে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "Rajmala records that the "Twelve chiefs" of Bengal helped Daud Karrani in 1573 A.D. in his expedition in Chittagong against Udayamanikya, the king of Tripura. Isa Khan, who contested the mighty forces of the Mughal Emperor Akbar in 1575 A.D, was certainly one of the Bara Bhuyans of Bengal by 1573 A.D."[১৯] এম, এ, রহিমের বক্তব্যে দেখা যায় যে, ঈসা খান ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা উদয়মাণিক্যের (১৫৭২-১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দ) বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম অভিযানে দায়ূদ খান কারারানীক সাহায্য করে ছিলেন এবং ঐ সময় তিনি বাংলার বার-ভূঁঞাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। অন্যদিকে আকবরনামা পাঠে জানা যায় যে, ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মুঘল সেনাপতি মুনিম খানের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ মাত্রই দায়ূদ খান কারারানীর সাথে ঈসা খানও একযোগে মুঘল বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। একদিকে দায়ূদ খান কটকের সন্ধি ভঙ্গ করে ভদ্রকের মুঘল সেনাপতি নযর বাহাদুরকে হত্যা করেন এবং জালেশ্বর থেকে মুরাদ খানকে বিতাড়িত করেন, অন্যদিকে ঈসা খান পূর্ব বাংলার পানি-সীমা থেকে মুঘল নৌ-সেনাপতি শাহ বর্দীকে বিতাড়িত করেন[২০]। এ ঘটনার পর ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দের ১২ই জুলাই রাজমহলের যুদ্ধে কারারানী বংশের সর্বশেষ শাসক দায়ূদ খান কারারানী মুঘল সুবাহদার খান-ই-জাহানের নিকট পরাজিত ও নিহত হন। এ যুদ্ধে ঈসা খানের ভূমিকা কি ছিল তা জানা যায়না । তবে সতীশচন্দ্র মিত্র মনে করেন, ঈসা খান রাজমহলের যুদ্ধে মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছিলেন[২১]। সতীশ চন্দ্র মিত্রের ধারণা সত্য হোক বা না হোক, ইহা সত্য-যে, ঈসা খান দায়ূদ খানের প্রতি তখনও অনুগত ছিলেন।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, ঈসা খান বাংলায় কারারানী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা তাজ খান কারারানীর অনুগ্রহে ভাটি অঞ্চলে জমিদারী লাভ করেন এবং তখন থেকেই তিনি কারারানীদের অধীনে একজন সামন্ত ছিলেন। তাজ খান কারারানীর পর সুলায়মান কারারানীর শাসনামলে ঈসা খান স্বীয় কর্মদক্ষতা

Dhaka University Institutional Repository

ও আনুগত্যের দ্বারা সুলায়মান খানের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন এবং ১৫৭১ খ্রীস্টাব্দের দিকে অর্থাৎ জায়গীর লাভের প্রায় ৭ বছরের মধ্যে সমগ্র ভাটি অঞ্চল শাসনের অধিকার লাভ করেন। সুলায়মান কাররানীর পর দায়ুদ খান কাররানীর শাসনামলে তিনি আরো শক্তি সঞ্চয় করেন এবং ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দে দায়ুদ খান কাররানীকে চট্টগ্রাম বিজয়ে সক্রিয় ভাবে সাহায্য করেছিলেন। এরপর তিনি এতটুকু শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে মহাপরাক্রমশালী মুঘল বাদশাহ্ আকবরের নৌ-বাহিনীকে পূর্ব বাংলার পানি-সীমা থেকে বিতাড়িত করতে সফল হয়েছিলেন। অতএব দেখা যায় যে, ঈসা খান বাংলার কাররানী আফগান শাসকদের সামন্ত হিসেবে জীবন শুরু করেন এবং কাররানী শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁদের প্রতি অনুগত ছিলেন এবং কাররানী শাসকদেরই ছত্র ছায়ায় ধীরে ধীরে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঃ ঈসা খান সর্বপ্রথম ভাটির কোন অঞ্চলের জমিদারী লাভ করেছিলেন এবং কোন অঞ্চল থেকেই-বা তিনি কালক্রমে ক্ষমতা বিস্তার করে সমগ্র ভাটির অধীশ্বর এবং বার-ভূঁঞাদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন? ক্ষমতায় আরোহণের প্রথম দিকে ঈসা খানের জমিদারী কোথায় ছিল, তা নির্ণয় করা দূরহ ব্যাপার। কেননা এ সংক্রান্ত কোন প্রামাণ্য দলিল পাওয়া যায়নি । তবে আধুনিক ঐতিহাসিক ভট্টশালী, আবদুল করিম ও এম, এ, রহিম মনে করেন যে, ক্ষমতায় আরোহণের প্রথম দিকে ঈসা খান সরাইল পরগনার জমিদার ছিলেন [১৮]। তাঁরা আরো ধারণা করেন যে, সরাইল থেকেই ঈসা খান কালক্রমে ক্ষমতা বিস্তার করে সমগ্র ভাটি অঞ্চলের অধীশ্বর হন এবং বার-ভূঁঞার নেতার মর্যাদা লাভ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ভট্টশালী ও আবদুল করিম তাঁদের বক্তব্যের স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করলেও এম, এ, রহিম তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে কোন যুক্তিই উপস্থাপন করেন নি। ভট্টশালী ও আবদুল করিমের যুক্তি গুলো হচ্ছে ঃ (ক) আকবর নামায় বর্ণিত ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে মুঘল সুবাহ্দার খান - ই - জাহানের ভাটি অভিযান, মুঘল নৌ-সেনাপতি শাহ্ বর্দী ও মুহম্মদ কুলীকে ঈসা খানের বিরুদ্ধে প্রেরণ এবং কস্তুলের নিকট সংঘটিত যুদ্ধে ঈসা খানের পরাজয় ও পলায়ন ইত্যাদি ঘটনা। (খ) রাজমালায় বর্ণিত মুঘল বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে সরাইলের ঈসা খান কর্তৃক ত্রিপুরার রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা, ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্য (১৫৭৭ - ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দ) কর্তৃক ঈসা খানকে ৫২০০০ সৈন্য প্রদানের ঘটনা

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি। বস্তুতঃ এদু'টি ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমেই তাঁরা মত ব্যক্ত করেন যে, ক্ষমতায় আরোহণের প্রথম দিকে ঈসা খান সরাইলের জমিদার ছিলেন। কিন্তু যুক্তি সংগত কারণেই তাঁদের সাথে একমত হওয়া যায়না। প্রথমতঃ নির্ণয় করতে হবে ঈসা খান প্রথম কখন জমিদারী লাভ করেন? এবং কে তাঁকে সরাইলের জমিদারী প্রদান করেন? প্রথম প্রশ্নটির উত্তরে বলা যায় যে, ভট্টশালী, এম, এ, রহিম ও আবদুল করিম সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, তাজ খান কাররানীর শাসনামলে ঈসা খান প্রথম জমিদারী লাভ করেন।[১৯] এ ছাড়া পূর্বের আলোচনায়ও দেখা যায় যে, তাজ খান কাররানীর শাসনামলেই ঈসা খান প্রথম জমিদারী লাভ করেন। সুতরাং এ বিষয়ে আর কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে অর্থাৎ কে ঈসা খানকে সরাইলের জমিদারী প্রদান করেন সে সম্পর্কে ভট্টশালী ও আবদুল করিমের বক্তব্য সুস্পষ্ট নয়। অন্যদিকে এম, এ, রহিম মনে করেন যে, তাজ খান কাররানীই ঈসা খানকে জমিদারী প্রদান করেন।[২০] তবে এম, এ, রহিম সরাইলের জমিদার হিসেবে ঈসা খানের কর্মময় জীবন আরম্ভের কথা বললেও তিনি বলেন নি যে, তাজ খান কাররানী সরাইলেই ঈসা খানকে জমিদারী প্রদান করেন। "তাজ খান কাররানী, ঈসা খানকে জমিদারী প্রদান করেছেন," বলে এম, এ, রহিমের এ বক্তব্যের সাথে ঐকমত্য পোষণ করা যায়। কেননা পূর্বের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, ঈসা খান তাজ খান কাররানীর নিকট থেকেই জমিদারী লাভ করেন এবং তাজ খান কাররানী তথা কাররানীদের অধীনস্থ সামন্ত হিসেবেই জীবন শুরু করেন। কিন্তু ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে তাজ খান কর্তৃক ঈসা খানকে সরাইলের জমিদারী প্রদান এবং ঈসা খানের পক্ষে ঐ সময় সরাইলে অবস্থান করা কতটুকু যুক্তি সংগত ও নিরাপদ ছিল তাও ভাবনার বিষয়। কেননা সরাইল পরগনা এমন এক স্থানে অবস্থিত যা এক কথায় বলা যায় ত্রিপুরা রাজার হাতের মুঠোয়। তাই ত্রিপুরার রাজার হাতের নাগালের মধ্যে বাংলার শাসকের প্রতি অনুগত একজন সামন্তের অবস্থান নিরাপদ থাকার কথা যুক্তি সংগত নয়। জানা যায় যে, ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দের দিকে ত্রিপুরার রাজা ছিলেন বিজয় মাণিক্য এবং তাঁর শাসনের অধিকাংশ সময় চট্টগ্রামের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে বাংলার শাসকের সাথে তাঁর একাধিক সংঘর্ষ হয়েছিল।[২১] শুধু তাই নয়, বিজয় মাণিক্য ১৫৫৯ খ্রীস্টাব্দে যখন বাংলায় অভিযান পরিচালনা করেন তখন তিনি সরাইল থেকেই তাঁর যাত্রা শুরু করেন এবং প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র, লক্ষ্যা ও পদ্মা নদী দিয়ে মহেশ্বরদী, সোনারগাঁও এবং বিক্রমপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে পুনরায় ত্রিপুরা রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।[২২] বিজয় মাণিক্য এ বঙ্গ

Dhaka University Institutional Repository

অভিযানে কোন রূপ বাধার সম্মুখীন হয়ে ছিলেন বলে জানা যায় না। সুতরাং যেখানে ১৫৫৯ খ্রীস্টাব্দে সরাইল থেকে বিক্রমপুর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বিজয় মাণিক্যের অবাধ বিচরণ ছিল সেখানে ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে কিংবা এর পরেও সরাইলের উপর তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকা অসম্ভব ছিলনা। তাই নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় ত্রিপুরা রাজ্যের নাকের ডগায় অবস্থিত সরাইলে বাংলার শাসকের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ত্রিপুরার রাজা বিজয় মাণিক্যের শাসনকাল ১৫৭১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার শাসকের প্রতি অনুগত কোন সামন্ত নিরূপদ্রব থাকা কোন ক্রমেই সম্ভব ছিলনা। অধিকন্তু বিজয় মাণিক্যের পরবর্তী রাজা উদয় মাণিক্যের শাসনামলেও (১৫৭২ থেকে ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দ[২৩]) সরাইলে বাংলার শাসকের কোন সামন্তের অবস্থান সম্ভব ছিলনা। কেননা জানা যায় যে, ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দে বাংলার শাসক দায়ুদ খান কারারানী কর্তৃক প্রেরিত চট্টগ্রাম অভিযানে ত্রিপুরার রাজা উদয় মাণিক্যের বিরুদ্ধে ঈসা খান অন্যান্য ভূঁঞাদের সাথে দায়ুদ খানকে সাহায্য করেছিলেন।[২৪] এছাড়া উদয় মাণিক্যের শাসন কালে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ঈসা খানকে দায়ূদ কারারানীর সাথে একযোগে পূর্ব বাংলার পানি- সীমা থেকে মুঘল নৌ-বাহিনীকে বিতাড়িত করতে দেখা যায়।[২৫] এতে বুঝা যায় ঈসা খান দায়ূদ খান কাররানীর প্রতি অনুগত ছিলেন। সুতরাং ত্রিপুরার রাজা উদয় মাণিক্যের চরম শত্রু বাংলার শাসক দায়ূদ খান কারারানীর প্রতি অনুগত কোন সামন্তের পক্ষেই উদয়মাণিক্যের শাসন কাল ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর নাগালের মধ্যস্থিত সরাইল পরগনার জমিদার থাকার ঘটনা সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না। অন্যদিকে ঈসা খানকে ত্রিপুরার রাজার সামন্ত হিসেবে ধরে নিলে প্রশ্ন থাকে যে, তিনি ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা উদয় মাণিক্যের বিরুদ্ধে বাংলার শাসক দায়ূদ খান কারারানীকে সাহায্য করেছিলেন কেন? এবং ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা উদয় মাণিক্যের শত্রু দায়ূদ খান কারারানীর পক্ষাবলম্বন করে মুঘল নৌ-বাহিনীকে পূর্ব বাংলার পানি- সীমা থেকে বিতাড়িত করলেন কেন? ইতিহাসে এ প্রশ্নদ্বয়ের যথার্থ উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত ঃ আবুল ফযলের বিবরণ অনুযায়ী ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে মুঘল বাহিনীর সাথে ঈসা খানের যুদ্ধ হয়েছিল কস্তুল (Kastal) নামক স্থানে[২৬]। ভট্টশালী এবং আবদুল করিম কস্তুল বা কাইথাল বা কাথাইলের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করেন। তাঁদের মতে কস্তুল মেঘনা নদীর তীরে অষ্টগ্রামের দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। অষ্টগ্রাম জোয়ানশাহী পরগনায় অবস্থিত এবং কস্তুল বা জোয়ানশাহীর পূর্ব দিকে মেঘনার অপর পারে অবস্থিত সরাইল পরগনা [২৭]। সহজ কথায় বলা যায় কস্তুল মেঘনা নদীর পশ্চিম তীরে এবং সরাইল পরগনা

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বতীরে অবস্থিত। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সরাইল পরগনায় কোন যুদ্ধই হয়নি, যুদ্ধ হয়েছে জোয়ানশাহী পরগনায়। সুতরাং ঈসা খান যদি সরাইল পরগনারই জমিদার হয়ে থাকেন তবে যেহেতু সরাইল পরগনায় যুদ্ধই হয়নি সেহেতু ঈসা খান নিজ জমিদারী ছেড়ে দিয়ে সাহায্যের জন্য অন্যত্র যাওয়ার প্রশ্নই উঠেনা। অন্যদিকে ঈসা খান যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই দেখা যায় মজলিস দিলাওয়ার ও মজলিস প্রতাপ নামক দু'জন স্থানীয় জমিদার মুঘল বাহিনীকে আক্রমণ করে এমন শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেন যে, ভয়ে মুঘল সৈন্যরা পশ্চাৎদ্ধাবন করতে থাকে এবং সৌভাগ্যক্রমে টিলা গাযী নামক একজন জমিদার মুঘল বাহিনীকে পশ্চাদপসরণে সাহায্য করায় তারা নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়[২৮]। এক্ষেত্রে যৌক্তিক বক্তব্য হচ্ছে , ঈসা খান প্রথমে পরাজিত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে পারেন, কিন্তু যে যুদ্ধে অব্যবহিত পরেই মুঘলরাও ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়ে প্রাণ রক্ষার্থে পলায়নে বাধ্য হয় এবং সৌভাগ্যক্রমে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা পায়, তাতে হতোদ্যম হওয়ার এমন কি আছে, যে ঈসা খান একে বারে নিজ জমিদারী ছেড়ে অন্যত্র পলায়ন করবেন? কেননা যুদ্ধটি হয় মেঘনার পশ্চিম তীরে জোয়ানশাহী পরগনায় এবং মেঘনার পূর্বতীরে অবস্থিত তাঁর কথিত জমিদারী সরাইল ছিল সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধহীন ও নিরাপদ। সুতরাং ঈসা খান যদি সরাইলেরই জমিদার হয়ে থাকেন তবে তিনি অন্যত্র যাওয়ার কোন যৌক্তিকতাই থাকতে পারে না।

তৃতীয়তঃ আবুল ফযল <u>আকবর নামার</u> কোথাও সরাইলকে ঈসা খানের জমিদারী হিসেবে উল্লেখ করেননি। এমনকি মজলিস দিলাওয়ার ও মজলিস প্রতাপের জমিদারীর নামও উল্লেখ করেন নি। তবে তিনি বলেন ; "Majlis Dilawar and Majlis Pratap, who were landholders in that part of the country".[২৯] আবুল ফযলের এ উক্তিটি এবং যুদ্ধ স্থান কত্তুলের উপর নির্ভর করেই ভট্টশালী ও আবদুল করিম মত প্রকাশ করেন যে, সরাইল ঈসা খানের, জোয়ানশাহী মজলিস দিলাওয়ারের এবং খালিয়াজুরী পরগনা মজলিস প্রতাপের জমিদারী; এক্ষেত্রে আবদুল করিমের নিজস্ব কোন বক্তব্য নেই, তিনি শুধু ভট্টশালীকে অনুসরণ করেছেন মাত্র।[৩০] অথচ ভট্টশালী অন্যত্র উল্লেখ করেন যে, "These two Majlises are to be accommodated in the Parganas of Khaliajuri, Joanshanhi and Sarail."[৩১] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে,ভট্টশালীর পরিবেশিত এদু'টি বক্তব্যের মধ্যে কোনরূপ পারস্পরিক মিল নেই। তাই বলা যায় ভট্টশালী, ঈসা খানকে সরাইলের জমিদার হিসেবে প্রতিপন্ন করার বৃথা চেষ্টাই করেছেন মাত্র। চতুর্থতঃ

Dhaka University Institutional Repository

যে রাজমালা ভট্টশালী ও আবদুল করিমের বক্তব্যের অন্যতম ভিত্তি তা সতর্কতার সাথে পাঠ করলে দেখা যাবে যে, তাঁরা যে ঘটনার উপর ভিত্তি করে ঈসা খানকে সরাইলের জমিদার রূপে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পেয়েছেন তা ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দের অনেক পরের ঘটনা। এখন নিম্নে কালক্রমানুসারে রাজমালায় বর্ণিত ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্যের শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা সমূহ উপস্থাপন করা হল ঃ

অমর মাণিক্য রাজা ছিল পুণ্যবান,
অমর সাগর খনিবারে করে অনুষ্ঠান।

অমর সাগর দীঘী বিস্তার করিয়া,
খনাইব বঙ্গদেশী দাড়ি সব দিয়া।

সেই মত দাড়ি সব আসিল তখন,
অমর সাগর দীঘী খনিতে আরম্ভন।
আর দিন অমর মাণিক্য রাজা বলে,
দীর্ঘিকা খনিতে দাড়ি কেবা কত দিলে।
সুবুদ্ধি নারায়ণ হরিশ্চন্দ্র তনয়,
নৃপতিকে সম্বোধিয়া কহিছে নির্ণয়।

কেহ ভয়ে কেহ প্রীতে কেহ মান্যে দিল,
বার বাঙ্গালায় দিছে তরপে না দিল।
একথা শুনিয়া রাজা বড় ক্রোধ হৈল,
রাজ্যের নিকটে রাজ্য আমা গ্লানি কৈল।
রাজধর রাজপুত্র যুদ্ধে নিয়োজিল,
বাইশ সহস্র সেনা তান সঙ্গে দিল।
জিকুয়া গ্রামেতে সৈন্য কোঠ বান্ধি রৈল,
মুছেলস্কর সৈদ্ধিরাম তাতে ধরা গেল।
পিতা পুত্র দুইজন পিঞ্জরে ভরিয়া,
উদয়পুরে লৈয়া গেল ত্বরিত করিয়া।

এই ক্রমে চলিলেক শ্রীহট্ট যুদ্ধেতে,

Dhaka University Institutional Repository

সুরমা উজাইয়া নৌকা শ্রীহট্টেতে গেল,
ফতেখাঁ পাঠান সঙ্গে পূর্ব্বে যুদ্ধ দিল।

তার পর রাজধর শ্রীহট্টেতে গেল,
আদি নামে এক দীঘী সেই স্থানে দিল।

পনর শ চারি শাক পৌষ মাস শেষে ,
মাঘের পনর দিনে ফতে খাঁ লৈয়া আসে।

ফতে খাঁ রাজার সঙ্গে সাক্ষাত করিল ,
মহারাজা ফতে খাঁকে বহু আশ্বাসিল।

উদয়পুর হৈতে খাঁ শ্রীহট্টে, আসিল,
সেই কালে মুছে লস্কর ছাড়িয়া যে দিল।

তার কত দিন পর বঙ্গেতে উৎপাত,
দিল্লীর উমরা সৈন্য আইসে অকস্মাৎ।
ভঙ্গ দিল ইছা খাঁ সরাইল হইতে,
নৃপতি সাক্ষাতে আইসে মেহার কুল পথে[৩৩]।

রাজমালার উপরোক্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, "ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্য (১৫৭৭-১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দ) ১৫০০শকে [৩৩] অর্থাৎ ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে "অমর সাগর" নামক একটি দীঘি খননের কাজ শুরু করেন। এ দীঘি খননের কাজে বাংলার বার-ভূঁঞাগণ তাঁকে শ্রমিক দিয়ে সাহায্য করেন। কিন্তু তরপের জমিদার সৈয়দ মুসা ত্রিপুরার রাজাকে শ্রমিক দিয়ে সাহায্য করেন নি। ফলে রাজা অমর মাণিক্য ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর পুত্র রাজধর মাণিক্যের নেতৃত্বে বাইশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী সহ তরপের জমিদারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যুবরাজ রাজধর তরপের জমিদার ও তাঁর পুত্রকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করে উদয়পুরে প্রেরণ করেন। এ যুদ্ধে ত্রিপুরার যুবরাজ রাজধরের বিরুদ্ধে সিলেটের জমিদার ফতে খাঁ তরপের জমিদার সৈয়দ মুসাকে সাহায্য করেন। এ কারণে সিলেটের জমিদার ফতে খাঁর বিরুদ্ধেও অভিযান প্রেরণ করা হয়। যুবরাজ

রাজধর মাণিক্য ১৫০৩ শকে অর্থাৎ ১৫৮১ খ্রীস্টাব্দে সিলেট জয় করেন এবং এ উপলক্ষে একটি মুদ্রা ও জারী করা হয়[৩৩]। অতপর ১৫০৪ শকে অর্থাৎ ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে সিলেটের জমিদার ফতে খাঁকেও বন্দী করে উদয়পুরে আনা হয়[৩৪]। যাহোক , শেষ পর্যন্ত রাজা অমর মাণিক্য তরপের জমিদার সৈয়দ মুসা ও সিলেটের জমিদার ফতে খাঁকে মুক্তি প্রদান করেন। এঘটনার কিছুকাল পরেই দিল্লীর সৈন্যরা সরাইলে হানা দেয়। ফলে ঈসা খান সরাইল থেকে পলায়ন করে মেহেরকুলের পথ ধরে ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরে গিয়ে উপস্থিত হন এবং রাজা অমর মাণিক্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন[৩৫]। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শেষোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই ঈসা খান ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। এ ঘটনার সাথে আকবর নামায় বর্ণিত ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে মুঘল সুবাহ্দার খান - ই- জাহানের ভাটি অভিযান এবং কস্তুলের নিকট মুঘল বাহিনীর সাথে যুদ্ধে ঈসা খানের পরাজয় ও পলায়নের ঘটনার যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমেই ভট্টশালী ও আবদুল করিম মত প্রকাশ করেন যে, ঈসা খান ক্ষমতায় আরোহণের প্রথম দিকে সরাইলের জমিদার ছিলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কত খ্রীস্টাব্দের দিকে ঈসা খান এ সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন? রাজমালায় এ ঘটনার কোন নির্দিষ্ট তারিখ বা সনের উল্লেখ নেই। তবে রাজমালার উপরোক্ত বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইহা ১৫০৩ শকে [৩৬] অর্থাৎ ১৫৮১ খ্রীস্টাব্দে অমর সাগর খনন সমাপ্ত হওয়ার পর ঐ বৎসরেই অমর সাগর উৎসর্গকরণ ও দেবালয় প্রতিষ্ঠার পর এবং ১৫০৪ শকে অর্থাৎ ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে সিলেটের জমিদার ফতে খাঁকে বন্দী করে উদয়পুরে আনয়ন ও পরিশেষে ফতে খাঁ এবং সৈয়দ মুসাকে মুক্তি প্রদানের পরের ঘটনা।এক কথায় বলা যায় ইহা ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দের পরের ঘটনা। তাই অনেকটা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দের পরেই মুঘলরা সরাইলে হানা দেয় এবং ঈসা খান সরাইল থেকে পলায়ন করে উদয়পুরে গিয়ে রাজা অমর মাণিক্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দের পরে মুঘলরা সরাইলে হানা দেয় কখন? আকবর নামা পাঠে জানা যায় যে, ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে শাহ্বায খানের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী ভাটি অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করে এবং খিযিরপুর,সোনারগাঁও এবং ঈসা খানের বাসস্থান কতরাব দখল করে নেয়[৩৭]। বার-ভূঁঞা নেতা ঈসা খান তখন কুচবিহারে ছিলেন। এ সময় বিজয়োন্মত্ত মুঘল সৈন্যদল সরাইলেও হানা দিয়েছিল,[৩৮] যার পরিপ্রেক্ষিতে সরাইলের জমিদার বলে কথিত ঈসা খান সরাইল থেকে পলায়ন করে ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরে গিয়ে রাজা অমর মাণিক্যের

Dhaka University Institutional Repository

নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু বার- ভূঁঞা নেতা ঈসা খান তখন কুচবিহারে ছিলেন [৩৯] এবং শাহ্বায খানের ভাটি অভিযানের প্রথম দিকে ঈসা খানের সাথে তাঁর কোন যুদ্ধই হয়নি। তাই সঙ্গত কারণেই তাঁর উদয়পুরে গিয়ে রাজা অমর মাণিক্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনার প্রশ্নই উঠেনা। তবে রজামালায় রাজা অমর মাণিক্যের নিকট যে ঈসা খান সাহায্য প্রার্থনা করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ব্যক্তি হয়ে থাকবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্যের রাজত্বকালে সরাইলে ঈসা খান নামধারী একজন জমিদারের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়[৪০]। বাংলার বার-ভূঁঞা নেতা ঈসা খান এবং একই নামের অধিকারী সরাইলের ঈসা খানকে অনেকেই অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস করেন। এমন কি রাজমালার এক সংস্করণে দুই ঈসা খানকে একই ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়[৪১]। এর উপর ভিত্তি করেই ভট্টশালী ও আবদুল করিম মত প্রকাশ করেন যে, ক্ষমতায় আরোহণের প্রথম দিকে ঈসা খান সরাইলের জমিদার ছিলেন। কিন্তু রাজমালার অন্য এক সংস্করণের সম্পাদক কালী প্রসন্ন সেন এ ক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন সরাইলের ঈসা খান এবং বার-ভূঁঞা নেতা ঈসা খান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন[৪২]।এ অভিমতটি গ্রহণযোগ্য মনে করাই সমীচীন (এ বিষয়ে পরে আরো আলোচনা পেশ করা হবে)।

অতএব, উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়টি নিশ্চিত যে, ক্ষমতায় আরোহণের প্রথমদিকে ঈসা খান সরাইলের জমিদার ছিলেন না। এক্ষেত্রে সঠিক বক্তব্য হচ্ছে ঃ ঈসা খান বাংলায় কাররানী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা তাজ খান কাররানীর নিকট থেকে সর্বপ্রথম সোনারগাঁও কিংবা এর পার্শ্ববর্তী পরগনার জমিদারী লাভ করেছিলেন এবং এখান থেকেই তিনি কালক্রমে ক্ষমতা বিস্তার করে সমগ্র ভাটি অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এতদসংক্রান্ত অন্য কোন প্রামাণ্য দলিল মজুদ না থাকলেও আকবর নামায় আবুল ফযল, ঈসা খানের সাথে মুঘল বাহিনীর ১৫৭৫ , ১৫৭৮ ও ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে সংঘটিত যুদ্ধের যে বিবরণ প্রদান করেন তা সতর্কতার সাথে পাঠ করলেই ঈসা খান যে প্রথম থেকেই সোনারগাঁও কিংবা এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জমিদার ছিলেন সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। প্রথমত ঃ আবুল ফযল আকবর নামায় ঈসা খানের প্রথম যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেন মুঘল সুবাহ্দার মুনিম খানের মৃত্যুর পরে। মুনিম খান ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর তারিখে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ মাত্রই দায়ূদ খান

Dhaka University Institutional Repository

কারারানী কটকের চুক্তি ভঙ্গ করে মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। ঠিক একই সময়ে ঈসা খান মুঘল নৌ-সেনাপতি শাহ্‌ বর্দীকে আক্রমণ করে পরাস্ত করেন[৪৩]। এখানে যুদ্ধ ক্ষেত্রের উল্লেখ না থাকলেও ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দের ঘটনা দৃষ্টে মনে হয় এ যুদ্ধ ভাটি অঞ্চলের কোথাও তথা সোনারগাঁও কিংবা এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সংঘটিত হয় এবং ঈসা খান এ সময় এ অঞ্চলেরই জমিদার হয়ে থাকবেন। কেননা ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে সুবাহ্‌দার খান-ই-জাহানের ভাটি অভিযানের সময় দেখা যায় যে, তিনি প্রথমে ভাটি অঞ্চলের ভাওয়ালে শিবির স্থাপন করেন। এ ভাওয়াল থেকেই তিনি ঈসা খানের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন এবং পরে মজলিস দিলাওয়ার ও মজলিস প্রতাপের নিকট পরাজিত হয়ে মুঘল বাহিনী ভাওয়াল থেকেই[৪৪] ভাটি ত্যাগ করে তাঁড়ার নিকটবর্তী সিহহতপুরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। খান-ই - জাহান কর্তৃক প্রথমে ভাওয়ালে শিবির স্থাপন এবং ভাটি অভিযানে ব্যর্থ হয়ে ভাওয়াল থেকেই সিহহতপুর প্রত্যাবর্তনের ফলে প্রতীয়মান হয় যে, ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে মুঘল বাহিনীর পক্ষে ভাওয়াল অতিক্রম করে ভাটির আরো অভ্যন্তরে প্রবেশ করে শিবির স্থাপন করা কোন ক্রমেই নিরাপদ ছিল না। সুতরাং যেহেতু ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলায় আফগানদের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অবর্তমানে মুঘল বাহিনীর পক্ষে ভাওয়াল অতিক্রম করে ভাটির অরো অভ্যন্তরে ঘাঁটি স্থাপন করা সম্ভব হয়নি সেহেতু ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে তুকারায়ের যুদ্ধে বাংলার আফগান শাসক দায়ূদ খান কারারানীর পরাজয়ের অব্যবহিত পরে মুঘল বাহিনীর পক্ষে ভাওয়াল অতিক্রম করে ভাটির আরো অভ্যন্তরে নিরাপদে প্রবেশ কিংবা শিবির স্থাপন করা সম্ভব না হওয়ারই কথা। কেননা তুকারায়ের যুদ্ধে দায়ূদ খান পরাজিত হয়ে মুঘলদের সাথে কটকের চুক্তি সম্পাদন করলেও অন্যান্য আফগানরা এ চুক্তি প্রত্যাখান করে এবং আফগানরা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে বিহার, ঝাড়খন্ড, ঘোড়াঘাট, গৌড় ইত্যাদি অঞ্চলে মুঘলদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ সময় আফগানদের উপর দায়ূদের কোন কর্তৃত্ব ছিলনা। অন্যদিকে মুনিম খান যে উদ্দেশ্যে শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করেন, সে উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। এক কথায় বলা যায় দায়ূদ খান তুকারায়ের যুদ্ধে পরাজিত হলেও তখনও বাংলা কিংবা অন্যান্য স্থানের আফগানদের প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যায়নি কিংবা তখনও বাংলা এবং অন্যান্য স্থানে মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ছিল সম্পূর্ণরূপে সুদূর পরাহত। যাহোক, কটকের চুক্তির পরে প্রায় ছয়মাস বর্ষাকালে বাংলার নদী-নালা প্লাবিত হয় এবং এ সুযোগে আফগানরা মুঘলদেরকে জলে-স্থলে বাধা দিতে থকে। তখন পর্যন্ত মুঘল বাহিনী বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

নদী-নালার সাথে বিশেষ পরিচিত ছিল না, তাই তারা আফগানদেরকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়। এ সময় ঘোড়াঘাটে আফগানদেরকে দমন করার জন্য মুনিম খান রাজধানী তাঁড়া থেকে গৌড়ে সরিয়ে নেন। গৌড়ের আবহাওয়া তখন অত্যন্ত দূষিত ; এ দূষিত আবহাওয়ায় অনেক মুঘল সৈন্য অবস্থান করায় গৌড়ে মহামারী দেখা দেয় এবং অনেক মুঘল সৈন্য মহামারীর কবলে পতিত হয়। মুনিম খান এ অবস্থা দেখে আবার তাঁড়ায় ফিরে আসেন, কিন্তু ফিরে আসার মাত্র দশদিন পরে ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর মুনিম খানও মহামারীর কবলে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। মুনিম খানের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ মাত্রই দায়ূদ খানের সাথে এক যোগে ঈসা খানও মুঘলদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। একদিকে দায়ূদ খান ভদ্রকের মুঘল সেনাপতি নযর বাহাদুরকে হত্যা করায় জালেশ্বরের মুঘল সেনাপতি মুরাদ খান ভয়ে তাঁড়ায় পলায়ন করে এবং তাঁড়ার সকল মুঘল সৈন্য গৌড়ে পলায়ন করে। এ অবস্থায় আফগানরা তেলিয়াগড় গিরিপথ অবরোধ করে, যাতে মুঘলরা এ গিরিপথ অতিক্রম করতে না পারে। অন্যদিকে ঈসা খান মুঘল নৌ-সেনাপতি শাহ্ বর্দীকে পূর্ব বাংলার পানি-সীমা থেকে বিতাড়িত করেন। ফলে মুঘল বাহিনী বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে যায়, কেননা তারা বিহারের দিকে আশ্রয় নিতে পারেনা, আবার বাংলায়ও আফগানরা চতুর্দিকে ঘিরে ফেলে[৪৫]। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মুঘলরা দায়ূদ খানকে তুকারায়ের যুদ্ধে পরাজিত করতে সক্ষম হলেও তখনও বাংলার আবহাওয়া এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে মুঘলদের প্রতিকূলে ছিল। এরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে মুঘল বাহিনী ভাটির কতটুকু অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পেরেছিল তাও ভাবনার বিষয়। এতদসংক্রান্ত কোন প্রামাণ্য দলিলের অভাব সত্বেও ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে ভাওয়ালে মুঘল বাহিনীর অবস্থান দেখে ধারণা করা যায় যে, ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে মুঘল বাহিনীর পক্ষে ভাওয়াল অতিক্রম করে ভাটির আরো অভ্যন্তরে প্রবেশ কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না। এ অনুযায়ী বলা যায় ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে ঈসা খান অন্ততঃ ভাওয়াল কিংবা এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকেই শাহ্ বর্দীকে বিতাড়িত করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে ঈসা খানের পক্ষে ভাওয়াল অপেক্ষা ভাওয়ালের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল তথা সোনারগাঁও কিংবা এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে শাহ্ বর্দীকে বিতাড়নের সম্ভাবনাই ছিল অধিকতর বেশী। কেননা জানা যায় যে, শের শাহের শাসনামল থেকেই এমন কি আকবরের শাসনামলের অধিকাংশ সময়েও ভাওয়াল পরগনা ছিল ভাওয়ালের গাযী বংশীয়দের শাসনাধীন [৪৬]। সুতরাং ইহা ধারণা করা অযৌক্তিক হবে না যে, ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে ঈসা খান মুঘল নৌ-বাহিনীকে সোনারগাঁও কিংবা

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার
382736

Dhaka University Institutional Repository

এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকেই বিতাড়িত করেছিলেন। এতে প্রতীয়মান হয় ঈসা খান ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দ কিংবা এর পূর্ব থেকেই সোনারগাঁও কিংবা এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেরই জমিদার ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ আকবরনামায় আবুল ফযল মুঘল সুবাহদার খান -ই- জাহানের ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দের ভাটি অভিযানের যে বিবরণ দেন তা বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে যে ঈসা খান ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে সোনারগাঁও অঞ্চলেরই জমিদার ছিলেন। ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দের ভাটি অভিযান সম্পর্কে আবুল ফযল বলেন, "Ibrahim Naral and Karimdad Musazai waited for an opportunity of making a disturbance in the country of Bhati. Isa the zamindar of that country spent his time in dissimulation. ... When the town of Bhawal became the station of the army, Ibrahim Naral, Karimdad and other Afghans of that country brought forward propositions of obedience and used the language of harmony. Isa however sate in the ravine of disobedience, and was presumptuous. A large force was sent against him under Shah Bardi and Muhammad Quli ... a hot engagement took place on the borders of Kastal ? Isa was defeated and fled, ... Majlis Dilawar and Majlis Pratap, who were landholders in that part of the country, suddenly brought out a crowd of boats from the rivers and channels and kindled the flames of contention. The warriors of the victorious army lost courage and turned to flee, ... Tila Ghazi, a landholder, came and opened the hand of courage," [৩১]

আবুল ফযলের বিবরণ থেকে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী পাওয়া যায়ঃ

ক) ইব্রাহিম নারাল ও করিমদাদ মুসাজাই ভাটির দেশে গোলযোগ সৃষ্টির সুযোগ খুঁজছিলেন। ঐ দেশের(ভাটির) জমিদার ঈসা কপটতার সাথে সময় কাটাচ্ছিলেন।

খ) খান-ই-জাহান যখন ভাওয়ালে শিবির স্থাপন করেন তখন ইব্রাহিম নারাল, করিমদাদ এবং ঐ দেশের অন্যান্য আফগানরা আনুগত্য প্রকাশ করেন। তৎসত্ত্বেও ঈসা খান আনুগত্য প্রকাশ করেন নি এবং অবাধ্যই থেকে যান । তাই ঈসা খানের বিরুদ্ধে শাহ্ বর্দী ও মুহম্মদ কুলীর অধীনে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করা হয়।... কস্তুলের নিকট সংঘটিত যুদ্ধে ঈসা খান পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। ...

Dhaka University Institutional Repository

গ) হঠাৎ মজলিস দিলাওয়ার এবং মজলিস প্রতাপ নামক দেশের ঐ অংশের দু'জন ভূঞা (landholders) নিকটবর্তী নদী ও খাল থেকে অনেক নৌকা এনে বিদ্রোহের আগুন জেলে দেয়।

ঘ) বিজয়ী সেনাদলের যোদ্ধারা সাহস হারিয়ে ফেলে এবং পলায়ন করতে থাকে ...টিলা গাযী নামক একজন ভূঁঞা (landholder) মুঘল বাহিনীর প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করেন।

আবুল ফযলের বক্তব্যে দেখা যায় যে, তিনি ঈসা খান, মজলিস দিলাওয়ার, মজলিস প্রতাপ এবং টিলা গাযীকে জমিদার কিংবা ভূঁঞা হিসেবে উল্লেখ করলেও ইব্রাহিম নারাল ও করিমদাদ মুসাজাইকে শুধু মাত্র আফগান হিসেবেই উল্লেখ করেন। অন্যদিকে তিনি ঈসা খানকে ভাটির দেশের জমিদার হিসেবে উল্লেখ করলেও মজলিস দিলাওয়ার, মজলিস প্রতাপ এবং টিলা গাযীর জমিদারীর নাম উল্লেখ করেন নি। কিন্তু ভট্টশালী ও আবদুল করিম, ইব্রাহিম নারাল ও করিমদাদ মুসাজাইকে জমিদার হিসেবে উল্লেখ করেন এবং তাঁরা আরো মনে করেন যে, ঈসা খান সরাইল পরগনার, ইব্রাহিম নারাল সোনারগাঁও পরগনার, করিমদাদ মুসাজাই মহেশ্বরদী পরগনা, মজলিস দিলাওয়ার জোয়ানশাহী পরগনা, মজলিস প্রতাপ খালিয়াজুরী পরগনা এবং টিলা গাযী তালিপাবাদ পরগনার জমিদার ছিলেন।এ ক্ষেত্রে মজলিস দিলাওয়ার, মজলিস প্রতাপ এবং টিলা গাযীকে যথাক্রমে জোয়ানশাহী, খালিয়াজুরী ও তালিপাবাদের ভূঁঞা কিংবা জমিদার হিসেবে মেনে নিলেও ঈসা খানকে সরাইলের এবং ইব্রাহিম নারাল ও করিমদাদ মুসাজাইকে সোনারগাঁও ও মহেশ্বরদী পরগনার জমিদার হিসেবে মেনে নেয়া যায়না। কেননা যেহেতু আবুল ফযল ঈসা খানকে সরাইলের জমিদার হিসেবে উল্লেখ করেননি, এমনকি তাঁর বর্ণনায় সরাইলের কোন অস্তিত্বই আবিষ্কার করা যায়না এবং ইব্রাহিম নারাল ও করিমদাদ মুসাজাইকে জমিদার কিংবা ভূঁঞা হিসেবেই উল্লেখ করেননি, সেহেতু ঈসা খান সরাইলের এবং ইব্রাহিম নারাল ও করিমদাদ মুসাজাই সোনারগাঁও ও মহেশ্বরদী পরগনার জমিদার হতে পারেন না। অধিকন্তু আবুল ফযলের নিম্নোক্ত উক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঈসা খান সোনারগাঁও-মহেশ্বরদী অঞ্চলেরই জমিদার ছিলেন। তিনি বলেন, "Ibrahim Naral and Karimdad Musazai waited for an opportunity of making a disturbance in the country of Bhati. Isa the zamindar of

Dhaka University Institutional Repository

that country spent his time in dissimulation." সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ইব্রাহিম নারাল ও করিম দাদ মুসাজাই যে অঞ্চলে গোলযোগ সৃষ্টির সুযোগ খুঁজছিলেন স্পষ্টতঃ ঈসা খান সে অঞ্চলেরই জমিদার ছিলেন। অর্থাৎ ইব্রাহিম নারাল ও করিমদাদ মুসাজাই গোলযোগ সৃষ্টির সুযোগ খুঁজছিলেন ভাটির দেশে (in the country of Bhati) এবং ঈসা খানও ছিলেন ভাটির দেশের জমিদার (Isa the zamindar of that country)| খান-ই-জাহান ভাওয়ালে শিবির স্থাপন করার পর ইব্রাহিম নারাল ও করিমদাদ সহ অন্যান্য আফগানরা মুঘলদের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়ায় ভট্টশালী ও আবদুল করিম ধরে নেন যে, ইব্রাহিম নারাল ও করিমদাদ মুসাজাই ভাওয়ালের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল তথা সোনারগাঁও এবং মহেশ্বরদী পরগনার জমিদার ছিলেন।"[৮৮] কিন্তু আবুল ফযলের বক্তব্যে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় ইব্রাহিম নারাল ও করিমদাদ মুসাজাই, ঈসা খানের জমিদারীতে অবস্থান করেই গোলযোগ সৃষ্টির সুযোগ খুঁজছিলেন। সুতরাং এ অনুযায়ী ভাওয়ালের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল তথা সোনার গাঁও ও মহেশ্বরদী পরগনা ছিল ঈসা খানেরই জমিদারী। ইব্রাহিম নারাল ও করিমদাদ মুসাজাইয়ের নিজস্ব কোন জমিদারীই ছিলনা এবং তাঁরা ঈসা খানের জমিদারীতে অবস্থান করে ঈসা খানের ছত্রছায়ায়ই গোলযোগ সৃষ্টির সুযোগ খুঁজছিলেন। কিন্তু বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ খান-ই-জাহান ভাওয়ালে শিবির স্থাপন করায় তাঁরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মুঘলদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। তৎসত্ত্বেও ঈসা খান মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন নি, বরং মুঘলবাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। কিন্তু ঈসা খানের পরাজয়ের অব্যবহিত পরেই মজলিস দিলাওয়ার ও মজলিস প্রতাপের প্রচন্ড আক্রমণে মুঘল বাহিনী শোচনীয় ভাবে পরাজয় বরণ করে এবং পলায়নে বাধ্য হয়। মুঘল বাহিনীর এরূপ শোচনীয় পরাজয়ে ইব্রাহিম নারাল হতবিহ্বল হয়ে পড়েন এবং ঈসা খানের পক্ষ ত্যাগ করে মুঘল বাহিনীর নিকট বশ্যতা স্বীকারের পরিণামের কথা ভেবেই খান - ই- জাহানের নিকট মূল্যবান উপঢৌকন সহ তাঁর পুত্রকে প্রেরণ করেন এবং আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করেন"[৮৯]। যাহোক , ইহা ধারণা করা অমূলক হবে না যে, ইব্রাহিম নারাল ও করিমদাদ মুসাজাইয়ের নিজস্ব কোন জমিদারীই ছিল না, তাঁরা ঈসা খানের জমিদারীতে অবস্থান করে ও ঈসা খানের ছত্রছায়ায় থেকেই গোলযোগ সৃষ্টির সুযোগ খুঁজছিলেন এবং সোনারগাঁও ও মহেশ্বরদী পরগনাই ছিল ঈসা খানের জমিদারী। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঈসা খান যদি সোনারগাঁও ও মহেশ্বরদী পরগনার জমিদারই ছিলেন, তবে তাঁর সাথে মুঘল বাহিনীর সংঘর্ষ কস্তুল তথা জোয়ানশাহী পরগনায়

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল কেন? এর উত্তরে বলা যায় যে, ঈসা খান মুঘল বাহিনীর আগমনের সংবাদ শুনেই তাঁর জমিদারী থেকে পশ্চাদপসরণ করতে থাকেন। এ পশ্চাদপসরণ ছিল ঈসা খানের একটি রণ কৌশল । কেননা ঈসা খান সম্ভবতঃ ধারণা করেছিলেন যে, বিশাল মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে (যে বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন খান-ই- জাহানের মতো ব্যক্তি যিনি বাংলার শেষ কারারানী আফগান শাসক দায়ূদ খান কারারানীকে রাজমহলের যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন) যুদ্ধে সফলতা অর্জন করতে হলে সম্ভাব্য যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য তাঁকে এমন একটা কৌশলগত স্থান বেছে নেয়া উচিত, যে স্থান থেকে তিনি তাঁর সামরিক শক্তির প্রধান ভিত্তি নৌ-বহরের জন্য বাড়তি সুযোগ পেতে পারেন। এখানে উল্লেখ্য যে, নদী-নালায় পরিপূর্ণ বাংলায় বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় মুসলিম আমলে যুদ্ধ কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল নৌ-বহর। এ নৌ-বহরই ছিল ঈসা খান এবং তাঁর মিত্রদের সামরিক শক্তির প্রধান ভিত্তি। শুধু তাই নয় তিনি শক্তিশালী মুঘল বাহিনীর আক্রমণ থেকে নিজ জমিদারীকে নিরাপদ রাখার নিমিত্তে মুঘল বাহিনীর দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্য এবং সম্ভবতঃ তিনি মুঘল বাহিনীর সাথে স্থল যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চান নি। এ জন্যই তিনি মুঘল বাহিনীকে এমন এক স্থানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন যেখানে তাদের স্থল বা পদাতিক বাহিনী কোন কাজেই আসবেনা এবং নৌ-বাহিনীর দ্বারাই যুদ্ধ পরিচালনা করতে বাধ্য হবে। এ সকল দিক দিয়ে বিচার করলে কত্তুল ছিল ঐ ধরনেরই একটি কৌশলগত স্থান যেখানে স্থল-যুদ্ধ কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না এবং সেখানে নৌ-বহর ব্যতিরেকে যুদ্ধ ছিল এক কথায় অসম্ভব। কেননা জোয়ানশাহী পরগনার অন্তর্গত কত্তুল এমন এক স্থানে অবস্থিত যার চতুর্দিকে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে শুধু পানি আর পানি। এবং সেখানে একমাত্র তাদের পক্ষেই যুদ্ধে সাফলতা অর্জন সম্ভব যারা এ স্থানের সাথে সমধিক পরিচিত। এজন্যই ঈসা খান যুদ্ধস্থান হিসেবে কত্তুলকে বেছে নিয়েছিলেন। যাহোক, বাহ্যতঃ ঈসা খান মুঘল বাহিনীর সাথে যুদ্ধে পরাজিত হলেও পরিণামে তাঁর পক্ষীয় জমিদাররাই যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং মুঘল বাহিনী ভাটি অভিযানে ব্যর্থ হয়ে ভাটি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। তাই বলা যায় যে, ঈসা খানের এপশ্চাদপসরণ কৌশলের উদ্দেশ্য অনেকাংশেই সফল হয়েছিল।

তৃতীয়তঃ সোনারগাঁও অঞ্চল যে, দীর্ঘদিন থেকেই ঈসা খানের ক্ষমতার অন্যতম কেন্দ্রস্থল এবং বাসস্থান ছিল তা মুঘল সুবাহ্দার শাহ্বায খানের ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দের ভাটি অভিযান থেকেই সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়। ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দের যুদ্ধের বিবরণে আবুল ফযল বলেন ঃ "When the bank of the

Dhaka University Institutional Repository

river Ganges near Khizrpur became an imperial camp, there were strong forts on the two sides of the river... In a short time both of these were taken with severe fighting, and Sonargaon came into the possession of the imperial servants. They also reached Karabuh? Which was his (Isa's) home. That populous city was plundered".[৩০] আবুল ফযলের বিবরণে দেখা যায় যে, "মুঘল সৈন্যরা গঙ্গার তীরবর্তী খিযিরপুরের নিকটে শিবির স্থাপন করার পর ভীষণ যুদ্ধ করে অল্প সময়ের মধ্যেই নদীর দু'তীরে অবস্থিত দুর্গ দুটি অধিকার করে। এবং সোনারগাঁওও তাদের দখলে আসে । এমনকি তারা ঈসা খানের বাসস্থান কারাভু বা কতরাব পৌঁছে এবং এজনপূর্ণ শহরটিও বিধ্বস্ত করে।"

আবুল ফযল কর্তৃক উল্লিখিত খিযিরপুর, সোনারগাঁও, কারাভু বা কতরাব ইত্যাদি স্থান সমূহ সোনারগাঁও পরগনারই অন্তর্ভুক্ত এবং আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সন্দেহাতীত ভাবে এ স্থান গুলোর এবং লক্ষ্যা নদীর দু'তীরে অবস্থিত দুর্গ দু'টির ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করেছেন। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, আবুল ফযল স্পষ্টরূপে কারাভূ বা কতরাবকে ঈসা খানের বাসস্থান হিসেবে (Which was his (Isa's) home) বর্ণনা করেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত কতরাব শহরের অবস্থান নিয়ে পন্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ থাকলেও এক সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে কতরাব শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্বতীরে বর্তমান রূপগঞ্জ থানার মাসুমাবাদ গ্রামের সাথে অভিন্ন[৩১] । যাহোক , আবুল ফযল কতরাবকে ঈসা খানের বাসস্থান হিসেবে উল্লেখ করায় ধরে নেয়া যায় যে, কতরাব তখন ঈসা খানের রাজধানীও ছিল। সুতরাং একই অঞ্চলে ঈসা খানের বাসস্থান, রাজধানী ও দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক দুর্গের অবস্থান দেখে মনে হয় যে, দীর্ঘদিন থেকেই অর্থাৎ ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে শাহবায খানের ভাটি অভিযানের বহু পূর্ব থেকেই সোনারগাঁও অঞ্চল ঈসা খানের কর্মকান্ডের প্রধান কেন্দ্র স্থল ছিল। এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, ক্ষমতায় আরোহণের প্রথম দিকে ঈসা খান সোনারগাঁও এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেরই জমিদার ছিলেন। তবে আবদুল করিম মনে করেন যে, ঈসা খান ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই এ অঞ্চল দখল করেন[৩২]। এক্ষেত্রে তাঁর সাথে এক মত হওয়া যায় না। কেননা পূর্বের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্ব থেকেই ঈসা খান এ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন এবং এ অঞ্চলেই ঈসা খানের সাথে মুঘলদের প্রথম সংঘর্ষ হয় এবং এ অঞ্চল থেকেই ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে ঈসা খান মুঘল নৌ-সেনাপতি শাহ্ বর্দীকে বিতাড়িত করেছিলেন ।

Dhaka University Institutional Repository

উপরের আলোচনায় এ বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, ঈসা খান ক্ষমতায় আরোহণের প্রথম দিকে সরাইলের জমিদার ছিলেন না ; বরং প্রথম থেকেই তিনি সোনারগাঁও অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। এক কথায় বলা যায় ঃ বাংলায় কারারানী আফগান শাসনের প্রতিষ্ঠাতা তাজ খান কারারানীর নিকট থেকে ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে ঈসা খান সর্ব প্রথম সোনারগাঁও এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল তথা মহেশ্বরদী পরগনার ইকতা লাভ করেছিলেন। এখান থেকেই কালক্রমে ক্ষমতা বিস্তার করে ঈসা খান বার-ভূঁঞাদের অবিসংবাদিত নেতার মর্যাদায় উন্নীত হন।

তথ্যনির্দেশ

১। বি, পি, পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ ৩৭, পাদটীকা - ৮।

২। মোগল আমল, পৃঃ ৫৯ এবং The Afghans, পৃঃ ২২৫।

৩। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ১০৯৩-১০৯৪ এবং মোগল আমল, পৃঃ ১৫৪-১৫৫। এ সংঘর্ষে রাজা মানসিংহের পুত্র দূর্জন সিংহ মারা যায়।

৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৪০ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৫।

৫। তাজ খান কারারানী ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসন দখল করার পর মাত্র কয়েক মাস রাজত্ব করে ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন (সুলতানী আমল পৃঃ ৩৭১) । " In 1565, a few months after his conquest of Bengal, he died". (The Afghans, পৃঃ ১৭৩)।

৬। আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ৬৪৭-৬৪৮।

৭। The Afghans , পৃঃ ২২৫।

৮। ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দে শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জালাল খান ইসলাম শাহ্ উপাধি ধারণপূর্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইসলাম শাহ্ সিংহাসনে বসে তাঁর পিতার প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাতিল করে দেন, তিনি শামস্ আল-দীন মুহম্মদ শাহ্ সূর নামক তাঁর এক আত্মীয়কে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। শামস্ আল-দীন মুহম্মদ শাহ্ সূর ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে ছপ্পরঘাটা নামক স্থানে মুহম্মদ শাহ্ আদিলের সাথে সংঘটিত যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন (সুলতানী আমল, পৃঃ ৩৬৭-৩৬৮)।

Dhaka University Institutional Repository

৯। ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে তাজ খান কাররানী তৃতীয় গিয়াস আল- দীনকে পরাজিত ও হত্যা করে গৌড়ের সিংহাসন দখল করে নেন (The Afghans, পৃঃ ১৭২)।

১০। বি, পি, পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ ৩৬-৩৭।

১১। আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ৬৪৮।

১২। আইন ২য়, পৃঃ ১৩০।

১৩। মোগল আমল , পৃঃ ৬১।

১৪। ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দের ১২ই জুলাই রাজমহলের যুদ্ধে মুঘলদের নিকট দায়ূদ খান কাররানী পরাজিত ও নিহত হন (সুলতানী আমল, পৃঃ ৩৮৪)।

১৫। The Afghans, পৃঃ ২২৬।

১৬। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ২২৮।

১৭। যশোহর - খুলনার ইতিহাস ২য় খন্ড, প্রথম সংস্করণ ১৩২৯ বাংলা, পৃঃ

৩৬। পরবর্তীতে যশোহর - খুলনা হিসেবে উল্লেখিত।

১৮। ভট্টশালীর সুদীর্ঘ আলোচনার জন্য দেখুন বি, পি, পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ ২৬-৪৭, আবদুল করিমের সুদীর্ঘ বক্তব্যের জন্য দেখুন মোগল আমল, পৃঃ ৫৪-৭২ এবং এম, এ ,রহিমের বক্তব্যের জন্য দেখুন The Afghans, পৃঃ ২২৬।

১৯। ভট্টশালীঃ বি,পি,পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ ৩৭, এম,এ,রহিমঃ The Afghans, পৃঃ২২৫ এবং আবদুল করিমঃ মোগল আমল, পৃঃ ৬০।

২০। The Afghans,পৃঃ ২২৫।

২১। এম, এ, রহিম ঃ Chittagong Under The Pathan Rule in Bengal , Journal of the Asiatic Society, Letters, Vol. XVIII, No. 1, 1952., পৃঃ২১-৩০।

২২। ভারতবর্ষ- আশ্বিন- ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ - ১৭শ বর্ষ- ১মখন্ড-৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ৫৯৯-৬০০ এবং এম,এ, রহিমঃ প্রাগুক্ত।

২৩। মোগল আমল , পৃঃ ৬১।

২৪। The Afghans, পৃঃ ২২৬।

২৫। আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ২২৮।

২৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৭।

২৭। মোগল আমল, পৃঃ ১২১।

২৮। আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ৩৭৭।

২৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

৩০। ভট্টশালীর সুদীর্ঘ বক্তব্যের জন্য দেখুন বি,পি,পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ ৩৭-৪৭ এবং আবদুল করিমের বক্তব্যের জন্য দেখুন মোগল আমল, পৃঃ ৬১,৭২ ও ১২১।

৩১। বি,পি,পি, ভল্যুম ৩৮,পৃঃ ২৮ এবং ভারতবর্ষ - ভাদ্র - ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ১৭শ বর্ষ- ১ম খন্ড-৩য় সংখ্যা, পৃঃ ৩৭৭- এ উল্লেখ করেন যে, "এই দুই মজলিস সরাইল, খালিয়াজুড়ি ও জোয়ানশাহী অঞ্চলেই জমিদারী করিতেন বলিয়া মনে হইতেছে"।

৩২। শ্রীরাজমালা, আগরতলা, ২০শে চৈত্র ১৩১১ ত্রিপুরাব্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত কপি, ক্যাটালগ নং RB -954.15- SRI, পৃঃ ১৭৮-১৯১ (পরবর্তীতে রাজমালা হিসেবে উল্লিখিত)।

৩৩। কালী প্রসন্ন সেন সম্পাদিত শ্রীরাজমালা, তৃতীয় লহরের মধ্য মণি (টীকা) , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত কপি, ক্যাটালগ নং RB - 954.15- SRI, V, 3, পৃঃ ৯০ (পরবর্তীতে কালী প্রসন্ন সেন হিসেবে উল্লিখিত) । Saka 1499=1577 A.D, বি,পি,পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ ৪০। এ অনুযায়ী ১৫০০ শক = ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দ।

৩৪। কালী প্রসন্নসেন, পৃঃ ১৫২-১৫৫।

৩৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৫।

৩৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৩ ।

৩৭। আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ৬৪৮- ৬৫০।

৩৮। ডঃ এম, আবদুল কাদের ঃ "খিযরপুরের ঈশা খান" সোনারগাঁয়ের ইতিহাস উৎস ও উপাদান, (অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম ও ডঃ সৈকত আসগর সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ ১লা জুলাই ১৯৯৩), পৃঃ২৬৭। আকবরনামা পাঠে জানা যায় যে, সুবাহদার শাহবায খান ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দের ভাটি অভিযানের সময় বাজিতপুরের (Bajasrapur) দিকে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেছিলেন (আকবরনামা ৩য় ,পৃঃ ৬৫০)।

৩৯। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ৬৫০।

৪০। রাজমালা, পৃঃ ১৭৮-১৯২ এবং কালী প্রসন্ন সেন,পৃঃ ১১৩-১১৭।

৪১। কালী প্রসন্ন সেন, পৃঃ ৮৮-৯০।

৪২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩২-১৩৪।

৪৩। আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ২২৮।

৪৪। আবদুল করিম মনে করেন যে, খান-ই-জাহানের বাহিনী পরাজিত হয়ে ফিরে আসার সময় যে টিলা গাযী মুঘল বাহিনীকে সাহায্য করেছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তালিপাবাদের জমিদার। তাই ধরে নেয়া যায় যে, মুঘল বাহিনী যে পথে যায় সে পথেই ফিরে আসে (মোগল আমল, পৃঃ ১২০)। ভাওয়ালের নিকটবর্তী পরগনা গুলো হচ্ছে- তালিপাবাদ, সেলিম প্রতাপ, চাঁদ প্রতাপ এবং সুলতান প্রতাপ। এগুলো গাযী বংশীয়দের অধিকারে ছিল (বি, পি, পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ ৪৩-৪৪)। খান -ই - জাহানের সাথে ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদের যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ৩৭৬-৩৭৮। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

৪৫। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ২২৮ এবং সুলতানী আমল, পৃ ৩৮২।

৪৬। মোগল আমল, পৃঃ ৭৩-৭৪।

৪৭। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ৩৭৬-৩৭৭।

৪৮। বি, পি, পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ ৪৩-৪৪ এবং মোগল আমল, পৃঃ ১২১।

৪৯। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ৩৭৭-৩৭৮।

৫০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪৮-৬৪৯।

৫১। Habiba Khatun : "In Quest of Katrabo", Journal Asiatic Society of Bangladesh (Hum), Vol . XXX1, No. 2, December 1986, পৃঃ ৩৭-৪৯।

৫২। মোগল আমল, পৃঃ ১৪৩-১৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

স্বাধীন নৃপতি ঈসা খান ও তাঁর রাজ্য সীমা

ভাগ ১ - ভাটির স্বাধীন শাসক হিসেবে ঈসা খান ঃ

পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, ঈসা খান বাংলার কারারানী আফগান শাসকদের অধীনে ভাটি অঞ্চলে একজন সামন্ত হিসেবে তাঁর কর্মময় জীবন শুরু করেন। শুধু তাই নয়, কারারানী শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাঁদের প্রতি অনুগত ছিলেন। যাহোক, ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দের ১২ই জুলাই তারিখে রাজমহলের যুদ্ধে বাংলার শেষ কারারানী আফগান শাসক দায়ূদ খান কারারানী মুঘল বাদশাহ্ আকবরের সেনাপতি খান-ই-জাহানের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত হন। দায়ূদ খানকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়, ফলে বাংলায় আফগান শাসনেরও অবসান ঘটে।[১] কিন্তু ইহা সর্বজনবিদিত যে, রাজমহলের যুদ্ধে দায়ূদ খান কারারানীর পতনের ফলে বাংলায় স্বাধীন আফগান সালতানাতের যবনিকাপাত ঘটলেও তাৎক্ষণিক ভাবে মুঘলরা বাংলায় তাদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। কেননা ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, রাজমহলের যুদ্ধে দায়ূদ খানের পতন হলেও প্রায় সারা বাংলা মুঘলদের হাতছাড়া থেকে যায়। মুঘল শক্তি শুধু পশ্চিম ও পশ্চিম - উত্তর বাংলার কিছু অংশে সীমিত থাকে। রাজধানী তখনও মালদহ শহরের ১৫ মাইল দক্ষিণ - পূর্বে তাঁড়া (Tanda) শহরে অবস্থিত এবং মুঘল কর্তৃত্বও তাঁড়ার আশেপাশেই সীমিত ছিল। রাজমহলের যুদ্ধের পরবর্তী মুঘল অভিযানের কাহিনী পাঠ করলে বুঝা যায় যে, মুঘল কর্তৃত্ব তখন মালদহ-দিনাজপুর হয়ে উত্তরে ঘোড়াঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্বদিকে তাদের অধিকার করতোয়া নদীর দ্বারা সীমিত হয়, পাবনা জেলার পূর্ব অংশে মুঘলদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না[২]। আধুনিক ঐতিহাসিক ভট্টশালী ও আবদুল করিম সমসাময়িক কালের শিলালিপি ও মুদ্রা বিশ্লেষণ করে মতামত ব্যক্ত করেন যে, মুঘল বাদশাহ্ আকবরের জীবদ্দশায় সমগ্র বাংলায় মুঘল কর্তৃত্ব সু-প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি[৩]। কেবল মাত্র বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের শাসনামলে ১৬১২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই বাংলায় মুঘল কর্তৃত্ব সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছিল।

১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৬১২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এ মধ্যবর্তী ৩৬ বছর সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আফগান সেনা নায়ক, বিভিন্ন ভূঁঞা বা জমিদারদের কর্তৃত্ব ছিল। তাঁরা কখনও একক ভাবে আবার কখনও সম্মিলিত ভাবে মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করে স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন ভাবে দেশ শাসন করতেন। যেহেতু এ মধ্যবর্তী ৩৬ বছর সময়ে দেশে কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ছিলনা সেহেতু আবদুল করিম এ আমল কে "ভূঁঞাদের আমল" হিসেবে অভিহিত করেন[৪]।

ভূঁঞাদের মধ্যে বার-ভূঁঞারাই গৌরবময় ভূমিকা পালন করেন[৫]। বার-ভূঁঞারা স্বাধীনতার জন্য মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, যাঁরা যুদ্ধ করেনি, তাঁরা বার - ভূঁঞা হিসেবে পরিচিত হওয়ার উপযুক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে আবুল ফযল ও মিরযা নাথন এ ধারণাই দেন যে, বার- ভূঁঞারাই ছিলেন মুঘল বিজয়ের প্রধান প্রতিবন্ধক এবং সে কারণে মুঘল সুবাহ্দারেরা বার-ভূঁঞাদের দমনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন[৬]। ভাটিতেই বার-ভূঁঞার অভ্যুদয়[৭], এ ভূঁঞারা সংখ্যায় বারজন ছিলেন বলেই তাঁরা ইতিহাসে বার-ভূঁঞা নামে পরিচিত[৮]। এই ভাটির স্বাধীনচেতা বার - ভূঁঞাই আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মুঘল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। বাদশাহ্ আকবর ভাটির বার- ভূঁঞাদেরকে দমনের জন্য খান - ই- জাহান, শাহ্বায খান এবং মানসিংহ সহ অন্যান্য অনেক যোগ্য ও বিখ্যাত সেনানায়ক প্রেরণ করেন। পক্ষান্তরে বার-ভূঁঞাগণও তাঁদের নেতা ঈসা খানের নেতৃত্বে মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষায় প্রবৃত্ত হন। বাদশাহ্ আকবরের শাসনামলে বাংলায় মুঘল অভিযানের কাহিনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ সময় ভাটি অঞ্চলে তথা পূর্ববাংলায় মুঘল সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে এখানকার ভূঁঞা-জমিদারগণ যে প্রতিরোধ সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিল সে প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রধান নায়ক ছিলেন ঈসা খান। এক কথায় বলা যায় ঈসা খান ছিলেন মুঘল - বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত বার- ভূঁঞাদের অবিসংবাদিত নেতা। মুঘল ঐতিহাসিক আবুল ফযল এবং আধুনিক ঐতিহাসিক ভট্টশালী ও আবুদল করিমের বক্তব্য থেকে এর সত্যতা নিরূপণ করা যায়। আবুল ফযল বলেন, "Isa acquired fame by his ripe judgment and deliberateness , and made the twelve zamindars of Bengal subject to himself,"[৯]. ভট্টশালী বলেন, "Isa Khan was undoubtedly the most powerful Bhuiyan of Bengal and the backbone of the struggle for independence."[১০] এবং আবদুল করিম বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

"Isa Khan was the chief of the Bara- Bhuiyans. He resisted the Mughal aggression in the reign of Akbar and did not submit to the Mughals till his death in 1599 A.D."[১১]

উপরোক্ত ঐতিহাসিকদের বক্তব্য থেকে ঈসা খান সম্পর্কে যে সত্যগুলো সন্দেহাতীত ভাবে প্রকাশিত হয় সেগুলো হচ্ছে, ঈসা খান ছিলেন বাংলার ভূঁঞাদের মধ্যে অধিকতম ক্ষমতাশালী, বার-ভূঁঞাদের নেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান প্রতিভূ এবং তিনি বাদশাহ্ আকবরের শাসনামলে মুঘল আগ্রাসন প্রতিহত করেন ও ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যু পর্যন্ত মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন নি। অতএব উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে দায়ূদ খান কারারানীর পরাজয়ের ফলে ঈসা খানের পৃষ্ঠপোষক পরিবারের পতন হলেও তিনি মুঘলদের আনুগত্য স্বীকার করেন নি, বরং রাজমহলের যুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকেই মুঘল বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান সংগঠক এবং বার - ভূঁঞার প্রধান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং আমৃত্যু স্বাধীনতা রক্ষার্থে মুঘলদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু কতিপয় লেখক যেমন কেদারনাথ মজুমদার,[১২] নিখিল নাথ রায়,[১৩] স্বরূপ চন্দ্র রায় প্রমুখ মতামত ব্যক্ত করেন যে, মানসিংহের সাথে যুদ্ধের পর ঈসা খান বাদশাহ্ আকবরের রাজধানীতে গিয়ে আকবরের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন এবং ২২ পরগনার জমিদারী ও মসনদ-আলী উপাধি লাভ করেন। এভাবে অনেক লেখকই ঈসা খানের বিস্ময়কর রাজনৈতিক কৌশল ও জীবনভর স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্যাদা অনেকাংশেই ক্ষুণ্ন করেন। অথচ একমাত্র সমসাময়িক ঐতিহাসিক আবুল ফযলের আইন-ই - আকবরী ও আকবরনামা এমনকি অন্যকোন প্রামাণ্য ঐতিহাসিক দলিল এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি যার দ্বারা ঈসা খান সম্পর্কিত উক্ত লেখকদের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করা সম্ভব । বরং ঈসা খান যে, একজন কূটকৌশলী রাজনীতিক ও একজন স্বাধীন নৃপতি হিসেবে ভাটি অঞ্চল শাসন করতেন এবং প্রকৃত পক্ষে কোন দিনই মুঘলদের নিকট তাঁর স্বাধীন মস্তক অবনত করেননি তা নিম্নোক্ত ঐতিহাসিকদের বক্তব্য থেকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম হেনরী বেভেরীজের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য তিনি বলেন "...we are told more than once of his making submission and sending presents. But he was never really subdued, and his swamps and creeks enabled him to preserve his independence as effectually as the Aravalli Hills protected Rana Pratap of

Dhaka University Institutional Repository

Udaipur."[১৫] অর্থাৎ (আকবর নামার তৃতীয় খন্ডে) ঈসা খানের বশ্যতা স্বীকার ও উপঢৌকন প্রেরণের কথা একাধিকবার উল্লেখ করলেও বস্তুত তিনি কখনও দমিত হননি, বরং আরাবল্লী পর্বত মালা যেমনি উদয়পুরের রাণা প্রতাপকে আশ্রয় প্রদান করেছিল তেমনি ঈসা খানকে (তাঁর দেশের) বিল এবং নদী-নালা তাঁর স্বাধীনতা সংরক্ষণে তাঁকে সক্ষম করেছিল। আইন-ই- আকবরীতে আবুল ফযল বলেন , "এদেশের (বাংলার) "ভাটি" নামে পরিচিত পূর্বাঞ্চল এ প্রদেশের অন্তর্গত বলিয়াই পরিগণিত। ইহা ঈসা আফগানের (ঈসা খান) শাসনাধীন এবং তাঁর বর্তমান বাদশাহ্/ সুলতানের নামেই খুৎবা পাঠ ও মুদ্রাংকন করা হয়।... ইহার (ভাটির) সংলগ্ন এক বিস্তৃত অঞ্চলে তিপ্রা জাতির বাস। রাজার নাম বিজয় মাণিক্য"[১৭]। আবুল ফযলের এ উক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঈসা খান ভাটি অঞ্চলের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। পূর্বের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, ঈসা খান সুলায়মান খান কাররানীর প্রতিনিধি হিসেবেই ভাটি অঞ্চল শাসন করতেন। কিন্তু ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে দায়ূদ খান কারারানীর পরাজয়ের ফলে ঈসা খানের পৃষ্ঠপোষক পরিবারের পতন ঘটায় এবং নতুন করে মুঘল বাদশাহ্ আকবরের অধীনতা স্বীকার না করায় কার্যতঃ তিনি ভাটি অঞ্চলে স্বাধীন নৃপতি হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেন। যাহোক, আবুল ফযল এখানে ঈসা খানের নাম উল্লেখের সাথে সাথে ত্রিপুরার স্বাধীন রাজা বিজয় মাণিক্যের নাম উল্লেখ করায় ঈসা খানের মর্যাদার স্বরূপও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আকবর নামায় আবুল ফযল আরো বলেন যে, "Out of foresight and cautiousness he refrained from waiting upon the rulers of Bengal, though he rendered service to them and sent them presents. From a distance he made use of submissive language."[১৬] আবুল ফযলের এ বক্তব্য থেকেও ঈসা খানের মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। ঈসা খান বাংলার শাসকদের খেদমত করতেন এবং তাঁদের নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করতেন, কিন্তু দূরদর্শিতা ও সতর্কতাহেতু তাঁদের সাথে সাক্ষাত করতেন না। শুধু দূর থেকে আনুগত্যের ভাষা ব্যবহার করতেন। এতে বুঝা যায় যে, ঈসা খান বাংলার কাররানী শাসকদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলেও কৌশলে তিনি স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতেন। এ ধরনের আচরণ তাঁর বিস্ময়কর রাজনৈতিক কৌশল ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয়ই বহন করে।

১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ পরিব্রাজক রাল্‌ফ্ ফিচ্ ঈসা খান সম্পর্কে বলেন, "They be all hereabouts rebels against their King Zebaldin Echebar (Jalalud-din

Dhaka University Institutional Repository

Akbar). For there are so many rivers and islands that they flee from one to another, whereby his horsemen cannot prevail against them ... the chief king of all these countries is called Isa can (Isa Khan), and he is chief of all other Kings."[৩৭] অর্থাৎ এখানকার সকলেই তাঁদের বাদশাহ্ (their king) আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। এখানে অসংখ্য নদী ও দ্বীপ থাকার কারণে তাঁরা একটা থেকে অন্যটায় পলায়ন করে, ফলে আকবরের অশ্বারোহী সৈন্যরা তাদের বিরুদ্ধে সফল হতে পারেনা... এ সকল দেশের প্রধান রাজার নাম ঈসা খান এবং তিনি অন্যান্য সকল রাজার রাজা। রাল্ফ্ ফিচের এ বক্তব্য থেকে ঈসা খানের মর্যাদা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঈসা খানকে রাজার রাজা (chief of all other kings) হিসেবে অভিহিত করেন। এ থেকেই ঈসা খানের স্বাধীনচেতা মনোভাব, প্রভুত্ব, প্রতাপ ও প্রাধান্যের ঐতিহাসিক প্রমাণ লাভ করা যায়।

সর্বপোরি আধুনিক ঐতিহাসিক ভট্টশালী ও আবদুল করিমের বক্তব্য থেকে ঈসা খানের স্বাধীনতার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভট্টশালী বলেন, " But like his illustrious predecessor Sulaiman Karrani, Isa was a very cautious man". এবং "Like Sulaiman Karrani , Isa did not think it wise to assume complete independence, but he was no whit a more dependent ruler than Sulaiman Karrani was."[৩৮] আবদুল করিম বলেন, Isa Khan may be compared with Sulaiman Karrani who was completely independent but did not formally declare independence, nor did he issue independent coinage. Isa Khan also did not declare independence, nor did he issue coins, though he was for all practical purposes independent." [৩৯] ভট্টশালী ও আবদুল করিমের বক্তব্যে দেখা যায় যে, তাঁরা ঈসা খানকে বাংলার স্বাধীন কারারানী আফগান শাসক সুলায়মান খান কারারানীর সাথে তুলনা করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, সুলায়মান খান কারারানী কার্যতঃ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও মুঘল বাদশাহ্ আকবরের রোষানল থেকে স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষার্থে কোনরূপ মুদ্রা প্রচার কিংবা কোনরূপ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন রাজচিহ্নাদি ব্যবহার করেননি। অনুরূপভাবে ঈসা খানও সুলায়মান খান কারারানীর পদাংক অনুসরণ করেন এবং কার্যতঃ স্বীয় কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে সর্ব বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মুঘল বাদশাহ্ আববরের তুলনায় নিজের সীমিত অস্ত্রবল, সৈন্যবল এবং ক্ষুদ্র ভূখন্ডের কথা চিন্তা করে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। তাই এ ক্ষেত্রে ঈসা খানকে

Dhaka University Institutional Repository

সুলায়মান খান কাররানীর মতোই একজন ধীর-স্থির, দূরদর্শি এবং সময়োপযোগী বাস্তব-জ্ঞান সম্পন্ন শাসক হিসেবে অভিহিত করা যায়।

যাহোক , উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে বাংলার শেষ স্বাধীন কাররানী আফগান শাসক দায়ূদ খান কাররানীর পতনের পর থেকেই ঈসা খান মুঘল কর্তৃত্ব অস্বীকার করে ভাটি অঞ্চলে তথা পূর্ববাংলায় স্বাধীনতার ধ্বজা উত্তোলন করেন এবং একজন স্বাধীন নৃপতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি কখনই মুঘলদের নিকট তাঁর স্বাধীন মস্তক অবনত করেন নি এবং আমৃত্যু স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত থেকে ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীন ভাবেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ভাগ ২ - ঈসা খানের রাজ্যের বিস্তৃতি ঃ

ইহা সর্বজনবিদিত যে, ঈসা খান তাঁর পূর্ণ ক্ষমতার সময় একটি বিস্তৃত অঞ্চলের সর্বময় কর্তা ছিলেন। তবে তিনি ক্ষমতায় আরোহণের প্রথম দিকে বিস্তৃত অঞ্চলের অধিকারী ছিলেন না। পূর্বের আলোচনায় দেখা যায় যে, ঈসা খান বাংলায় কাররানী শাসনের প্রতিষ্ঠাতা তাজ খানের নিকট থেকে প্রথমে সোনারগাঁও এবং মহেশ্বরদী পরগনার ইকতা লাভ করেন।এ ইকতা থেকেই কালক্রমে ক্ষমতা বিস্তার করে তিনি এক বিস্তৃত অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এক কথায় বলা যায় ঈসা খান স্বীয় বিচক্ষণতা ও প্রতিভা বলে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে বিস্তৃত অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সোনারগাঁও ও মহেশ্বরদী পরগনার ইকতাকেই রাজ্যে পরিণত করেন। এখানে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে স্মরণীয় যে, তাঁর এ রাজ্য সীমা সব সময় স্থিতিশীল ছিলনা। কেননা মুঘলদের বিরুদ্ধে ঈসা খানের যুদ্ধের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, ঈসা খান কখনও মুঘলদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করেছিলেন আবার কখনও নিজেই কৌশলগত কারণে অগ্রবর্তী অবস্থান থেকে পিছনে সরে এসেছেন। ফলে তাঁর রাজ্য সীমা স্থিতিশীল ছিলনা। যাহোক, ঈসা খানের রাজ্যের প্রকৃত আয়তন কিংবা সীমা নির্ণয় করা বর্তমানে অনেকটা দূরহ হয়ে পড়েছে। কেননা এতদ সংক্রান্ত কোন প্রামাণ্য দলিল অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। তবে মুঘল ঐতিহাসিক আবুল ফযল প্রদত্ত ভাটির বিবরণ

Dhaka University Institutional Repository

(যেহেতু আবুল ফযল ঈসা খানকে ভাটির শাসক হিসেবে অভিহিত করেছেন),দেশে প্রচলিত কিংবদন্তী এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকদের বক্তব্যের সাথে আকবরনামায় বর্ণিত মুঘলদের বিরুদ্ধে ঈসা খানের যুদ্ধের বিবরণ মিলিয়ে পাঠ করলে তাঁর রাজ্য সীমা সম্পর্কে একটা যুক্তি সংগত ধারণা পাওয়া সম্ভব ।

ক) আবুল ফযল আকবরনামা ও আইন - ই- আকবরী সর্বত্রই ঈসা খানকে ভাটির শাসক বা জমিদার হিসেবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আকবরনামায় তিনি ভাটির যে বিবরণ দেন তা আধুনিক ঐতিহাসিকদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি। তবে আইন- ই- আকবরীতে আবুল ফযল কর্তৃক প্রদত্ত নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে ঈসা খান শাসিত ভাটি সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে। তিনি বলেন "The tract of country on the east called Bhati, is reckoned a part of this province . It is ruled by Isa Afghan…Adjoining it, is an extensive tract of country inhabited by the Tipperah tribes"[২০] অর্থাৎ বাংলার পূর্বাঞ্চল ভাটি নামে পরিচিত, ঈসা খান ভাটির শাসক এবং ভাটির সংলগ্ন বিস্তৃত অঞ্চলে তিপ্রা জাতির বাস।আবুল ফযলের এ বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে ভট্টশালী মত প্রকাশ করেন যে, আবুল ফযল ভাটি বলতে এখানে ঢাকা - ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্বাংশ এবং ত্রিপুরা - সিলেটের পশ্চিমাংশ নিয়ে গঠিত অঞ্চলকেই বুঝিয়েছেন[২১]। কিন্তু যুক্তি সংগত কারণেই ভট্টশালীর সাথে একমত হওয়া যায় না এবং এক্ষেত্রে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাংশকে ভাটির অন্তর্ভুক্ত হিসেবে ধরে নিলেও ত্রিপুরা জেলা কিংবা এর অংশ বিশেষকে ভাটির অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করা যায়না। কেননা আবুল ফযল এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, ভাটির সংলগ্ন বিস্তৃত ভূখন্ডই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্য ভাটির পূর্ব সীমায় অবস্থিত। যেহেতু ত্রিপুরা জেলা ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সেহেতু ত্রিপুরা জেলা কিংবা এর অংশ বিশেষ ভাটির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। অন্যদিকে যদিও ভাটি বলতে নিম্ন অঞ্চল কেই বুঝায় তবুও সিলেট-ত্রিপুরা জেলা কিংবা এর অংশ বিশেষ ভাটির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। কেননা আবুল ফযল ঈসা খান কে যে ভাটির শাসক হিসেবে অভিহিত করেছেন সিলেট ও ত্রিপুরা জেলার নিম্নাঞ্চল সে ভাটির অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। মুঘল সুবাহ্দার খান-ই- জাহান ও শাহ্বায খানের ১৫৭৮ ও ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দের ভাটি

Dhaka University Institutional Repository

অভিযান সম্পর্কে আকবর নামায় আবুল ফযল মুঘল বাহিনীর সাথে ঈসা খানের যুদ্ধের যে বিবরণ দিয়েছেন তা বিশ্লেষণ করলেই এর সত্যতা যাচাই সম্ভব[২২]। আকবর নামা পাঠে জানা যায় যে, ১৫৭৮ ও ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে ঈসা খানের সাথে মুঘল বাহিনীর এ যুদ্ধ শুধু মাত্র ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় সীমাবদ্ধ ছিল। ত্রিপুরা কিংবা সিলেট জেলায় মুঘলদের সাথে ঈসা খানের কোন যুদ্ধই হয়নি। সুতরাং ইহা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, সিলেট ও ত্রিপুরা জেলার পশ্চিমাংশ ঈসা খানের রাজ্যভুক্ত ছিল না এবং সংগত কারণেই সিলেট ও ত্রিপুরা জেলার পশ্চিমাংশ আবুল ফযল নির্দেশিত ভাটির অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা নয়। দ্বিতীয়তঃ W.W. Hunter তাঁর A Statistical Account of Bengal - Vol. - VI - গ্রন্থে ত্রিপুরা জেলার সীমা নির্দেশ করতে গিয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, "Tipperah is bounded ... on the west by the river Meghna, which separates it from the districts of Maimansingh, Dacca and Bakarganj..."[২৩] হান্টারের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মেঘনা নদী ত্রিপুরা জেলা তথা ত্রিপুরা রাজ্য এবং ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার মধ্যে প্রাকৃতিক সীমারেখা নির্দেশ করছে। এক কথায় বলা যায় মেঘনা নদী ত্রিপুরা রাজ্য ও বাংলার মধ্যে প্রাকৃতিক সীমারেখা হিসেবে বিদ্যমান। যেহেতু আবুল ফযলের বক্তব্য অনুযায়ী সুবাহ্ বাংলার পূর্বাঞ্চলই হচ্ছে ভাটি এবং হান্টারের বক্তব্য অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিম সীমা হচ্ছে মেঘনা নদী সেহেতু ভাটির পূর্ব-সীমায় অবস্থিত মেঘনা নদীর পূর্ব পারে অবস্থিত ত্রিপুরা জেলা কিংবা এর অংশ বিশেষ আবুল ফযল নির্দেশিত ভাটির অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনা। তৃতীয়তঃ এখানে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, এ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য ভাটির প্রকৃত আয়তন কিংবা ভাটির অর্থ নিরূপণ করা নয় বরং আবুল ফযল নির্দেশিত ঈসা খান কর্তৃক শাসিত ভাটির অবস্থান নির্ণয় করা। এক কথায় বলা যায় আবুল ফযল ঈসা খানকে ভাটির শাসক হিসেবে অভিহিত করে এখানে ভাটি বলতে কোন অঞ্চলকে নির্দেশ করেছেন তা নির্ণয় করাই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আবুল ফযলের বক্তব্য অনুযায়ী সুবাহ্ বাংলার পূর্বাঞ্চলই হচ্ছে ভাটি এবং ভাটির সংলগ্ন তথা পুর্বদিকে আবস্থিত বিস্তৃত অঞ্চলেই তিপ্রা জাতির বাস তথা ত্রিপুরা রাজ্য অবস্থিত। এ হিসেবে ভাটির পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্য এবং ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিমে ভাটি অবস্থিত। অন্যদিকে হান্টারের বক্তব্য অনুযায়ী ত্রিপুরা জেলা তথা ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিম সীমা হচ্ছে মেঘনা

Dhaka University Institutional Repository

নদী। মেঘনা নদীর পশ্চিম পারেই ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার অবস্থান। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাই ভাটি। আধুনিক ঐতিহাসিক আবদুল করিম তাঁর বাংলার ইতিহাসঃ মোগল আমল - প্রথম খন্ডে ভাটির পরিচয় দিতে গিয়ে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকে বার-ভূঁঞা শাসিত অঞ্চল ভাটির অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করেছেন।[২৪] যাহোক, সঠিক বক্তব্য হচ্ছে এই যে, সিলেট - ত্রিপুরা জেলার পশ্চিমাংশ আবুল ফযল নির্দেশিত ভাটির অন্তর্ভুক্ত নয় এবং আবুল ফযল এ ক্ষেত্রে ভাটি বলতে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাংশকেই বুঝিয়েছেন। ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে ও ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে মুঘলদের ভাটি অভিযানের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে এ সময় ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাংশ যে, ঈসা খানের রাজ্যভুক্ত ছিল সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে খান-ই-জাহান এবং ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে শাহবায খানের সাথে ঈসা খানের যুদ্ধের ভৌগোলিক পরিমন্ডল প্রায় একই ছিল। ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে যুদ্ধ ক্ষেত্র ছিল জোয়ানশাহী পরগনার অন্তর্ভুক্ত অষ্টগ্রামের নিকটবর্তী কাইথাল বা কত্তুল এবং ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে যুদ্ধ ক্ষেত্র ছিল খিযিরপুর, সোনারগাঁও, কতরাব, টোক, এগার সিন্দুর ও বাজিতপুর। উপরোক্ত স্থান গুলো লক্ষ্যা, বানার, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর গতিপথে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাংশে অবস্থিত। এক কথায় বলা যায় ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে ঈসা খান সোনারগাঁও থেকে এগার সিন্দুর পর্যন্ত এবং এগার সিন্দুর থেকে জোয়ানশাহী ও খালিয়াজুরী পরগনা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অধিকারী ছিলেন। এ সময় ঈসা খানের রাজধানী ছিল কতরাবতে, শুধু তাই নয় এ সময় কুচবিহার আক্রমণ করার মতো শক্তি ও সামর্থ্য ঈসা খানের ছিল[২৫]।

খ) দেশে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুযায়ী ঈসা খান ২২ পরগনার মালিক ছিলেন। জেমস্ ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনী থেকে জানা যায় বাদশাহ আকবর ঈসা খানকে অনেক পরগনা দান করেন[২৬]। প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা সপ্তম খন্ডে দেওয়ান ঈশা খাঁর পালায় বলা হয় যে, বাদশাহ আকবর দশ হাজার টাকা খাজনার বিনিময়ে ঈসা খানকে ২২ পরগনার জমিদারী প্রদান করেন[২৭]। কিন্তু আকবরনামা পাঠে জানা যায় ঈসা খান কখনও আকবরের দরবারে যান নি[২৮]। এমনকি আকবর কর্তৃক ঈসা খানকে ২২ পরগনা প্রদান কিংবা কোন অঞ্চলের জমিদারী প্রদান

Dhaka University Institutional Repository

সংক্রান্ত কোনরূপ পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষ ইংগিত আইন-ই-আকবরী ও আকবর নামায় পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, পূর্বের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, ঈসা খান আমৃত্যু বাদশাহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেননি, বরং তিনি ছিলেন মুঘলদের চরম শত্রু এবং বাংলায় বিশেষ করে ভাটি অঞ্চলে তথা পূর্ব বাংলায় মুঘল সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক। সুতরাং বাদশাহ আকবর কর্তৃক ঈসা খানকে ২২ পরগনার জমিদারী প্রদানের কথিত ঘটনা ঐতিহাসিক সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না। তবে ঈসা খান ২২ পরগনার মালিক ছিলেন বলে যে কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে সে বিষয়ে কোনরূপ প্রামাণ্য দলিলের অভাব সত্ত্বেও মুঘলদের সাথে ঈসা খানের যুদ্ধের যে বিবরণ আকবর নামায় পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, যুদ্ধ ক্ষেত্র ভাটি অঞ্চলে তথা নদী-নালা বেষ্টিত পূর্ব বাংলায় বিস্তৃত ছিল এবং ঈসা খান যে ২২ পরগনার জমিদারী লাভ করেছিলেন বলে কথিত হয়েছে সেগুলোও মোটামুটি ভাটি তথা পূর্ব বাংলাতেই অবস্থিত । এক কথায় বলা যায় মোটামুটি এ ২২ পরগনার মধ্যেই মুঘলদের সাথে ঈসা খানের অধিকাংশ সংঘর্ষ সংঘটিত হয় এবং ঈসা খানের কর্মকান্ডের অধিকাংশই এ ২২ পরগনার মধ্যেই ছিল। যাহোক , এ ২২ পরগনার দ্বারা ঈসা খানের রাজ্যের প্রকৃত আয়তন ও সীমা নির্ধারণ করা না গেলেও এ গুলোর দ্বারা ঈসা খানের রাজ্য সম্পর্কে একটি নিকটবর্তী ধারণা পাওয়া সম্ভব।

কেদারনাথ মজুমদার রচিত ময়মনসিংহের ইতিহাস, Mymensingh District Gazetteer. এবং প্রাচীন পূর্ব বঙ্গ গীতিকা সপ্তম খন্ডের দেওয়ান ইশা খাঁর পালা এ তিনটি সূত্রে ২২ পরগনার তিনটি ভিন্ন - ভিন্ন তালিকা পাওয়া যায়। এ তিনটি তালিকা নিম্নে পাশাপাশি প্রদান করা হলঃ

ময়মনসিংহের ইতিহাস[২৯]	**গেজেটিয়ার**[৩০]	**ইশাখাঁর পালা**[৩১]
১। আলেপ সাহি	১।আলেপ সিংহ	১। আলাপ সিং
২। মমিন সাহি	২। মাইমেনসিংহ	২। মইমন সিং
৩। হুসেন সাহি	৩। হোসেন শাহী	৩। হুসেনসাহী
৪। বড় বাজু	৪। বড় বাজু	
৫। মেরাউনা		
৬। হেরানা		

Dhaka University Institutional Repository

৭। খরানা		
৮। সেরালি		
৯। ভাওয়াল বাজু	৫। ভাওয়াল	৪। ভাওয়াল
১০। দশকাহনিয়া বাজু		
১১। সায়র জলকর		
১২। সিংধামৈন	৬। সিংধা	৫। সিংধা
১৩।সিং নছরত ওজিয়েল	৭। নাসির উজিয়াল	৬। নছিরুজ্যাল
১৪। দরজি বাজু	৮। দরজীবাজু	৭। দরজিবাজু
১৫। হাজরাদি	৯। হাজরাদি	৮। হাজারদী
১৬। জফর সাহি	১০। জাফর শাহী	৯। জোয়ারসাহী
১৭। বলদা খাল	১১। বরদাখাত ও বরদাখাতমগরা	১০। বরদাখাত
১৮। সোনার গাঁ	১২। সোনার গাঁও	১১। বরদাখাতমনরা
১৯। মহেশ্বরদি	১৩। মহেশ্বরদী	১২। স্বর্ণগেরাম
২০। পাইটকাড়া	১৪।পাইট কারা	১৩। মহেশ্বরদী
২১। কাটরাব্	১৫। কতরাব ও কুড়িখাই	১৪। পাইট্কাড়া
২২। গঙ্গামন্ডল	১৬। গঙ্গামন্ডল	১৫। কাটড়াব
	১৭। কাগমারী	১৬। গঙ্গামন্ডল
	১৮। আতিয়া	১৭। সেরপুর
	১৯।শেরপুর	১৮। খাইল্যাজুড়ি
	২০।খালিয়াজুরী	১৯। জোয়ার হুসেনপুর
	২১। জোয়ার হোসেনপুর	২০। জোয়ানসাহী
	২২। জোয়ান শাহী	২১। কুড়ি খাই

উপরোক্ত তিনটি তালিকার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই পারস্পরিক মিলের অভাব রয়েছে এবং তালিকা গুলোর মধ্যে কতিপয় অসঙ্গতিও পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকায় ২২টি পরগনার নাম রয়েছে কিন্তু তৃতীয় তালিকায় নাম রয়েছে ২১ টি অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকার তুলনায় তৃতীয় তালিকায় ১টি পরগনা কম রয়েছে। দ্বিতীয়ত ঃ মেরাউনা, হেরানা, খরানা ও সেরালি এ চারটি পরগনার নাম শুধু প্রথম তালিকায় রয়েছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকায় এ পরগনা গুলোর নাম নেই। তৃতীয়তঃ প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকায়

Dhaka University Institutional Repository

বড়বাজু পরগনার নাম থাকলেও তৃতীয় তালিকায় নেই।চতুর্থতঃ আতিয়া ও কাগমারী পরগনার নাম শুধু দ্বিতীয় তালিকায় রয়েছে কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় তালিকায় এ পরগনা দ্বয়ের নাম নেই। পঞ্চমতঃ শেরপুর পরগনার নাম দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকায় থাকলেও প্রথম তালিকায় নেই। ষষ্ঠতঃ শুধু মাত্র প্রথম তালিকায় সায়র জলকরের নাম রয়েছে অন্য দু'টি তালিকায় নেই। সপ্তমত ঃ খালিয়াজুরী ও জোয়ানশাহী পরগনার নাম শুধু দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকায় রয়েছে। অষ্টমতঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকায় জোয়ার হুসেনপুরের নাম রয়েছে, প্রথম তালিকায় নেই। নবমতঃ কুড়িখাই এর নাম দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকায় থাকলেও প্রথম তালিকায় নেই। দশমতঃ দশকাহনিয়া বাজুর নাম শুধু মাত্র প্রথম তালিকায় রয়েছে। একাদশতমঃ ভাওয়াল পরগনার নাম তিনটি তালিকাতেই রয়েছে। কিন্তু ভাওয়াল পরগনা ঈসা খানের রাজ্য ভুক্ত হতে পারে না। কেননা ইহা ভাওয়ালের গাযী বংশীয়দের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত । ভট্টশালীর মতে ভাওয়াল প্রকৃত পক্ষে রণ-ভাওয়াল হবে। তিনি বলেন "Bhawal Baju proper belonged to the Ghazi zamindars from a period anterior to the rise of Isa Khan. The Bhawal under Isa Khan must be taken as Ran-Bhawal".[৩৩] এক্ষেত্রে ভট্টশালীর সাথে একমত হওয়া যায়। কেননা আকবরনামা পাঠে জানা যায় যে, ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে মুঘল সুবাহ্দার খান-ই - জাহান ভাটি অভিযানের সময় ভাওয়ালেই প্রথম শিবির স্থাপন করেন এবং এখান থেকেই তিনি ঈসা খানের বিরুদ্ধে শাহ্ বর্দী ও মুহম্মদ কুলীকে প্রেরণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, অষ্টগ্রামের নিকটবর্তী কত্তুল বা কাইথালে সংঘটিত যুদ্ধে মুঘল বাহিনী ঈসা খানের মিত্র জমিদার মজলিস দিলাওয়ার ও মজলিস প্রতাপের নিকট শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়ে গাযী বংশীয় জমিদার টিলা গাযীর সহায়তায় কোনক্রমে পলায়ন করে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। কাজেই ভাওয়াল ঈসা খানের রাজ্যভুক্ত না থাকারই কথা । দ্বাদশতম ঃ উপরোক্ত তালিকা গুলোতে বিদ্যমান অসঙ্গতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অসঙ্গতি হচ্ছে এ তালিকা গুলোর কোনটিতেই পুখরিয়া পরগনার নাম নেই। অথচ পুখরিয়া পরগনার ভৌগোলিক অবস্থান হচ্ছে জাফরশাহী, শেরপুর ও বড় বাজু পরগনার মাঝখানে। জাফরশাহী, শেরপুর ও বড় বাজু এ তিনটি পরগনাই ঈসা খানের রাজ্যভুক্ত। সুতরাং ঈসা খানের রাজ্যের মাঝখানে অন্য কারও জমিদারীর অংশ বা কর্তৃত্ব থাকা যুক্তি সংগত নয়। এ কারণে ভট্টশালী ও আবদুল করিম মনে করেন পুখরিয়া পরগনা ঈসা খানের রাজ্যভুক্ত ছিল। আবদুল করিম আরো মনে

Dhaka University Institutional Repository

করেন যে, পুখরিয়া পরগনার অনুপস্থিতি প্রমাণ করে যে, তালিকাগুলো নির্ভুল নয়[৩৩]।

যাহোক এ পর্যায়ে উপরোক্ত তালিকাগুলোর মধ্যে বিদ্যমান অসংগতির যথাসম্ভব যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করা গেলঃ এক্ষেত্রে প্রথমেই আবদুল করিমের মতই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "There is disagreement in the three lists , which is natural, because no list in contemporary. Besides, after a lapse of long years, the places also may have taken different names."[৩৪] এ ক্ষেত্রে আবদুল করিমের সাথে একমত পোষণ করা যায় । কেননা উপরোক্ত তালিকা গুলোর কোনটিই সমসাময়িক বলে প্রতীয়মান হয় না । অন্যদিকে কালের বিবর্তনে শাসক গোষ্ঠীর পরিবর্তনের সাথে সাথে শাসন কাঠামোর গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলে স্থানের নামের পরিবর্তন অপ্রত্যাশিত নয়। বর্তমানেও শাসক গোষ্ঠীর পরিবর্তনের ফলে স্থানের নামের পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। উপরোক্ত তিনটি তালিকার পরগনা গুলোর নামের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটা স্বাভাবিক। যেমন-প্রথমতঃ প্রথম তালিকার বড়বাজু, মেরাউনা, হেরানা, খরানা ও সেরালি এ পাঁচটি পরগনা পরবর্তীকালে বড়বাজু, আতিয়া ও কাগমারী নামে পরিচিতি লাভ করে। যে কারণে প্রথম তালিকার উক্ত পাঁচটি পরগনার পরিবর্তে দ্বিতীয় তালিকায় শুধুমাত্র বড়বাজু, আতিয়া ও কাগমারী এ তিনটি পরগনার নাম উল্লিখিত হয়েছে[৩৫]। দ্বিতীয়তঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকার শেরপুর প্রথম তালিকার দশকাহনিয়া বাজুর সাথে অভিন্ন।[৩৬] তৃতীয়তঃ প্রথম তালিকার সায়রজলকর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকার খালিয়াজুরী ও জোয়ানশাহী পরগনার সাথে অভিন্ন। চতুর্থতঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকার জোয়ার হোসেনপুর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকার হোসেন শাহী পরগনার ক্ষুদ্র অংশ। পঞ্চমতঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকার কুড়ি খাই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকার বলদা খাল বা বরদাখাত পরগনার অধীন একটা বৃহত টপ্পা।[৩৭] ষষ্ঠত ঃ দ্বিতীয় তালিকার বরদাখাত মগরা, তৃতীয় তালিকার বরদাখাত মনরার সাথে অভিন্ন। এগুলো বরদাখাত পরগনার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশ হতে পারে বলে আবদুল করিম মনে করেন। সপ্তমতঃ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকার কতরাব উক্ত তালিকাগুলোর সোনারগাঁও পরগনার অধীন একটি টপ্পা[৩৮]। এখন নিম্নে উপরোক্ত তিনটি তালিকায় প্রাপ্ত পরগনা গুলোর ভৌগোলিক পরিচিতি তুলে ধরা গেলঃ

Dhaka University Institutional Repository

১। আলেপসাহী ঃ আলেপসাহী বা আলাপসিংহ একটি বৃহত পরগনা। ঢাকা-বাহাদুরাবাদ রেল-লাইনের ধলা ষ্টেশন হতে শুরু করে ময়মনসিংহ পার হয়ে পিয়ার পুর ষ্টেশন পর্যন্ত অংশের পশ্চিমে মুক্তাগাছা, ফুলবাড়িয়া ও ত্রিশাল থানার প্রায় সমস্ত অঞ্চল জুড়ে এ পরগনা অবস্থিত । এ পরগনার আয়তন ৫৬০ বর্গ মাইল[৩৯]।

২। মমিনসাহিঃ মমিন সাহি বা মইমন সিংহ পরগনা আয়তনের দিক থেকে আলেপসাহী পরগনার তুলনায় বৃহত্তর। এর আয়তন ৬০৪ বর্গমাইল। ইহা ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বতীরে অবস্থিত। এ পরগনা ব্রহ্মপুত্রের তীর থেকে পূর্বদিকে সিলেট জেলার সীমানা পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত । গৌরীপুর, গোপালপুর, কেল্লা বোকাই নগর প্রভৃতি বিখ্যাত স্থান সমূহ এ পরগনার অন্তর্ভুক্ত[৪০]।

৩। হোসেন শাহী ঃ এ পরগনা ব্রহ্মপুত্র-নদের পূর্বতীরে এবং মমিনসাহি পরগনার দক্ষিণে অবস্থিত। হোসেন শাহী পরগনার আয়তন ৩২৫.৪৩ বর্গ মাইল। এ পরগনার একটি অংশ জোয়ার হোসেন পুর নামে পরিচিত বলে পূর্বের আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে। জোয়ার হোসেন পুরের প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে হোসেনপুর। জোয়ার এর আয়তন ১৩৬.৩৬ বর্গমাইল। সুতরাং এ দু'য়ের সম্মিলিত আয়তন হচ্ছে প্রায় ৪৬২ বর্গ মাইল[৪১]।

৪। বড় বাজু ৫। কাগমারী ৬। আতিয়া ঃ এক সময় আতিয়া, কাগমারী ইত্যাদি পরগনা বড় বাজু নামে পরিচিত ছিল। এ বড় বাজু পরগনা ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় তীরে বিস্তৃত এবং এ পরগনার বিরাট অংশ ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এমনকি বড়বাজু পরগনার কিয়দংশ বগুড়া জেলায় পড়েছে[৪২]। যাহোক, মোটামুটি আতিয়া, কাগমারী এবং বড়বাজু এ তিনটি পরগনা নিয়েই তৎকালীন টাঙ্গাইল মহকুমা গঠিত হয়[৪৩]। আতিয়া একটি বৃহত পরগনা। ইহা ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত এবং ইহার কতকাংশ ঢাকা জেলায়ও পড়েছে। ময়মনসিংহ জেলায় এ পরগনার আয়তন ৬৩৫ বর্গমাইল এবং ঢাকা জেলায় ৩৭১ একর বা অর্ধ-বর্গমাইলের কিছুটা বেশী। এমনকি এ পরগনার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পাবনা জেলায়ও পড়েছে[৪৪]। কাগমারী পরগনার আয়তন ২০৮ বর্গমাইল। বড় বাজু পরগনার অধিকাংশ অঞ্চল

Dhaka University Institutional Repository

পাবনা জেলার অন্তর্ভুক্ত এবং ময়মনসিংহ জেলায় এর আয়তন ১২২ বর্গমাইল"[৪৫] ।

৭। পুখরিয়া ঃ পুখরিয়া পরগনাটি টাঙ্গাইলের উত্তরে যমুনার ধারার বরাবরে জামালপুর, শেরপুর এবং নলিতাবাড়ীর কিছু কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। এ পরগনার আয়তন প্রায় ৪৩৭.২৯ বর্গমাইল। আইন-ই-আকবরীতে সরকার বাজুহায় ইহা একটি ভিন্ন পরগনা নামে উল্লেখিত"[৪৬] ।

৮। ভাওয়াল বাজুঃ পূর্বের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, ইহা প্রকৃত পক্ষে রণ-ভাওয়ালই হবে। রণ-ভাওয়াল পরগনার সীমা পূর্বে ব্রহ্মপুত্র-নদ, পশ্চিমে আতিয়া পরগনা, উত্তরে আলাপসিংহ পরগনা এবং দক্ষিণে ঢাকা জেলার সীমানা বানার নদী"[৪৭] ।

৯। দশকাহনিয়া বা শেরপুর ঃ এ পরগনার আয়তন ৭৮৯ বর্গমাইল। এর দক্ষিণ ও পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদ, উত্তরে গারো-পর্বতমালা এবং পূর্বে সুসঙ্গ পরগনা"[৪৮] ।

১০। সায়র জলকর বা জোয়ান শাহী এবং ১১। খালিয়াজুরী পরগনা ঃ এ দুই পরগনা জলাভূমিতে পরিপূর্ণ। ময়মনসিংহ জেলার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত জোয়ানশাহী পরগনা ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব সীমানায় ধনু ও মেঘনা নদীর মাঝখানে অবস্থিত একটি বৃহত পরগনা । অষ্টগ্রাম, ঢাকী, ইটনা প্রভৃতি স্থান এ পরগনার অন্তর্গত । দক্ষিণে ইহা ভৈরব বাজারের ৪ মাইল উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার আয়তন ৩০০ বর্গমাইলেরও অধিক"[৪৯] । খালিয়াজুরী পরগনার প্রায় অধিকাংশই জলাভূমি। এর আয়তন ১৩০ বর্গমাইল। খালিয়াজুরী পরগনা ধনু নদী দ্বারা দ্বি-খন্ডিত। এ পরগনার উত্তর ও পূর্বে সিলেট জেলা, দক্ষিণে জোয়ানশাহী পরগনা এবং পশ্চিমে নাসির উজিয়াল পরগনা অবস্থিত "[৫০] ।

১২। সিংধা বা সিংধা মৈন ঃ ইহা মমিনসাহী ও নাসির উজিয়াল পরগনার অন্তর্গত ছিটা টপ্পা এবং পুলিশ ষ্টেশন বারহাট্টা, আটপাড়া ও কেন্দুয়ার অন্তর্গত"[৫১] ।

Dhaka University Institutional Repository

১৩। দরজী বাজু ঃ দরজী বাজু পরগনার অনেকাংশ সিংধা টপ্পা নামে পরিচিত। কিশোরগঞ্জ শহরের উত্তরে দরজী বাজু নামে অনেক গুলো ছিটা ক্ষুদ্র -ক্ষুদ্র মহাল এ পরগনার অন্তর্গত [৩২]।

১৪। সিংনছরত উজিয়াল বা নাসির উজিয়াল ঃ এর আয়তন ১৯৪ বর্গমাইল। কেন্দুয়া থানা মোটামুটি এ পরগনার সাথে অভিন্ন[৩৩]।

১৫। হাজরাদিঃ এ পরগনার আয়তন ৩২২ বর্গমাইল। কিশোর গঞ্জ শহরের প্রায় ৭ মাইল উত্তর দিক থেকে শুরু করে দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র-নদের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত[৩৪]।

১৬। জাফর শাহী ঃ ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণে প্রায় সমগ্র জামালপুর মহকুমা (বর্তমানে জেলা) নিয়ে এ পরগনা গঠিত। এর আয়তন ২৫৩ বর্গমাইল। এ পরগনার কিয়দংশ বগুড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত[৩৫]। টোডর মল্লের রাজস্ব বন্দোবস্তে জাফর শাহী পরগনা সরকার ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত[৩৬]।

১৭। বলদাখাল বা বরদাখাত[৩৭]ঃ বরদাখাত ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত একটি বিখ্যাত ও বৃহত পরগনা। এ পরগনার উত্তরাংশ ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্ভুক্ত । কুড়ি খাই এ পরগনার অন্তর্গত একটি বৃহত টপ্পা। এ টপ্পা ভৈরব বাজারের নিকট মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম স্থল থেকে শুরু করে উত্তরে ও পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র-নদের তীরে তীরে বিস্তৃত। ভৈরব বাজার এ টপ্পার অন্তর্গত। ভৈরব বাজারের দক্ষিণেও বরদাখাত পরগনা ত্রিপুরা জেলায় মেঘনা নদীর পূর্বতীর বরাবর প্রায় ৩৬ মাইল বিস্তৃত এবং মোটামুটি ১২ মাইল প্রশস্ত। এর উত্তর-পূর্বে ত্রিপুরার মহারাজার সম্পত্তি চাকলে রোশেনাবাদ।

১৮। পাইটকারা বা পাটিকারা[৩৮] ঃ এ পরগনা প্রাচীন পট্টিকেরা রাজ্য ও শহরের স্মৃতি বহন কারী । কুমিল্লা শহরের ৫ মাইল পশ্চিমে উত্তর - দক্ষিণে ১২ মাইল দীর্ঘ যে অনুচ্চ-পর্বতমালা রয়েছে তার উত্তরাংশ ময়নামতি ও দক্ষিণাংশ লালমাই পর্বত মালা নামে পরিচিত । পাটিকারা পরগনা ময়নামতি পর্বত মালার পশ্চিমে ১২ মাইল প্রশস্ত অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

১৯। গঙ্গামন্ডল[৫৯] ঃ গঙ্গামন্ডল পরগনা পাটিকারা পরগনার অব্যবহিত উত্তরে এবং বরদাখাত পরগনার দক্ষিণাংশের পূর্বে অবস্থিত।

২০। সোনারগাঁও ২১। কাটরাব বা কতরাব ঃ সোনারগাঁও ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটি বিখ্যাত পরগনা। ইহা লক্ষ্যা ও মেঘনা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ইহা পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে নদী দ্বারা বেষ্টিত । কিন্তু উত্তর দিকে ইহার সীমা কোথায় শেষ হয়েছে এবং কোন স্থান থেকে মহেশ্বরদী পরগনা শুরু হয়েছে তা নিশ্চিত বলা যায় না। এ পরগনার আয়তন প্রায় ২৪ বর্গমাইল[৬০]। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকায় কতরাবকে একটি স্বতন্ত্র পরগনা হিসেবে উল্লেখ করা হলেও মূলতঃ ইহা সোনারগাঁও পরগনার অন্তর্গত একটি বৃহত টপ্পা। কতরাব লক্ষ্যা ও ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এবং ইহা ৩ মাইল প্রশস্ত ও ১৪ মাইল দীর্ঘ। লক্ষ্যার পশ্চিম তীরে নারায়ণগঞ্জ শহরের উত্তরাংশ কতরাব টপ্পার অন্তর্গত এবং খিযিরপুরের প্রাচীন দুর্গও এ টপ্পার অন্তর্গত। এ অংশটি নসরত শাহী পরগনার অন্তর্গত। কতরাব টপ্পার আয়তন প্রায় ৪২ বর্গমাইল[৬১]। সুতরাং দেখা যায় যে ইহা আসল পরগনা থেকে আয়তনে বড়। পূর্বের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কতরাবতে ঈসা খানের রাজধানী ছিল। সম্ভবতঃ এ গুরুত্বের কারণেই কতরাবকে একটি স্বতন্ত্র পরগনা হিসেবে উপরোক্ত তালিকা গুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে।

২২। মহেশ্বরদী ঃ মহেশ্বরদী পরগনা সোনারগাঁও পরগনার উত্তরে অবস্থিত। এ পরগনাও মেঘনা ও লক্ষ্যা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এর উত্তর - পূর্বকোণ ভৈরব বাজারকে স্পর্শ করেছে। মহেশ্বরদী পরগনার উত্তর সীমা লাখপুর হতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত। ঘোড়াশাল ও ভৈরব ষ্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত টঙ্গী-ভৈরব বাজার রেল লাইনের অংশ এ পরগনার আনুমানিক উত্তর সীমা হলেও ইহা এ লাইনের আরো বেশ কিছু উত্তর দিক পর্যন্ত বিস্তৃত[৬২]।

উপরে আলোচিত পরগনা গুলোর মধ্যে আলেপসাহী, মমিনসাহী, হোসেন শাহী, বড়বাজু, কাগমারী, আতিয়া, পুখরিয়া, রণ-ভাওয়াল, শেরপুর, জোয়ানশাহী,

Dhaka University Institutional Repository

খালিয়াজুরী, সিংধামৈন, দরজীবাজু, নাসির উজিয়াল, হাজরাদি, জাফর শাহী, বরদাখাত (কিছু অংশ) প্রভৃতি পরগনা ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত। সোনারগাঁও, কতরাব ও মহেশ্বরদী প্রভৃতি ঢাকা জেলায় অবস্থিত । বরদাখাত (অধিকাংশ অংশ), পাটিকারা ও গঙ্গামন্ডল পরগনা ত্রিপুরা জেলায় অবস্থিত। ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত পরগনাগুলোর মধ্যে আতিয়া পরগনার সামান্য কিছু অংশ ঢাকা জেলায়, আতিয়া ও বড়বাজু পরগনার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পাবনা জেলায় এবং বড়বাজু ও জাফর শাহী পরগনার কিয়দংশ বগুড়া জেলায় পড়েছে। এ ছাড়া বরদাখাত পরগনার কিছু অংশ ময়মনসিংহ জেলায় পড়লেও এ পরগনার সিংহ-ভাগই ত্রিপুরা জেলায় পড়েছে। যাহোক, ১৫৭৮, ১৫৮৪ এবং ১৫৯৭ খ্রীস্টাব্দে মুঘলদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উপরোক্ত যুদ্ধ সমূহ ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলায় সংঘটিত হলেও ত্রিপুরা জেলায় ঈসা খানের সাথে মুঘলদের কোন সংঘর্ষের কোন সংবাদ কোন প্রামাণ্য ঐতিহাসিক সূত্রে পাওয়া যায় না। এছাড়া ত্রিপুরা জেলায় ঈসা খানের কোন কর্মকান্ডের সংবাদও কোন প্রামাণ্য ঐতিহাসিক সূত্রে পাওয়া যায় না। তাই সংগত কারণেই ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত পরগনা গুলোতে ঈসা খানের কর্তৃত্ব কিংবা এ পরগনা গুলো ঈসা খানের রাজ্যভুক্ত ছিল কিনা তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। তবে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বরদাখাত পরগনার যে অংশটুকু ময়মনসিংহ জেলায় পড়েছে সে অংশটুকু এবং এর আশে-পাশে ঈসা খানের কর্তৃত্ব ছিল বললে অত্যুক্তি হবে না।

গ) E. A.Gait মত প্রকাশ করেন যে, "at one time he ruled the whole country from Ghoraghat to the sea."[৬৩] Gait এর এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, ঈসা খান এক সময় ঘোড়াঘাট থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খন্ডের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু Gait এর বক্তব্য সুস্পষ্ট নয়। কেননা তিনি এখানে 'sea' বলতে কি বুঝিয়েছেন তা বোধগম্য নয়। তবে তিনি যদি 'sea' বলতে বঙ্গোপসাগর বুঝিয়ে থাকেন তাহলে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ঈসা খানের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব থাকার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে ঘোড়াঘাট বলতে তিনি ঘোড়াঘাট শহর বুঝিয়েছেন না ঘোড়াঘাট সরকার বুঝিয়েছেন তাও বোধগম্য নয়। যদি তিনি ঘোড়াঘাট বলতে ঘোড়াঘাট সরকার বুঝিয়ে থাকেন তবে তাহলে পূর্বের আলোচনায় দেখা গেছে যে, সরকার ঘোড়াঘাটের জাফর শাহী পরগনা ঈসা খানের রাজ্যভুক্ত ছিল এবং জাফর শাহী পরগনার কিয়দংশ বগুড়া

জেলায় পড়েছে। এ অনুযায়ী সরকার ঘোড়াঘাটের কিয়দংশ তথা বগুড়া জেলার কিছু অংশ ঈসা খানের রাজ্যভুক্ত ছিল বলে ধরে নেয়া যায়। কেননা বগুড়া জেলা সরকার ঘোড়াঘাটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া এখানে উল্লেখ্য যে, কাজী মোহাম্মদ মিছের প্রণীত বগুড়ার ইতিকাহিনী পাঠে জানা যায় বগুড়া শহরের পূর্বদিকে ইসাইদহ বা এছিদহ নামে একটি স্থান রয়েছে। এ ইসাইদহ ঈসা খানের নামানুসারে আখ্যাত হয়েছে[৬৬]। তাই ইহা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, বগুড়া শহর কিংবা এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এক সময় ঈসা খানের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। অধিকন্তু জাফরশাহী পরগনার পশ্চিম দিকে ব্রহ্মপুত্র-নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত রংপুর জেলার কিয়দংশের উপর ঈসা খানের কর্তৃত্ব থাকা অমূলক নয়। কেননা রংপুর জেলাও সরকার ঘোড়াঘাটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাহোক, Gait এর বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, সরকার ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত রংপুর ও বগুড়া জেলার কিছু কিছু অংশের উপর ঈসা খানের আধিপত্য ছিল। অন্যদিকে ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে শাহ্‌বায খান ভাটি অভিযানে ব্যর্থ হয়ে রাজধানী তাঁড়ায় ফিরে যাওয়ার পর থেকে ১৫৯৪ খ্রীস্টাব্দে মানসিংহ বাংলার সুবাহ্‌দার নিযুক্ত হওয়া পর্যন্ত বাংলায় মুঘল অভিযানের অগ্রগতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মুঘল অধিকার সংকুচিত হয়ে রাজধানী তাঁড়ার ২৪ মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে[৬৭], আবার কখনও পূর্বদিকে বগুড়ার শেরপুর মুর্চা পর্যন্ত অঞ্চলে সীমিত থাকে[৬৮]। সর্বোপরি ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দে দেখা যায় যে, ঈসা খান ও মাসুম কাবুলী ঘোড়াঘাট আক্রমণ করেন এবং ঘোড়াঘাটের ১২ ক্রোশ দূরত্বের মধ্যে চলে আসেন[৬৯]। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ঈসা খান কখনও কখনও ব্রহ্মপুত্র-নদ অতিক্রম করে ঘোড়াঘাট শহরের নিকটবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত ভূ-খন্ডের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জানা গেল যে, ঈসা খান তাঁর ক্ষমতায় আরোহণের প্রথম দিকে তাজ খান কাররানীর নিকট থেকে সোনারগাঁও এবং মহেশ্বরদী পরগনার ইকতা লাভ করেন। এখান থেকেই তিনি কালক্রমে ক্ষমতা বিস্তার করে ঢাকা জেলার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, প্রায় সম্পূর্ণ ময়মনসিংহ জেলা, ত্রিপুরা, পাবনা, রংপুর, বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার কিছু কিছু অংশের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এই ইকতাকেই তাঁর রাজ্যে পরিণত করেন। তবে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমপারে ঈসা খানের কর্তৃত্ব সর্বদা স্থির

Dhaka University Institutional Repository

ছিল না। কিন্তু ঢাকা জেলার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, প্রায় সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা[৬৮] ও ত্রিপুরা জেলার কিছু অংশে ঈসা খানের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার কতরাব, খিযিরপুর, সোনারগাঁও, জঙ্গলবাড়ী ইত্যাদি স্থানে ঈসা খানের রাজধানী ছিল বলে কথিত আছে (এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে)।

ভাগ ৩ – ঈসা খানের রাজধানী ঃ

ঈসা খানের রাজধানী বা কর্মকান্ডের প্রধান কেন্দ্র স্থলের প্রকৃত অবস্থান নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ময়মনসিংহের ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা কেদার নাথ মজুমদার [৬৯] ও সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস রচয়িতা স্বরূপ চন্দ্র রায়ের[৭০] মতে ঈসা খান নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী খিযিরপুরে প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন। দ্বিতীয়তঃ কেদারনাথ মজুমদার[৭১] ও সতীশচন্দ্র মিত্র[৭২] মত প্রকাশ করেন যে, ১৫৮৫[৭৩] খ্রীস্টাব্দে শাহ্‌বায খান ভাটি আক্রমণ করে রাজধানী খিযিরপুর দখল করে নিলে ঈসা খান সোনারগাঁও-এ নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। এছাড়া তাঁদের মতে ঈসা খান ময়মনসিংহ জেলার জঙ্গলবাড়ীতে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন[৭৪]। তৃতীয়তঃ নিখিল নাথ রায় সহ আরো অনেক ঐতিহাসিকের মতে ঈসা খানের রাজধানী ছিল কত্রাভুবা কতরাব'তে[৭৫]। যাহোক, উক্ত ঐতিহাসিকদের বক্তব্য অনুযায়ী ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত খিযিরপুর, সোনারগাঁও, কতরাব এবং জঙ্গলবাড়ীতে ঈসা খানের অন্ততঃ চারটি রাজধানী ছিল। কিন্তু সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থ আবুল ফযলের আকবরনামায় একমাত্র কতরাব ব্যতীত উল্লেখিত অন্য তিনটি স্থানে ঈসা খানের বাসস্থান কিংবা রাজধানী ছিল – এ মর্মে কোনরূপ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ইংগিত পাওয়া যায় না। ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে মুঘল সুবাহ্‌দার শাহ্‌বায খানের ভাটি অভিযানের বিবরণ প্রদানের সময় আবুল ফযল আকবরনামায় কতরাব সম্পর্কে লিখেন যে, "They also reached Karabuh? (কতরাব) which was his (Isa's) home . That populous city was plundered". [৭৬] দেখা যায় যে, আবুল ফযল এক্ষেত্রে কতরাবকে ঈসা খানের বাসস্থান হিসেবে উল্লেখ করেন। আবুল ফযলের এ উক্তির উপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক এম, এ, রহিম ও আবদুল করিম সহ

Dhaka University Institutional Repository

আরো অনেকেই মত প্রকাশ করেন যে, কতরাব'তে ঈসা খানের রাজধানী ছিল[৭৭]। কতরাব শহরের অবস্থান নিয়ে দীর্ঘ দিন যাবত পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ ছিল। কিন্তু পূর্বের আলোচনায় উল্লেখ করা হয় যে, সম্প্রতি হাবিবা খাতুন প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, কতরাব শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্বতীরে রূপগঞ্জ উপজিলার (বর্তমানে থানা) মাসুমাবাদ গ্রামের সাথে অভিন্ন[৭৮]। ঐতিহাসিক আবদুল করিমও হাবিবা খাতুনের সাথে একমত পোষণ করেন । সুতরাং বর্তমানে কতরাব'র ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে কোনরূপ বিতর্ক না থাকারই কথা। হাবিবা খাতুন আরো বলেন যে, কতরাবই ছিল ঈসা খানের প্রথম রাজধানী[৭৯]। কেদারনাথ মজুমদার ও স্বরূপ চন্দ্র রায় খিযির পুরকে ঈসা খানের প্রথম রাজধানী হিসেবে উল্লেখ করলেও সংগত কারণেই হাবিবা খাতুনের সাথে একমত হওয়া সম্ভব । কেননা একমাত্র সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থ আকবরনামায় আবুল ফযল একমাত্র কতরাবকেই ঈসা খানের বাসস্থান তথা রাজধানী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে শাহ্বায খান কর্তৃক কতরাব ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার পরেও ১৫৯৭ খ্রীস্টাব্দে[৮০] মুঘল সুবাহ্দার মানসিংহের পুত্র দূর্জন সিংহ এবং ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে[৮১] মিরজা নাথন কর্তৃক রাজধানী কতরাব আক্রান্ত হওয়ায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মুঘলদের নিকট কতরাব'র গুরুত্ব ছিল অপরিসীম এবং বাদশাহ্ আকবর ও তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীরের শাসনামলে ভাটি অঞ্চলে মুঘল সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক ঈসা খান ও তাঁর পুত্র মুসা খানের মুঘল বিরোধী কর্মকান্ডের প্রথম ও অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল কতরাব। অধিকন্তু, বারংবার মুঘল আক্রমণের ফলে বিধ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও ঈসা খানের মৃত্যুর পরেও কতরাব ছিল মুসা খানের পারিবারিক আবাসস্থল[৮২]। এতে বুঝা যায় কতরাব'র প্রতি মুসা খানের সহজাত দুর্বলতা ছিল। এ দুর্বলতাই প্রমাণ করে যে, কতরাব ঈসা খানের প্রথম রাজধানী ছিল। যাহোক, এক্ষেত্রে সঠিক বক্তব্য হচ্ছে কতরাবই ছিল ঈসা খানের প্রথম রাজধানী। অন্যদিকে কেদারনাথ মজুমদার ও স্বরূপ চন্দ্র রায় তাঁদের বক্তব্যের স্বপক্ষে কোন যুক্তি কিংবা প্রামাণ্য দলিল উপস্থাপন করেননি। এমনকি খিযিরপুরে ঈসা খানের রাজধানী কিংবা বাসস্থান ছিল - এ মর্মে আকবর নামায়ও কোন রূপ ইংগিত পাওয়া যায়না। তবে জানা যায় যে, খিযির পুরে ঈসা খানের পরিবারের একাংশ বসবাস করতেন[৮৩] এবং আকবর নামায়[৮৪] খিযির পুরের নিকটে ঈসা খানের দু'টি দুর্গ থাকার কথা উল্লিখিত হওয়ায় এ স্থান যে ঈসা খানের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা সহজেই বুঝা যায়। তাই ইহা বলা অযৌক্তিক হবেনা যে, ঈসা খান খিযির পুরে রাজধানী স্থাপন করেন

Dhaka University Institutional Repository

বা না-ই করে থাকেন, এ স্থানে যে, একসময় তাঁর সাময়িক কার্যালয় ছিল সে ব্যপারে কোন সন্দেহ না থাকারই কথা।

ঈসা খানের রাজধানী হিসেবে কতরাব'র পরেই সোনারগাঁওয়ের স্থান। জানা যায় যে, ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ পরিব্রাজক রালফ্ ফিচ সোনারগাঁও ভ্রমণ করেন। তিনি সোনারগাঁও সম্পর্কে বলেন, "Sinnergan is a towne sixe leagues from Serrepore... The chiefe king of all these countries is called Isacan... and is a great friend to all Christians:"[৮৫] রালফ্ ফিচের এ উক্তির উপর ভিত্তি করে অনেক লেখকই মত প্রকাশ করেন ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে শাহ্বায খান কর্তৃক কতরাব ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার পর ঈসা খান সোনারগাঁওয়ে রাজধানী স্থানান্তর করেন। এ ক্ষেত্রে দ্বিমত থাকার অবকাশ নেই। কেননা ইতিহাস পাঠে জানা যায় ঈসা খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুসা খানের সময়েও সোনারগাঁও রাজধানী ছিল এবং সোনারগাঁওকে কেন্দ্র করেই তিনি মুঘলদেরকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন[৮৬]। খিযির পুরের তিন মাইল পূর্বে সোনারগাঁও অবস্থিত[৮৭]। ব্রহ্মপুত্র-নদের পশ্চিমতীরে ও শীতলক্ষ্যার পূর্বতীরে রাজধানী শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পুরাতন বাণিজ্য কেন্দ্রে এক বন্দর নগরী গড়ে উঠেছিল। এখনও সে স্থান বন্দর নামে পরিচিত। সমৃদ্ধ বন্দর নগরীর নিকটে রাজধানী সোনারগাঁও দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। এ দুর্গ নগরী মেনীখালি নদীর উত্তর তীরে বর্তমান দম দমা নামক স্থানে অবস্থিত ছিল বলে ডঃ হাবিবা খাতুন মত প্রকাশ করেন। পরপর দুটি পরিখা এ রাজধানী শহরকে সুরক্ষিত রেখেছিল[৮৮]।

কেদারনাথ মজুমদার জঙ্গলবাড়ীতে ঈসা খানের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল বলে মত প্রকাশ করলেও তিনি তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে কোন প্রামাণ্য দলিল উপস্থাপন করেননি। আবুল ফযলের আকবরনামায়ও এ সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে জঙ্গলবাড়ী যে ঈসা খান ও তাঁর বংশধরদের আবাস স্থল ছিল সে সম্পর্কে কোন বিতর্ক নেই। তাছাড়া জানা যায় যে, ব্রহ্মপুত্র-নদের প্রধান ধারার পূর্বতীরে অবস্থিত এগার সিন্দুরে এবং ব্রহ্মপুত্র-নদের উজান পথে রাঙ্গামাটি ও দশকাহনিয়ার (বর্তমানে শেরপুর) সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ঈসা খান দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন[৮৯]। সুতরাং ইহা ধারণা করা অমূলক নয় যে, জঙ্গলবাড়ীকে শত্রুদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই নিরাপত্তা জোরদার করার নিমিত্তেই তিনি এ দুর্গ গুলো নির্মাণ করেছিলেন। যাহোক, জঙ্গলবাড়ীতে ঈসা

Dhaka University Institutional Repository

খানের রাজধানী ছিল কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলা না গেলেও এ স্থানটি যে তাঁর কর্মকান্ডের একটি অন্যতম কেন্দ্রস্থল ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ঈসা খান প্রথম কতরাবতে রাজধানী স্থাপন করেন এবং ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে মুঘল বাহিনী কর্তৃক কতরাব শহর বিধ্বস্ত হওয়ার পর তিনি সোনারগাঁওয়ে রাজধানী স্থানান্তর করেন। অন্যদিকে খিযিরপুর ও জঙ্গলবাড়ীতে ঈসা খান কর্তৃক রাজধানী স্থাপনের পক্ষে কোন প্রামাণ্য ঐতিহাসিক দলিল পাওয়া না গেলেও বিশাল মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে সীমিত সৈন্য ও অস্ত্রবলের অধিকারী ঈসা খানের যুদ্ধের প্রধান প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, সামরিক কৌশলগত কারণে তাঁর দুই বা ততোধিক কার্যালয় কিংবা রাজধানী থাকা বিচিত্র ছিলনা।

তথ্যনির্দেশ

১। সুলতানী আমল, পৃঃ ৩৮৩-৩৮৪।

২। মোগল আমল, পৃঃ ৩৯ - ৪০।

৩। ভট্টশালীর সুদীর্ঘ আলোচনার জন্য দেখুন বি, পি, পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ ২৪-২৫ এবং ভারত বর্ষ ঃ আষাঢ়-১৩৩৬ বঙ্গাব্দ- ১৭শ বর্ষ- ১ম খন্ড - ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৫৬-৫৭, আবদুল করিমের বক্তব্যের জন্য দেখুন মোগল আমল, পৃঃ ২৭-২৮।

৪। মোগল আমল, পৃঃ ২৫।

৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।

৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯।

৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৩।

৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১।

৯। আকবর নামা ৩য় , পৃঃ ৬৪৮।

১০। বি, পি, পি, ভল্যুম ৩৫, পৃঃ ৩৩।

১১। Mughal Period, পৃঃ ৭০।

১২। ময়মনসিংহের ইতিহাস, কলিকাতা, সান্যাল এন্ড কোং , ফেব্রুয়ারী ১৯০৬,পৃঃ ৫৬-৫৭। পরবর্তীতে ময়মনসিংহ হিসেবে উল্লিখিত।

Dhaka University Institutional Repository

১৩। প্রতাপাদিত্য, পৃঃ ৫৫-৫৬।

১৪। J.A.S.B. 1904, পৃঃ ৬০-৬১।

১৫। আইন ২য় , পৃঃ ১৩০।

১৬। আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ৬৪৮।

১৭। Mughal Period, পৃঃ ৭১।

১৮। বি, পি, পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ ২২-২৩।

১৯। Mughal Period, পৃঃ ৭০-৭১।

২০। আইন ২য় , পৃঃ ১৩০।

২১। বি, পি, পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ ২২ এবং ২৬।

২২। খান - ই - জাহান এবং শাহ্বায খানের ভাটি অভিযানের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ৩৭৬-৩৭৮ এবং ৬৪৮-৬৫১ এবং ৬৫৮-৬৬০।

২৩। First Print - 1876. Reprinted - 1973, পৃঃ ৩৫৬।

২৪। পৃঃ ৯৩।

২৫। মোগল আমল , পৃঃ ১৪৩-১৪৪। আবদুল করিম এক্ষেত্রে সরাইলকে ঈসা খানের রাজ্যভুক্ত হিসেবে উল্লেখ করলেও তা সঠিক নয়। কেননা পূর্বের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, ঈসা খান কখনই সরাইলের জমিদার ছিলেন না, এমনকি ত্রিপুরার রাজার নাকের ডগায় সরাইলে ঈসা খানের কর্তৃত্ব থাকার প্রশ্নই উঠেনা। আবু ফযল আকবরনামায় ঈসা খান কর্তৃক কুচবিহার আক্রমণ করার কথা উল্লেখ করেন (আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ৬৫০)। কিন্তু এ বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে এবং সুধীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীকেদার নাথ মজুমদার এক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁদের বক্তব্যের জন্য দেখুন Frontier policy, পৃঃ ১০৬ এর পাদটীকা এবং ময়মনসিংহ, পৃঃ ৫৫-৫৬।

২৬। J. A. S. B.1874,পৃঃ ২০৯-২১৪।

২৭। পূর্ববঙ্গগীতিকা , পৃঃ ২১৫-২১৬।

২৮। ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে ঈসা খানের মৃত্যুর বিবরণ প্রদানের সময় আবুল ফযল বলেন, "One of the occurrences was the death of Isa. He was a great landholder in Bengal. He had some share of prudence, but from somnolence of fortune he did not come to Court. " (আকবরনামা ৩য় , পৃঃ ১১৪০)। সুতরাং আবুল ফযলের এ উক্তিই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, ঈসা খান কখনই আকবরের দরবারে যাননি।

Dhaka University Institutional Repository

২৯। পৃঃ ৫৭।

৩০। Bengal District Gazetteers - Mymensingh - By F.A. Sachse, Calcutta- 1917, পৃঃ ১৬৮।

৩১। পূর্ববঙ্গগীতিকা, পৃঃ ২১৬।

৩২। বি, পি, পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ ২৯।

৩৩। মোগল আমল, পৃঃ ৭০ এবং বি, পি, পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ ২৭।

৩৪। Mughal Period, পৃঃ ৮৭।

৩৫। ময়মনসিংহ, পৃঃ ৬০।

৩৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬ এবং ৬০।

৩৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬১ এবং ভারতবর্ষ - ভাদ্র - ১৩৩৬, ১৭শ বর্ষ - ১ম খন্ড - ৩য় সংখ্যা,পৃঃ ৩৭৮-৩৭৯।

৩৮। মোগল আমল, পৃঃ ৭১ এবং ভারতবর্ষ - প্রাগুক্ত , পৃঃ ৩৭৯।

৩৯। বি, পি, পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ ২৮ এবং ভারতবর্ষ - প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৮।

৪০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৮।

৪১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৮।

৪২। প্রভাস সেনঃ বগুড়ার ইতিহাস - দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯১২-১৪,পৃঃ২৬১। পরবর্তীতে বগুড়ার ইতিহাস হিসেবে উল্লিখিত।

৪৩। বি, পি, পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ ২৯ এবং ভারতবর্ষ প্রাগুক্ত,পৃঃ ৩৭৮।

৪৪। বি, পি, পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ ২৯।

৪৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ২৯, কাগমারী পরগনার কিয়দংশ বগুড়া জেলায় পড়েছে বলে প্রভাস সেন মত প্রকাশ করেছেন (বগুড়ার ইতিহাস, পৃঃ ২৭২)।

৪৬। বি, পি, পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ ২৭,২৯ এবং মোগল আমল, পৃঃ ৭০।

৪৭। বি, পি, পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ ২৯।

৪৮। প্রাগুক্ত , পৃঃ ২৯।

৪৯। প্রাগুক্ত , পৃঃ ২৯ এবং ভারতবর্ষ প্রাগুক্ত,পৃঃ ৩৭৮-৩৭৯।

৫০। প্রাগুক্ত , পৃঃ ৩০ এবং প্রাগুক্ত , পৃঃ ৩৭৮-৩৭৯।

৫১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩০ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৯।

৫২। প্রাগুক্ত এবং প্রাগুক্ত।

৫৩। প্রাগুক্ত এবং প্রাগুক্ত।

৫৪। প্রাগুক্ত এবং প্রাগুক্ত।

৫৫। বগুড়ার ইতিহাস, পৃঃ ২৭১-২৭২।

৫৬। বি, পি, পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ ৩০ এবং ভারতবর্ষ প্রাগুক্ত, ৩৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

৫৭। প্রাগুক্ত এবং প্রাগুক্ত ।

৫৮। প্রাগুক্ত এবং প্রাগুক্ত ।

৫৯। প্রাগুক্ত এবং প্রাগুক্ত ।

৬০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১ এবং প্রাগুক্ত ।

৬১। প্রাগুক্ত এবং প্রাগুক্ত ।

৬২। প্রাগুক্ত এবং প্রাগুক্ত ।

৬৩। H. Assam, পৃঃ ৬২।

৬৪। কাজী মোহাম্মদ মিছের ঃ বগুড়ার ইতি কাহিনী, ১৯৫৭, পৃঃ ৯৮।

৬৫। মোগল আমল, পৃঃ ১৪৪।

৬৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৮।

৬৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৩ এবং H. Bengal., পৃঃ ২১১-২১২। ঘোড়া ঘাট বর্তমানে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত।

৬৮। ভট্টশালী ও এম,এ, রহিম মত প্রকাশ করেন যে, ঈসা খান আফগান প্রধান উসমান খানকে তাঁর রাজ্যের কিয়দংশ দান করেন (বি,পি, পি, ভল্যুম ৩৫, পৃঃ৩৪ এবং The Afghans, পৃঃ ২২৭-২২৮। কিন্তু আবদুল করিম এ ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

৬৯। ময়মনসিংহ, পৃঃ ৫৩।

৭০। সুবর্ণ গ্রাম , পৃঃ ৯৮।

৭১। ময়মনসিংহ, পৃঃ ৫৫।

৭২। যশোহর- খুলনা, পৃঃ ৩৭।

৭৩। শাহ্‌বায খান খিযিরপুর দখল করেন ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে, ১৫৮৫ খ্রীস্টাব্দে নয় (মোগল আমল, পৃঃ ১৪২) ।

৭৪। ময়মনসিংহ, পৃঃ ৫৬ এবং যশোহর - খুলনা, পৃঃ ৩৭।

৭৫। প্রতাপাদিত্য , পৃঃ ৫১ এবং এম, এ, রহিম ঃ The Afghans, পৃঃ২২৭।

৭৬। আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ৬৪৮-৪৯।

৭৭। The Afghans, পৃঃ ২২৭ এবং মোগল আমল, পৃঃ ১৪৩।

৭৮। ডঃ হাবিবা খাতুন ঃ Journal Asiatic Society of Bangladesh, Vol. XXXI. No. 2 December 1986, " In Quest of Katrabo", পৃঃ ৩৭-৪৮।

৭৯। ডঃ হাবিবা খাতুন মত প্রকাশ করেন যে, এ রাজধানী প্রাকারাবেষ্টিত ও সুরক্ষিত ছিল। এখনও এর প্রাসাদ, হাম্মাম, দিঘি ও সমাধিস্থান বিদ্যমান আছে (সোনারগাঁয়ের ইতিহাস উৎস ও উপাদান- অধ্যাপক মোঃ

Dhaka University Institutional Repository

রেজাউল করিম ও ডঃ সৈকত আসগর সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ ১লা জুলাই ১৯৯৩, ডঃ হাবিবা খাতুনের প্রবন্ধ ঃ সোনারগাঁয়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃঃ ৩৫৭-৩৫৮)। পরবর্তীতে সোনারগাঁয়ের ইতিহাস হিসেবে উল্লিখিত।

৮০। মোগল আমল, পৃঃ ১৫৪।

৮১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০২।

৮২। H. Bengal., পৃঃ২৩৮।

৮৩। সোনারগাঁয়ের ইতিহাস, পৃঃ ৩৫৯।

৮৪। আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ৬৪৮। নারায়ণগঞ্জের অদূরে শীতলক্ষ্যা নদীর এক তীরে হাজিগঞ্জ দুর্গ, অন্যতীরে নবীগঞ্জ এবং সামান্য দূরে খিযিরপুর। খিযিরপুর বর্তমান নারায়ণগঞ্জের প্রায় ১মাইল উত্তরে অবস্থিত (মোগল আমল, পৃঃ ১৪২)।

৮৫। ওয়াকিল আহমদঃ বাংলায় বিদেশী পর্যটক, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯০, পৃঃ ১১৬।

৮৬। H. Bengal., পৃঃ২৩৮ এবং সোনারগাঁয়ের ইতিহাস, পৃঃ ৩৫৯।

৮৭। মোগল আমল, পৃঃ ১৪২।

৮৮। সোনারগাঁয়ের ইতিহাস, পৃঃ ৩৫৪-৩৫৫।

৮৯। ময়মনসিংহ, পৃঃ ৫৬ এবং মোগল আমল, পৃঃ ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় ঃ

সমসাময়িক অন্যান্য প্রতিবেশী শাসক-সর্দারদের সাথে ঈসা খানের সম্পর্ক

মুঘল বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান সংগঠক ভাটি-প্রধান ঈসা খানের সাথে প্রতিবেশী ভূঁঞা-জমিদার এবং আফগান প্রধানদের সু-সম্পর্কের কথা ইতিহাস পাঠে জানা যায়। এতদ্ভিন্ন, আরো জানা যায় যে, বাংলার পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা এবং উত্তর-পূর্বে অবস্থিত কামরূপ নামে পরিচিত কুচবিহার রাজ্যের পূর্বাংশের রাজার সাথে ঈসা খানের প্রীতি ও মিত্রতার সম্পর্ক ছিল। ঈসা খান তাঁর অসাধারণ রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী মুঘল বাদশাহ্ আকবরের বিরুদ্ধে সীমিত শক্তি নিয়ে তাঁর একার পক্ষে লড়াইয়ে সফলতা নাও আসতে পারে। এই আত্ম-উপলব্ধি থেকেই তিনি তাঁর অভীষ্ট অর্জনে সফলতা লাভের আশায় প্রতিবেশী ভূঞা-জমিদার, আফগান প্রধান এবং বাংলার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোর সাথে যথাসম্ভব মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন। ফলশ্রুতিতে প্রতিবেশী অনেক ভূঁঞা-জমিদার ও আফগান প্রধান এবং ত্রিপুরা রাজ অমর মাণিক্য ও কামরূপ রাজ রঘুদেবকে ঈসা খানের সাথে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হতে দেখা যায়। যাহোক, এ ক্ষেত্রে প্রথমে প্রতিবেশী ভূঁঞা-জমিদার এবং আফগান প্রধানদের সাথে ঈসা খানের সম্পর্কের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হলঃ

মুঘল দরবারী ঐতিহাসিক আবুল ফযল এবং ইংরেজ পরিব্রাজক রাল্‌ফ্ ফিচের বক্তব্য থেকে ঈসা খানের সাথে প্রতিবেশী ভূঁঞা - জমিদারদের সম্পর্কের স্বরূপ নির্ণয় করা যায়। আবুল ফযল আকবরনামায় ঈসা খান সম্পর্কে বলেন যে, "Isa acquired fame by his ripe judgment and deliberateness, and made the twelve zamindars of Bengal subject to himself."[১] এছাড়া রাল্‌ফ্ ফিচ্ বলেন যে, "They be all hereabouts rebels against their King Zebaldin Echebar…The chief King of all these countries is called Isacan, and he is chief of all other Kings."[২] আবুল ফযলের বক্তব্যে দেখা যায় যে, বার-ভূঁঞারা ছিল ঈসা খানের কর্তৃত্বাধীন এবং রাল্‌ফ্ ফিচের বক্তব্য অনুযায়ী ঈসা খান ছিলেন প্রধান এবং অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

রাজাদের রাজা। কিন্তু ঈসা খান এবং অন্যান্য ভূঁঞা - জমিদারদের মধ্যকার সম্পর্ক অধিরাজ ও অধীনস্থ সামন্তের মতো ছিল না, বরং তাঁরা ছিলেন মুঘল বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে পরস্পর পরস্পরের সহযোদ্ধা। তবে অন্যান্য ভূঁঞা-জমিদারদের তুলনায় ঈসা খান বিজ্ঞ,বিচক্ষণ, অধিকতম সামর্থ্যের অধিকারী এবং নিজেরও নিজের মিত্রদের স্বাধীনতার জন্য নির্ভীক ও দুর্দান্ত যোদ্ধা ছিলেন বিধায় সকলেই তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতেন, সিদ্ধান্ত মেনে চলতেন এবং তাঁকে নেতার মতো শ্রদ্ধা করতেন। ঈসা খানও তাঁদের সাহায্যে একটি মুঘল বিরোধী সামরিক জোট গঠন করেন এবং তাঁর নেতৃত্বেই ভূঁঞা - জমিদারগণ বাংলায় মুঘল প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। বস্তুতঃ ঈসা খানের বিচক্ষণতার দরুনই তাঁর মিত্র ভূঁঞা - জমিদারগণ মুঘল আগ্রাসন প্রতিরোধ করে নিজেদের জমিদারী অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এজন্যই ঈসা খানের পক্ষে অন্যান্য ভূঁঞা-জমিদারগণের উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল। বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বকালে যে সকল ভূঁঞা-জমিদারগণকে ঈসা খানের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখা যায় তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মজলিস দিলাওয়ার, মজলিস প্রতাপ, ও কেদার রায়, আফগান প্রধানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ইব্রাহিম নারাল, করিমদাদ মুসাজাই, খাজা সুলায়মান ও খাজা উসমান । এতদ্ভিন্ন , মুঘল বিদ্রোহী সেনাপতি মাসুম খান কাবুলীকেও ঈসা খানের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দেখা যায়। এখন উপরোক্ত ভূঁঞা-জমিদার ও আফগান প্রধানদের পরিচিতি ও ঈসা খানের মিত্র হিসেবে তাঁদের মুঘল বিরোধী কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হচ্ছে।

মজলিস দিলাওয়ার ও মজলিস প্রতাপ ছিলেন যথাক্রমে জোয়ানশাহী ও খালিয়াজুরী পরগনার জমিদার। ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে দায়ূদ খান কাররানীর মৃত্যুর পর তাঁরা ঈসা খানের নেতৃত্বে মুঘল বিরোধী সংগ্রামের জন্য সংঘবদ্ধ হন। ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে মুঘল সুবাহ্দার খান-ই-জাহান ভাটি আক্রমণ করলে তাঁরা উভয়েই ঈসা খানের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। ফলশ্রুতিতে ঈসা খান ও তাঁদের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে টিকতে না পেরে মুঘল বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে ভাটি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল এবং তাঁরা সকলেই নিজ জমিদারীতে নিরাপদে বহাল থাকেন।[৩] এ যুদ্ধের পর মজলিস দিলাওয়ার ও মজলিস প্রতাপের নাম আকবরনামায় আর

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায়না। তবে তাঁদের জমিদারী পরবর্তীকালে ঈসা খানের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়।

কেদার রায় ছিলেন বিক্রমপুরের জমিদার। পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় দেখা যাবে যে, ভূষণা দুর্গকে কেন্দ্র করে আফগান প্রধান খাজা সুলায়মান ও খাজা উসমানের সাথে তাঁর সংঘর্ষ হলে ঈসা খানের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্থাপিত হয় এবং আফগানরা কেদার রায়কে ভূষণা দুর্গ প্রত্যর্পণ করে। এ ঘটনার পর থেকে কেদার রায় ঈসা খানের নেতৃত্বে মুঘল বিরোধী সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জুন ভূষণা দুর্গের যুদ্ধে মুঘলদের নিকট পরাজিত ও আহত হয়ে কেদার রায় ঈসা খানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঈসা খানের মৃত্যুর পরও কেদার রায়কে ঈসা খানের পুত্র মুসা খানের সাথে একযোগে মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত তিনি বিক্রমপুরের নিকটে সংঘটিত যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আহত অবস্থায় বন্দী হন এবং বন্দী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন [৪]। তিনি কখনও মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন নি।

ইব্রাহিম নারাল ও করিমদাদ মুসাজাই এই আফগান প্রধানদ্বয় ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে ঈসা খানের জমিদারীতে অবস্থান করে এবং তাঁর সাহায্যপুষ্ট হয়ে মুঘল বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের আয়োজনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু খান-ই-জাহান ভাটি আক্রমণ করলে প্রথমেই তাঁরা মুঘলদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন[৫]। এ ঘটনার পর তাঁদের সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায়না।

খাজা উসমান ও খাজা সুলায়মান এই আফগান ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন উড়িষ্যার কতলু নুহানীর মন্ত্রী ও ভ্রাতা খাজা ঈসার পুত্র। তাঁরা মুঘল সুবাহদার মানসিংহ কর্তৃক উড়িষ্যা থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলায় আগমন করেন এবং ভূষণায় চাঁদ রায় ও তাঁর পিতা কেদার রায়ের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে চাঁদ রায়কে হত্যা করেন। পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় দেখা যাবে যে, ঈসা খানের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্থাপিত হয়। সুলায়মানকে কেদার রায়ের সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দান করা হয় এবং উসমানকে বুকাই নগরে জমিদারী দান করা হয়। এ ঘটনার পর থেকে এই আফগান প্রধান দ্বয় মুঘল বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হন এবং ভূষণা দুর্গের যুদ্ধে খাজা সুলায়মান মৃত্যুবরণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মাসুম খান কাবুলী ছিলেন বাদশাহ্ আকবরের সেনাপতি। বাংলার সুবাহ্দার মুজাফফর খান তুরবতীর সময় মুঘল সৈনিক ও সেনানায়কদের দ্বারা সংঘটিত বিদ্রোহের একজন নেতা ছিলেন মাসুম খান কাবুলী । বাদশাহ্ আকবর অন্যান্য বিদ্রোহীদের দমন করতে সক্ষম হলেও মাসুম খান কাবুলী আর মুঘল শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেন নি। তিনি বিদ্রোহীই থেকে যান এবং ভাটি প্রধান ঈসা খানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঈসা খানের আশ্রয়ে এবং সাহায্যপুষ্ট হয়ে তিনি আমরণ মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং মুঘল সুবাহ্দারদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও স্বস্থানে নিরাপদে বহাল থাকেন । পাবনা জেলার চাটমোহর কেন্দ্রী এলাকায় তাঁর জায়গীর ছিল এবং এ জায়গীরেই তিনি স্বাধীন রাজ্য গঠন করেন[৬]। মাসুম খান কাবুলী ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দের ১০ই মে তারিখে মৃত্যুবরণ করেন[৭]। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মিরযা মোমিনকে ঈসা খানের পুত্র মুসা খানের নেতৃত্বে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের শাসনামলে সুবাহ্দার ইসলাম খান চিশতীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখা যায়[৮]।

যাহোক, ইহা নিসন্দেহে বলা যায় যে, ঈসা খান ছিলেন বাংলায় মুঘল বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত স্বাধীনতাকামীদের একমাত্র নিরাপদ আশ্রয় এবং অভিভাবক। তাঁর অভিভাবকত্বেই ভূঁঞা-জমিদারগণ একদিকে যেমনি মুঘল আক্রমণের মুখেও নিজেদের জমিদারী রক্ষা করতে সক্ষম হন অন্যদিকে তেমনি অনেক অভ্যন্তরীণ গোলযোগ থেকেও নিষ্কৃতি লাভ করেন। এ সকল কারণেই ঈসা খান প্রতিবেশী-ভূঁঞা- জমিদার এবং আফগান প্রধানদের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন এবং তাঁরাও তাঁকে যথাযোগ্য সন্মানপূর্বক তাঁদের নেতৃত্বের আসনে স্থান দেন। বস্তুত ঈসা খানের সুদক্ষ পরিচালনা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণেই বাদশাহ্ আকবরের পক্ষে স্বাধীনতাকামী ভূঁঞা-জমিদারদেরকে বশীভূত করা এবং সারা বংলায় মুঘল কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি।

উপরোক্ত ভূঁঞা-জমিদার এবং আফগান প্রধানগণ ছাড়াও ঈসা খানের সমসাময়িক আরো অনেক ভূঁঞা-জমিদারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্যরা হচ্ছেন যশোহরের জমিদার প্রতাপাদিত্য, তালিপাবাদ পরগনার জমিদার টিলা গাযী, ভাওয়ালের জমিদার বাহাদুর গাযী, ভুলুয়ার জমিদার লক্ষ্মণ মাণিক্য, ফতেহাবাদের জমিদার মুকুন্দরায় এবং বাকলার জমিদার কন্দর্পনারায়ণ[৯]। কিন্তু এদের মধ্যে কাউকেই স্বদেশের স্বাধীনতা

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষার্থে মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে দেখা যায়না, অন্ততঃ আকবরনামায় এ ধরণের কোন উল্লেখ পাওয়া যায়না। এমনকি এদের মধ্যে কোন কোন ভূঁঞা-জমিদারকে প্রত্যক্ষ ভাবে মুঘলদের পক্ষাবলম্বন করতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই তালিপাবাদের জমিদার টিলা গাযীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। টিলা গাযী ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে মুঘল সুবাহদার খান-ই-জাহানের ভাটি অভিযানের সময় প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন বলেই মুঘল বাহিনী নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল[১০]। এছাড়া ভাওয়ালের গাযী পরিবারে প্রাপ্ত একখানা সনদের ভিত্তিতে জানা যায় যে, বাহাদুর গাযী বাদশাহ্ আকবরকে বার্ষিক ৪৮৩৭৯ টাকা ব্যয়ে ৩৫ খানি সুন্দর ও কোশা জাতের যুদ্ধ - নৌকা প্রদানে স্বীকৃত হয়ে ভাওয়াল পরগনার জমিদারী লাভ করেন[১১]। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সমসাময়িক ভূঁঞা-জমিদারদের মধ্যে একমাত্র ঈসা খানই স্বদেশ-ভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থে পরাক্রমশালী বাদশাহ্ আকবরে বিরুদ্ধে দৃঢ় হস্তে অস্ত্র ধারণ এবং এই স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করেন। উক্ত ভূঁঞা-জমিদারদের সাথে ঈসা খানের কিরূপ সম্পর্ক ছিল তা জানা না গেলেও এতটুকু জানা যায় যে, ঈসা খান যশোহরের জমিদার প্রতাপাদিত্যের দরবারে বহু আচার - অনুষ্ঠানাদিতে সন্মানিত অতিথিরূপে যোগদান করতেন[১২]। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সমসাময়িক ভূঁঞা-জমিদারগণ ঈসা খানকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

দূরদর্শী ঈসা খান মুঘলদের বিরুদ্ধে স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে একদিকে যেমনি স্বদেশের ভূঁঞা- জমিদার ও আফগান প্রধানদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে তাদেরকে স্বীয় প্রভাব - বলয়ের অধীনে আনয়নে সক্ষম হন অন্যদিকে তেমনি বাংলার প্রতিবেশী ত্রিপুরা রাজ ও কামরূপ রাজের সাথেও সুসম্পর্ক স্থাপন করেন; যাতে বিপদের দিনে তাঁদের নিকট থেকে প্রয়োজনবোধে সাহায্য - সহযোগিতা নিতে পারেন। ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালা পাঠে জানা যায় যে, ত্রিপুরা রাজ অমর মাণিক্য (১৫৭৭-১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দ) ১৫০০ শকে বা ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে দীঘি খনন করার জন্য বাংলার ভূঁঞা- জমিদারদের নিকট শ্রমিক পাঠাবার অনুরোধ জানালে ঈসা খান এতে সাড়া দেন। এ আহ্বানে সাড়া দেয়ার যথেষ্ট কারণও ছিল। ইহা সর্বজনবিদিত যে, বাংলার সৈয়দ বংশীয় সুলতানদের শাসনামল থেকেই চট্টগ্রামের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে বাংলার শাসক ও ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষের পর সংঘর্ষ হতে থাকে। এমন কি বাংলার সূর আফগান ও কারারানী আফগান

Dhaka University Institutional Repository

শাসনামলেও ত্রিপুরা রাজের সাথে সংঘর্ষ হয়। ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দে দায়ূদ খান কারারানীর সাথে ত্রিপুরা রাজ উদয় মাণিক্যের যুদ্ধ হলে ঈসা খান এ যুদ্ধে দায়ূদ কারারানীকে সাহায্য করেছিলেন[১৭]। যাহোক, ইহা প্রতীয়মান হয় যে, সুদীর্ঘ দিন থেকেই বাংলার সাথে ত্রিপুরার শত্রুতার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু একদিকে ত্রিপুরা রাজ উদয় মাণিক্যের মৃত্যু হয় এবং অমর মাণিক্য রাজা হন, এ অমর মাণিক্যের সাথে বাংলার শাসকের কোন সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া যায় না,অন্যদিকে ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে মুঘলদের হাতে বাংলার কারারানী আফগান শাসনের অবসান ঘটে এবং বাংলার ভূঁঞা-জমিদারদের অনেকেই মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, এরূপ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ঈসা খান বাংলার সাথে ত্রিপুরার পূর্ব শত্রুতার কথা ভুলে গিয়ে ত্রিপুরা রাজের সাথে নতুন করে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন বলেই তিনি অমর মাণিক্যের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। এতদ্ভিন্ন, পিছনে শত্রু রেখে মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকে তিনি বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন নি বিধায় দীঘি খননের জন্য ত্রিপুরা রাজকে ১০০০ শ্রমিক দিয়ে সাহায্য করেছিলেন[১৮]। ত্রিপুরা রাজের মতো একজন স্বাধীন রাজ্যের রাজাকে শ্রমিক দিয়ে সাহায্য করে তাঁর সাথে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন নিঃসন্দেহে দেশের বাইরেও ঈসা খানের ভাব-মূর্তিকে অনেক উজ্জ্বল করেছিল।

কামরূপের রাজা রঘুদেবের সাথেও ঈসা খানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় দেখা যাবে যে, ঈসা খান মুঘলদের দৃষ্টি ভাটি থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে মুঘল বাহিনীকে কুচবিহারের দিকে ব্যতিব্যস্ত রাখার সুযোগ খুঁজছিলেন। অন্যদিকে কুচবিহার রাজ্যের রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ ও তাঁর পিতৃব্য পুত্র রঘুদেবের মধ্যে গৃহবিবাদ দেখা দিলে রঘুদেব ঈসা খানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি রঘুদেবের প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করেন। ফলশ্রুতিতে ঈসা খান ও রঘুদেবের মধ্যে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সুধীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য এ সম্পর্কে বলেন যে, "...the new alliance was purely defensive in character."[২০] যাহোক, ঈসা খানের সহায়তায় রঘুদেব একাধিকবার লক্ষ্মী নারায়ণের উপর আক্রমণ চালায় এবং এতে কিছুটা সফলতাও অর্জন করে। দেখা যায় যে, রঘুদেব লক্ষ্মী নারায়ণের নিকট থেকে বাহিরবন্দ পুনর্দখল করে নেন[২১]। অন্যদিকে লক্ষ্মী নারায়ণ রঘুদেব কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে মুঘল সুবাহ্‌দার মানসিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তিনিও লক্ষ্মী নারায়ণকে সাহায্য করার জন্য কুচবিহার রাজ্যে ছুটে যান। এ ভাবে মুঘল বাহিনী একাধিক বার লক্ষ্মী নারায়ণের সাহায্যার্থে কুচবিহার গিয়ে রঘুদেবের

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ১৫৯৭ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মে প্রচন্ড সংঘর্ষের পর রঘুদেব মুঘল বাহিনীর নিকট পরাজিত হন। এ সময় ঈসা খান রঘুদেবের সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে মানসিংহ জলে ও স্থলে ঈসা খানের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন[৭]। ফলশ্রুতিতে সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ঈসা খান তাঁর মিত্র রঘুদেবকে সাহায্য করতে পারেন নি। তবে ঈসা খানের উদ্দেশ্য অনেকাংশেই সফল হয়েছিল। কেননা মুঘল বাহিনী কুচবিহারে ব্যস্ত থাকার কারণে প্রায় এক বছর পর্যন্ত সরাসরি ভাটি আক্রমণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়েছিল। যাহোক, কামরূপ রাজ রঘুদেবের সাথে মিত্রতার সম্পর্ক নিঃসন্দেহে বাংলার বাইরেও ঈসা খানের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছিল।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ঈসা খান এমন একজন উঁচুদরের বিচক্ষণ ও কূটনৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন রাজনীতিক ছিলেন, যিনি একদিকে যেমনি স্বদেশের সমসাময়িক ভূঁঞা - জমিদার ও আফগান প্রধানদের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি পার্শ্ববর্তী রাজ্য ত্রিপুরারাজ ও কামরূপ রাজের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন মিত্র ছিলেন। এক কথায় বলা যায় যে, ঈসা খান তাঁর শক্তি ও সামর্থ্যের কারণে স্বীয় রাজ্য ও প্রতিবেশী শাসকদের কাছে সমভাবে সন্মানীয় ছিলেন।

তথ্য নির্দেশ

১। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ৬৪৮।

২। বি, পি, পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ ২৩।

৩। এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

৪। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ১২১৪ - ১৫, ১২৩৫ -৩৬ এবং মোগল আমল, পৃঃ ১৫৮-১৫৯।

৫। ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে খান- ই- জাহানের ভাটি অভিযান সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

৬। বি, পি,পি, ভল্যুম ৩৫, পৃঃ ৩৪ এবং মোগল আমল, পৃঃ৪৯।

৭। আকবর নামা ৩য় ,পৃঃ ১১৩০।

৮। মোগল আমল, পৃঃ ৪৯ এবং সুবাহদার ইসলাম খান চিশতীর সাথে মুসা খানের নেতৃত্বাধীন বার- ভূঁঞাদের প্রতিরোধ সংগ্রামের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন পৃঃ ১৭৩-২১২।

৯। উক্ত ভূঁঞা - জমিদারদের সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন বি, পি, পি, ভল্যুম ৩৫, পৃঃ ৩৩-৩৯, J.A.S.B 1874, পৃঃ ১৯৭-২১৪ এবং মোগল আমল ,পৃঃ ৪৭-৫৪।

১০। আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ৩৭৭।

১১। বি, পি, পি, ভল্যুম ৩৫,পৃঃ ৩৫।

১২। The Afghans, পৃঃ ২২৮।

১৩। সৈয়দ বংশীয় সুলতান আলা-আল-দীন হুসাইন শাহ্ ও তাঁর পুত্র নুসরাত শাহের সাথে ত্রিপুরা রাজ ধন্যমাণিক্য ও তাঁর পুত্র দেবমাণিক্যের সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন সুলতানী আমল, পৃঃ ৩০১-৩১৩,৩২৮ এবং Journal of the Asiatic society, Letters, Vol XVIII, No. I, 1952, পৃঃ ২১-৩০ এবং The Afghans, পৃঃ২২৬।

১৪। কালী প্রসন্ন সেন, পৃঃ ৮৮-৮৯ এবং ১২৮-১৩৫।

১৫। Frontier Policy, পৃঃ ১১৯ এর পাদটীকা।

১৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯।

১৭। আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ১০৬৬-৬৮, ১০৮১ -৮২ এবং ১০৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ মুঘলদের বিরুদ্ধে ঈসা খানের সংগ্রাম

ভাগ১ - উত্তর ভারতে মুঘলদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ ঃ

ভারত উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে তিনটি অধ্যায় পরিলক্ষিত হয়। প্রথম অধ্যায় হচ্ছে ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জহীর উদ্দিন মুহম্মদ বাবর কর্তৃক আফগান এবং রাজপুত শক্তিকে দমন করে উত্তর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন । দ্বিতীয় অধ্যায় হচ্ছে ১৫৩০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাবরের পুত্র হুমায়ূনের শাসন, হুমায়ূন কর্তৃক মালব, গুজরাট ও বাংলা দখলের ব্যর্থ চেষ্টা এবং পরিশেষে আফগান নেতা শের শাহ্ কর্তৃক ভারত থেকে বিতাড়ন। ফলে শের শাহের নেতৃত্বে ভারতে আফগান শক্তির পুনরুত্থান ঘটে। তৃতীয় অধ্যায় হচ্ছে ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত হুমায়ূন কর্তৃক উত্তর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং হুমায়ূনের পুত্র আকবর কর্তৃক এর সুদৃঢ়করণ[১]। এ তৃতীয় অধ্যায়েই আকবর বাংলায় মুঘল শাসনের গোড়াপত্তন করেন। কিন্তু বাংলায় মুঘল শাসন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের শাসানামলে । যাহোক, বর্তমান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে উত্তর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস উপস্থাপন করা।

ইহা সর্বজন বিদিত যে, ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই মে আফগান সুলতান শের শাহের নিকট কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মুঘল বাদশাহ্ হুমায়ূন শেষ পর্যন্ত ভারত বর্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অতপর হুমায়ূন প্রায় পনর বছর পর্যন্ত যাযাবরের জীবন যাপন করেন[২]। যাহোক, বিল গ্রামের যুদ্ধে জয় লাভ করে শের শাহ্ ভারত বর্ষে মুঘল শাসনের স্থলে পুনঃরায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শের শাহ্ শান্তিপূর্ণ ভাবে এবং গৌরবের সাথে ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারত বর্ষ শাসন করার পর মৃত্যুবরণ করেন[৩]। কিন্তু শের শাহের মৃত্যুর পর আফগানরা পুনঃরায় অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ্ পিতৃ সাম্রাজ্যের অখন্ডতা রক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

করতে সক্ষম হলেও তাঁর মৃত্যুর পর একদিকে আফগানদের মধ্যকার এ অন্তর্দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে এবং অন্যদিকে মুঘলরা আফগানদের এ আত্মকলহের সুযোগ নিয়ে হুমায়ুনের নেতৃত্বে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় লিপ্ত থেকে শেষ পর্যন্ত আফগানদের নিকট থেকে ভারতের রাজদন্ড পুনঃরায় ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়।

১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে মে শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র জালাল খান ইসলাম শাহ্ উপাধি ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও পিতার ন্যায় একজন দক্ষ শাসক ছিলেন। কিন্তু ১৫৫৩ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর ইসলাম শাহ্ মৃত্যুবরণ করলে আফগান সাম্রাজ্যে বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং সূর সাম্রাজ্য পতনের দিকে ধাবিত হয়[৪]। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর ১২ বছর বয়স্ক পুত্র ফিরূয সিংহাসনে আরোহণের তৃতীয় দিনেই তাঁর মাতুল মুবারিয খান কর্তৃক নিহত হন[৫]। মুবারিয খান সুলতান মুহম্মদ আদিল শাহ্ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু আদিলের পক্ষে দুর্দান্ত আফগান অমাত্যদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়নি। অল্পকালের মধ্যেই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন আফগান প্রধানরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অধিকাংশ সমসাময়িক ঐতিহাসিকের মতে আদিল কর্তৃক ফিরূযকে হত্যা ও অন্যায়ভাবে সিংহাসন দখল, অন্ত্যজ হিন্দু হিমুকে সালতানাতের সর্বোচ্চ পদে নিয়োগ দান, আফগান প্রধানরা একজন হিন্দুর কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় এবং আফগানদের প্রতি হিমুর উদ্ধত ব্যবহারই ছিল আফগান সাম্রাজ্যে ব্যাপক বিদ্রোহের কারণ[৬]। অল্পকালের মধ্যেই বাংলা ও মালব আদিলের হস্তচ্যুত হয়। এমনকি তাঁর আত্মীয়রাও বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং শের শাহের দু'জন Nephew- ইব্রাহিম খান সূর ও সিকান্দর খান সূর (আহমদ খান সূর) আফগান সিংহাসনের প্রতি তাঁদের দাবী উত্থাপন করে[৭]। ইব্রাহিম খান সূর কালপির নিকট সংঘটিত যুদ্ধে আদিলের সেনাপতি ঈসা খান নিয়াজীকে পরাজিত করে দিল্লী, আগ্রা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল করে নেয়[৮]। কিন্তু অল্পকাল পরেই সিকান্দর খান সূর ফাররাহ নামক স্থানে সংঘটিত যুদ্ধে ইব্রাহিম খান সূরকে পরাজিত করে দিল্লী ও আগ্রা দখল করে নেয়[৯]।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে হুমায়ূন সর্বদা আফগান সাম্রাজ্যের বিশৃংখল পরিস্থিতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি অব্যাহত রেখেছিলেন। ইসলাম শাহের জীবদ্দশায় তিনি ভারত আক্রমণের সাহস না করলেও এক্ষণে ইসলাম শাহের মৃত্যু সংবাদ, আদিলের দুর্বল শাসন এবং আফগানদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল তাঁকে হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারে উৎসাহিত করে। ১৫৫৪ খ্রীস্টাব্দের ১২ই নভেম্বর হুমায়ূন কাবুল থেকে ভারত আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন[১০]। গৃহযুদ্ধে ব্যস্ত থাকার কারণে আফগানরা ভারতের উত্তর - পশ্চিম সীমান্তের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অবহেলা প্রদর্শন করে। এ সুযোগে হুমায়ূন বিনা বাধায় সিন্ধু নদ অতিক্রম করে রোহ্‌তাস দুর্গ আক্রমণ করেন। সিকান্দর খান সূরের পাঞ্জাবের গভর্ণর তাতার খান কাসি কোনরূপ প্রতিরোধ ব্যতিরেকেই পলায়ন করে। ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দের ২৪ শে ফেব্রুয়ারী সামান্য যুদ্ধের পরই আফগানরা মুঘলদের হস্তে লাহোর ছেড়ে দেয়। দিপালপুর থেকেও আফগান সেনানায়ক শাহ্‌বায খান ও নাসির খান ভীত - সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করে। অবশেষে ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দের ২২শে জুন সিরহিন্দের যুদ্ধে সিকান্দর খান সূর মুঘল বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে সিওয়ালিক পর্বতমালার দিকে পলায়ন করলে ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দের ২০ শে জুলাই ১৫ বছর পর পুনরায় রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ করেন হুমায়ূন[১১]। অতপর হুমায়ূন আগ্রা এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহ দখল করেন। তাঁর সেনানায়ক হায়দার মুহম্মদ খান আতকা বিয়ানা অবরোধ করলে ইব্রাহিম খান সূরের পিতা গাযী খান আত্মসমর্পণ করেন এবং মুঘল সেনানায়ক কর্তৃক নিহত হন[১২]। যাহোক, হুমায়ূন সবে মাত্র হৃত সাম্রাজ্যের কিয়দংশ পুনরুদ্ধার করেছিলেন বটে, কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার পূর্বেই ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দের ২৮ শে জানুয়ারী মৃত্যুবরণ করেন[১৩]।

হুমায়ূনের মৃত্যুর পর ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী পাঞ্জাবের কালানৌর নামক স্থানে তাঁর পুত্র জালাল উদ্দিন মুহম্মদ আকবরের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হয়[১৪]। কিন্তু ভারত বর্ষের উপর মুঘল কর্তৃত্ব তখনও সুদূর পরাহত ছিল। প্রকৃতপক্ষে ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে ভারত বর্ষে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ও জটিল পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল। দেশ যখন একদিকে শের শাহের উত্তরাধিকারীদের মূর্খতা ও আত্মকলহের ফলে শের শাহের সংস্কার সমূহের সুফল ভোগ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

বঞ্চিত হচ্ছিল তখন অন্যদিকে দেশ ভয়ানক দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। শুধু তাই নয়, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রত্যেকটি স্বাধীন রাজ্য তখন ক্ষমতার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়[১৫]। এ সময় উত্তর - পশ্চিম দিকে আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মীর্যা মুহম্মদ হাকিম প্রায় স্বাধীনভাবেই কাবুল শাসন করছিলেন। উত্তর দিকে কাশ্মীর স্থানীয় মুসলিম বংশের অধীনে স্বাধীন ছিল এবং হিমালয় অঞ্চলের রাজ্যগুলোও স্বাধীন ছিল। সিন্ধু ও মুলতান শের শাহের মৃত্যুর পরেই দিল্লীর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। উড়িষ্যা, মালব এবং গুজরাট এবং গন্ডোয়ানার (মধ্য প্রদেশের) স্থানীয় প্রধানরাও স্বাধীন ছিল। বিন্ধ্যা পর্বতের দক্ষিণে দক্ষিণ ভারতের হিন্দু বিজয় নগর রাজ্য এবং খান্দেশ, বেরার, বিদর, আহমদ নগর ও গোলকুন্ডা প্রভৃতি মুসলিম রাজ্যগুলো উত্তর ভারতের রাজনীতিতে তখন কোন প্রকার উৎসাহবোধ করতোনা বললেই চলে। এসময় পর্তুগীজরাও গোয়া এবং দিউ অধিকার করে পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের উপর নিজেদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্থাপন করে। মৃত্যুর পূর্বে হুমায়ূন তাঁর হৃতরাজ্যের কিয়দংশই পুনর্দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তখনও শের শাহের সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল সূর আফগানদের অধীনে ছিল[১৬]।

যাহোক, হুমায়ূনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আদিল দিল্লী ও আগ্রা দখলের জন্য হিমুকে প্রেরণ করেন। অতপর হিমু তারদী বেগের নেতৃত্বাধীন মুঘল বাহিনীকে পরাস্ত করে ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে দিল্লী অধিকার করে নেয়[১৭]। কিন্তু হিমুর এ বিজয় দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। কেননা ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দের ৫ই নভেম্বর আকবর পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুকে পরাজিত করে বন্দী করেন এবং হিমু বৈরাম খান কর্তৃক নিহত হন[১৮]। এ যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে আকবর মুঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধ ছিল এক চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুঘলদের জয়লাভের ফলে, আফগানদের ভারতে প্রভুত্ব লাভের আশা চিরতরে নির্বাপিত হয় এবং ভারতে প্রাধান্য স্থাপনের জন্য মুঘল- আফগান দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে[১৯]।

পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে আফগানরা পাঞ্জাব থেকে আগ্রা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের উপর থেকে কর্তৃত্ব হারায়। তবে তখনও পাঞ্জাবের সিওয়ালিক

Dhaka University Institutional Repository

পর্বতমালা, সম্বল, আলোয়ার ও মেওয়াট, লক্ষ্ণৌ ও গোয়ালিয়র থেকে বাংলার সীমান্ত পর্যন্ত অঞ্চল, বাংলা, মালব প্রভৃতি অঞ্চল যথাক্রমে সিকান্দর খান সূর, রুকন খান নুহানী, হাজী খান, আদিল, বাজবাহাদুর, গিয়াস আল-দীন বাহাদুর প্রমুখ আফগানদের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। এক কথায় বলা যায় পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভের ফলে আকবর ভারত বর্ষের যতটুকু অংশের উপর মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন তখনও এর দ্বিগুণ বিস্তৃত ভূখন্ড আফগানদের অধীনে ছিল। পানি পথের বিপর্যয়ের পরেও আফগানদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা পরিস্থিতির পুনরুদ্ধার সম্ভব ছিল[২০]। কিন্তু তাদের দলাদলির কারণে আফগানরা ভারতে আফগানদের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারেনি। আফগান জাতির চরম দুর্দশার দিনেও তাঁরা একে অপরের সাথে সংঘর্ষ অব্যাহত রাখে এবং এই ভাবেই নিজেরা নিজেদের কবর রচনা করে[২১]। পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুর পরাজয়ের সুযোগে বাংলার গিয়াস আল-দীন বাহাদুর বিহার দখল করে নেন এবং পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আদিলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ১৫৫৭ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে গিয়াস আল-দীন বাহাদুর শাহ্ সুরুজগড়ের অদূরে ফতেহপুর নামক স্থানে আদিল কে পরাজিত ও হত্যা করেন। আফগানদের মধ্যকার এ আত্মকলহ আকবরের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনে। কেননা তাঁর আফগান শত্রুরা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে এবং একে অপরকে হত্যা করে উত্তর ভারতে মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয়[২২]। এ সুযোগে আকবর ১৫৫৭ খ্রীস্টাব্দে পাঞ্জাবের সিওয়ালিক পর্বতমালার সিকান্দর খান সূর, আলোয়ার ও মেওয়াটের হাজী খান এবং সম্বলের রুকন খান নুহানীকে এবং অন্যান্য আফগানদেরকে পরাস্ত করে সম্বল থেকে লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত দখল করে নেন।[২৩] অন্য দিকে ইব্রাহিম খান সূরও মুঘল সেনাপতি খান-ই-যামানের নিকট পরাজিত হয়ে উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। ১৫৫৮ খ্রীস্টাব্দে খান-ই-যামান জৌনপুর দখল করে নেয়।[২৪] এর পরও অন্যান্য আফগান প্রধানরা উত্তর ভারত পুনর্দখলের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। কিন্তু ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দে খান-ই-যামানের নিকট আদিলের পুত্র দ্বিতীয় শের শাহ্ এবং ইসলাম শাহের পুত্র আওয়ায খান পরাজিত হওয়ার পর আফগানরা মুঘলদের বিরুদ্ধে আর কোন সুপরিকল্পিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি।[২৫] এক কথায় বলা যায় উত্তর ভারতে মুঘল শক্তির বিরোধিতা করার

Dhaka University Institutional Repository

মতো সূর আফগানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আর কেউই অবশিষ্ট ছিলনা। অতঃপর আফগানরা ভারতে তখনও তাদের যেটুকু অধিকার অবশিষ্ট ছিল সেটুকু সংরক্ষণে মনোনিবেশ করে।উত্তর ভারত হাতছাড়া হওয়ার পরও পূর্ব ভারত আফগানদের অধিকারে ছিল।[২৬] পূর্ব ভারতের বাংলা ও বিহার ভারতীয় আফগানদের ক্ষমতার সর্বশেষ কেন্দ্র স্থলে পরিণত হয়।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মুঘল বাদশাহ্ হুমায়ূন আফগান সুলতান শের শাহের নিকট ভারতের রাজদন্ড ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়ে ছিলেন।কিন্তু শের শাহ্ ও তাঁর পুত্র ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর আফগানরা পুনরায় আত্মকলহে লিপ্ত হওয়ার ফলে আফগান সাম্রাজ্যে বিশৃংখলা দেখা দিলে সে সুযোগে হুমায়ূন হৃতরাজ্যোর কিয়দংশ পুনর্দখল করতে সক্ষম হন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে হুমায়ূন মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার সুযোগে আফগানরা উত্তর ভারত পুনর্দখলের চেষ্টা করলেও ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে মুঘল বাদশাহ্ আকবর পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে সূর আফগান সুলতান আদিল শাহের সেনাপতি হিমুকে পরাস্ত করে আফগানদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। অতঃপর আকবর বিবদমান আফগান প্রধানদেরকে পরাস্ত করে ক্রমে ক্রমে উত্তর ভারতের উপর মুঘল সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন এবং স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সু-প্রতিষ্ঠিত করে সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন।

ভাগ ২ - আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার কার্যক্রমঃ একটি সাধারণ সমীক্ষা ঃ

বাদশাহ্ আকবর ছিলেন সন্দেহাতীত ভাবে একজন শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী স্বভাব সম্পন্ন নরপতি। তাঁর অভিলাষ ছিল নিজেকে ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এ উদ্দেশ্যেই আকবর ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্যের স্বাধীনতা বিনাশ সাধনের কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং ১৬০১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আসীর গড় দুর্গ জয় না করা পর্যন্ত তিনি তাঁর এ সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি অব্যাহত রাখেন।[২৭] যুদ্ধ বিগ্রহে উৎসাহী সাম্রাজ্যবাদী

Dhaka University Institutional Repository

আকবর স্বয়ং ঘোষণা করেন যে, "একজন রাজা কে সর্বদা বিজয়ে দৃঢ় সংকল্পিত থাকা উচিত, অন্যথায় তাঁর প্রতিবেশীগণ তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে"।[২৮] অর্থাৎ রাজা মাত্রেরই প্রতিবেশী রাজ্য জয়ে সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন, অন্যথায় প্রতিবেশী রাজগণ কর্তৃক তাঁর নিজ রাজ্যই আক্রান্ত হবে। যাহোক, আকবর ১৫৬০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর অভিভাবক বৈরাম খান এবং ১৫৬২ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের মধ্যে তাঁর ধাত্রী মাতা মাহম আনগা ও তাঁর পুত্র আদম খান এবং অন্যান্যদের প্রভাব বলয় থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হন[২৯]। অতপর তিনি স্বহস্তে সাম্রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করেন এবং সাম্রাজ্য বিস্তার কার্যক্রম আরম্ভ করেন।

পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর ১৫৫৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে গোয়ালিয়র, আজমীর এবং জৌনপুর মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়[৩০]। বৈরাম খানের পতনের পর ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দে আকবর আদম খান এবং পীর মুহম্মদ সরওয়ানীর নেতৃত্বে মালবের বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। এ মুঘল বাহিনী বাজ বাহাদুরকে পরাজিত করে মালব দখল করে নেয়। কিন্তু ১৫৬২ খ্রীস্টাব্দে মুঘল বাহিনীকে পরাজিত করে বাজ বাহাদুর পুনরায় মালব দখল করে নেন । এর অব্যবহিত পরেই আকবর আবদুল্লাহ খান উজবেগকে মালবে প্রেরণ করেন। এমতাবস্থায় শক্তিশালী মুঘল বাহিনীকে প্রতিরোধ করা সাধ্যাতীত হওয়ার কারণে বাজ বাহাদুর কোনরূপ যুদ্ধ ব্যতিরেকেই মালব ত্যাগ করেন[৩১]।

১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে আকবর কারা ও পূর্ব প্রদেশের শাসনকর্তা আসফ খানকে মধ্য প্রদেশের উত্তরাঞ্চলের গন্ডোয়ানা রাজ্য বিজয়ে প্রেরণ করেন। জব্বলপুর জেলার গারাহ এবং মানডালার মধ্যবর্তী স্থানে সংঘটিত যুদ্ধে রানী দুর্গাবতী ও তাঁর নাবালক পুত্র রাজা বীর নারায়ণ পরাজিত হলে মুঘলদের হস্তে গন্ডোয়ানা রাজ্যের পতন ঘটে [৩২]।

১৫২৭ খ্রীস্টাব্দে খানুয়ার যুদ্ধে বাবরের হস্তে পরাজিত হলেও ভারতের রাজপুত শক্তি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়নি। ভারতীয় রাজনীতিতে রাজপুতদের অসামান্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব লক্ষ্য করে উদার নীতিতে বিশ্বাসী এবং রাজনীতিতে দূরদর্শী সাম্রাজ্যবাদী বাদশাহ্ আকবর ভারতে স্বীয় বংশের জন্য একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজে রাজপুতদের যথাযথ মূল্য উপলব্ধি করেন। এতদঅনুসারে আকবর তাঁর সকল কর্মকান্ডে রাজপুতদের সক্রিয় সহযোগিতা নিরাপদ ও নিশ্চিতকরণে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করেন। আকবর তাঁর বিচক্ষণ ও উদারনীতির দ্বারা রাজপুতদের মধ্যে অনেকেরই হৃদয় জয় করে তাদের সক্রিয় সমর্থন ও অকৃত্রিম সহযোগিতা লাভে সক্ষম হন। ১৫৬২ খ্রীস্টাব্দে অম্বরের রাজপুত রাজা বিহারীমল আকবরের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে মুঘল বাদশাহের নিকট নিজ কন্যার বিবাহ দিয়ে মুঘলদের সাথে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হন। শুধু তাই নয় রাজা বিহারী মল , তাঁর পুত্র ভগবান দাস এবং তাঁর পৌত্র মানসিংহ আকবরের সেনাবাহিনীতে চাকুরী গ্রহণ করে[৩৩]। কিন্তু মেওয়ারের রাজা উদয় সিংহ মুঘলদের বশ্যতা স্বীকারে সর্বপ্রকার অনীহা প্রকাশ করে। ফলে ১৫৬৭ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে আকবর চিতোর দুর্গ অবরোধ করেন। উদয় সিংহ রাজধানী ত্যাগ করে পর্বতের দিকে পলায়ন করেন। কিন্তু উদয় সিংহের দু'জন সাহসী অনুসারী জয়মল্ল ও পাট্টা ১৫৬৭ খ্রীস্টাব্দের ২০ শে অক্টোবর থেকে ১৫৬৮ খ্রীস্টাব্দের ২৩ শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত দীর্ঘ চার মাস মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করেন। জয় মল্ল ও পাট্টার মৃত্যুর সাথে সাথেই চিতোর দুর্গ মুঘলদের অধিকারে চলে আসে[৩৪] ।

চিতোরের পতনে অন্যান্য রাজপুত রাজগণের মধ্যে ভয়ংকর ভীতির উদ্রেক করে। ফলে অনেকেই আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। ১৫৬৯ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রণথম্ভোরের রায় সুরজনহারা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে মুঘল চাকুরী গ্রহণ করে। একই বছর বুন্দেলখন্ডের কালিঞ্জরের প্রধান রাজা রামচান্দ মুঘলদের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়। ১৫৭০ খ্রীস্টাব্দে বীকানীর ও জয়সলমীরের রাজগণ শুধু বশ্যতাই স্বীকার করেননি বরং তাঁদের কন্যাদের সাথে বাদশাহ্ আকবরের বিবাহ সম্পন্ন করেন[৩৫] ।

এভাবে একের পর এক রাজপুত প্রধানরা মুঘল আধিপত্য স্বীকার করে নিলেও তখনও মেওয়ার মুঘল কর্তৃত্ব প্রত্যাখান করে। পিতৃ পুরুষদের রাজধানী চিতোর

Dhaka University Institutional Repository

হস্ত চ্যুত হওয়ার পরও উদয় সিংহ তাঁর স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখেন। ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মার্চ উদয় সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রাণা প্রতাপসিংহ রাজপুত নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনিও মুঘল কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাদশাহ্ আকবর অম্বরের মানসিংহ ও আসফ খানকে প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। হলদিঘাট নামক স্থানে সংঘটিত যুদ্ধে প্রতাপসিংহ মুঘলদের নিকট পরাস্ত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে পর্বতারণ্যে আত্মগোপন করলে মুঘলরা তাঁর দুর্গ গুলো একের পর এক দখল করে নেয়। কিন্তু চরম দুঃখ দুর্দশা ও লাঞ্চনার মধ্যেও তিনি আত্মসমর্পণের কথা চিন্তা করেন নি। আশ্রয়হীন ভাবে পর্বতারণ্যের স্থান হতে স্থানান্তরে মুঘল সেনাবাহিনী কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হয়েও হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় রত থাকেন । ১৫৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী মৃত্যুর পূর্বে তিনি কয়েকটি দুর্গ পুনরধিকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রতাপের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অমর সিংহ পিতার আদেশ-নির্দেশ চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে মানসিংহের নেতৃত্বাধীন মুঘল আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার পরও পরাজিত হন। অসুস্থতার কারণে আকবর মেত্তয়ারের বিরুদ্ধে আর কোন অভিযান প্রেরণ করতে পারেন নি[৩৩]।

১৫৬৯ খ্রীস্টাব্দে রণথম্ভোর ও কালিঞ্জর দখলের পর মুঘল বাহিনী গুজরাট অধিকার করতে প্রবৃত্ত হয়। ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দে স্বয়ং বাদশাহ্ আকবর গুজরাটের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং অতিসহজেই তৃতীয় মুজাফফর শাহ্কে পরাজিত করে গুজরাট অধিকার করেন। অতপর ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী সুরাট দখল করে রাজধানী ফতেহ্পুর সিক্রিতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই নব অধিকৃত রাজ্য গুজরাটে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর আহমেদাবাদের নিকট যুদ্ধে বিদ্রোহীদেরকে সম্পূর্ণরূপে দমন করে গুজরাটে স্বীয় প্রভুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন[৩৪]।

এভাবে বাদশাহ্ আকবর আফগানদেরকে পরাস্ত করে উত্তর ভারতের উপর মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাজপুত শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত নিরাপদ ও নিশ্চিত করতে সক্ষম হন।

অতপর তিনি পূর্ব ভারতীয় তথা বাংলা - বিহারের আফগান সালতানাতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

ইহা সর্বজনবিদিত যে, ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ের ফলে আফগানরা ভারতের রাজদন্ড মুঘলদের নিকট ছেড়ে দেয়ার পর শের শাহ্ পুনরায় মুঘলদের নিকট থেকে ভারতের শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হন। এখানে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে, শের শাহের নেতৃত্বে ভারতে আফগান শক্তির পুনরুত্থানের সময় শের শাহ্ প্রথমে পূর্ব ভারত বিশেষতঃ বাংলার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল বলেই বাংলাকে পুঁজি করে তিনি দিল্লীর উপরও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, শের শাহ্ ও ইসলাম শাহের মৃত্যুর পরে আফগানরা উত্তর ভরত থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরও পূর্ব ভারতে তাদের শক্তি শালী ঘাঁটি ছিল। কিন্তু পূর্ব ভারত তথা বাংলা ও বিহারের উপর থেকে কর্তৃত্ব হারানোর সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক গগন থেকে আফগানদের বিচ্যুতি ঘটেছিল। অন্যদিকে মুঘলরা আফগানদের নিকট থেকে উত্তর ভারতের কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিলেও বাংলা কেন্দ্রিক পূর্ব ভারতীয় আফগান সালাতানাত তখনও ভারতে মুঘল সার্বভৌমত্বের প্রতি বিরাট হুমকী স্বরূপ ছিল। পূর্ব ভারত তথা বাংলা-বিহারের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যবাদী বাদশাহ্ আকবর সমগ্র-ভারত বর্ষের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার গৌরব অর্জন করতে পারেন নি। সুতরাং বলা যায় যে, আফগান ও মুঘল উভয় জাতির নিকট বাংলার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বাংলার এ রূপ গুরুত্বের প্রধান দুটি কারণ হচ্ছে, প্রথমতঃ এর ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা। দ্বিতীয়তঃ এর প্রবাদতুল্য ধন-সম্পদ।

সুদক্ষ ও দূরদর্শী রাজনীতিক শের শাহ্ বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান, প্রকৃতি এবং অজস্র ধন-সম্পদের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাকে ভারতে আফগান পুনর্জাগরণের দুর্গ আকারে পরিণত করার মনস্থ করেন [৯৯]। প্রকৃত পক্ষে বাংলা ছিল অবিশ্বাস্য রকমের ধন-সম্পদ শালী। মধ্যযুগে বাংলায় আগমনকারী বিদেশী পর্যটকদের প্রদত্ত বিবরণ এবং অন্যান্য লেখকদের লেখনী থেকেও এর সত্যতা নিরূপণ করা সম্ভব । ১৩৪৬ খ্রীস্টাব্দে বাংলা পরিভ্রমণকারী আফ্রিকার

Dhaka University Institutional Repository

পর্যটক ইবনে বতুতা অকপটে বাংলার সমৃদ্ধির কথা স্বীকার করেছেন[৩৯]। তিনি বলেন যে, পৃথিবীর কোথাও তিনি এমন একটি দেশ দেখেন নি যেখানে জিনিসপত্র বাংলার মতো এতো সস্তায় বিক্রি হয়। তিনি আরো বলেন যে, এদেশ ছিল চাউলে পরিপূর্ণ ও ভাল - ভাল জিনিসপত্রে ভরা। ইতালীয় বণিক বারথেমা বাংলার সর্বত্র প্রত্যেক জিনিসের প্রাচুর্য দেখে বিস্মিত হয়ে যান এবং মন্তব্য করেন যে, এদেশ বসবাসের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট স্থান [৪০]। বাংলায় স্বচ্ছন্দ জীবন যাত্রার জন্যই পর্তুগীজ, ইংরেজ ও ওলন্দাজদের মধ্যে প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, "বাংলা রাজ্যে প্রবেশের শত দরজা খোলা আছে; কিন্তু ফিরবার একটি দরজাও নেই"[৪১]। এছাড়া বাবর লিখেছেন যে, বাংলায় সম্পদের বিরাট ভান্ডার ছিল। হুমায়ূন বাংলার সমৃদ্ধি দর্শনে অভিভূত হন এবং একে তিনি "জান্নাতাবাদ" নামে অভিহিত করেন। ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলার রাজধানী গৌড় দখল করার পর শের শাহ্ হুমায়ূনের আক্রমণ আশংকা করে এর স্বর্ণ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি রোহটাস দুর্গে সরানোর কাজে দুই শতাধিক অশ্ব ও উষ্ট্র নিয়োজিত করেন। আবুল ফযল ও বাদায়ুনীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, যে সকল মুঘল সৈন্য আকবরের সময় বাংলায় এসেছে, তারা প্রত্যেকেই এ প্রদেশের স্বর্ণ- সম্পদে বিত্তশালী হয়ে উত্তর ভারতে প্রত্যাবর্তন করেছে[৪২]। যাহোক, ইহা নিসন্দেহে বলা যায় যে, মুসলিম শাসন যুগে বাংলা ছিল প্রভূত ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ।

মুসলিম শাসন যুগে বাংলা প্রভূত ধন -সম্পদের অধিকারী হলেও জলাভূমি ও বিল- ঝিলের দরুন বাংলার আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর [৪৩]। সমসাময়িক রিপোর্ট অনুসারে এ জলাভূমি ও বিল-ঝিলগুলো অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ও ব্যাধির জন্ম দিত। আবুল ফযল মন্তব্য করেন, "অতীতে বর্ষা শেষ হওয়ার পর বাতাস মহামারী উৎপাদন কারী বলে অনুভূত হতো এবং এটা মারাত্মক ভাবে মানুষ ও জীবনের ক্ষতি করতো"। প্রথম যুগের মুসলিম ঐতিহাসিকগণ বাংলাকে প্লেগ, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের জন্মভূমি রূপে চিত্রিত করেন। তাঁদের বক্তব্যে তাঁরা এ প্রদেশের জলবায়ু সম্বন্ধে উত্তর ভারতীয় অধিবাসীদের ধারণা প্রকাশ করেছেন। ইবনে বতুতার বর্ণনায় তা উত্তমরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি বলেন, "খোরাসানের অধিবাসীরা বাংলাকে দুজুখ-ই-পুর

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ামত বা সমস্ত ভাল জিনিসের নরক বলে অভিহিত করেছেন"। উত্তর ভারতের অধিবাসীরা বাংলার জলবায়ু ও বৃষ্টিকে ভীতির চোখে দেখত এবং তারা সাধারণতঃ বাংলায় চাকুরী করা এবং অবস্থান করা এড়িয়ে চলত। গৌড় দখল করার পর হুমায়ুন জাহিদ বেগকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সমৃদ্ধশালী প্রদেশের এ রকম একটি উচ্চপদে নিযুক্তির জন্যে বাদশাহের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে জাহিদ বেগ মন্তব্য করেন, "জাহাঁপনা কি আমাকে মারার জন্য বাংলা অপেক্ষা উত্তম জায়গা খুঁজে পাননি"। এমনকি বাদশাহ আকবরের শাসনামলের প্রথম দিকে মুঘল সৈন্যরা বাংলায় চাকুরী করতে পছন্দ করত না, যদিও তাদেরকে দ্বিগুণ বেতন প্রদান করা হয়েছিল"। যাহোক, বাংলার আবহাওয়া সম্পর্কে উত্তর ভারতীয়দের মনোভাব যতই প্রতিকূল থাকুক না কেন, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা বিচার করলে দেখা যাবে যে, সমগ্র বাংলার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর ছিল এরূপ উক্তি সত্য নয়। তবে এটা সত্য যে, নদী সরে যাওয়ার ফলে এবং জলাভূমি ও বিল-ঝিলগুলোর অস্তিত্বের কারণে গৌড় ও পান্ডুয়ার মতো কয়েকটি স্থানের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়েছিল"। বাংলায় এমন একটি জলবায়ু ছিল যা নদ-নদী, বৃষ্টিপাত ও জলবেষ্টিত একটি দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এদেশের জলবায়ু শুধু তাদের নিকটই অদ্ভুত মনে হ'ত, যারা এ ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল"।

বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান, এর সীমান্তের প্রাকৃতিক সীমারেখা, এর সমতল ভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত অসংখ্য নদ-নদী, বহু স্থানে জলাভূমি ও বিল-ঝিল এবং তথা কথিত খারাপ জলবায়ু, যা উত্তর ভারতের অধিবাসীদের জন্য ভীতি স্বরূপ ছিল, এসব বাংলার ইতিহাস ও জনগণের জীবনের উপর সুদূর প্রসারী প্রভাব স্থাপন করেছিল। প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা সমূহ বাংলাকে দুর্গম করেছিল এবং এগুলো বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার প্রথম সারিরূপে কাজ করত। আবার নদ-নদী, বৃষ্টিপাত ও জলাভূমি সমূহ বাংলার প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় সারি ছিল। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মহানন্দা, কুশী ও তাদের অসংখ্য উপ-নদী ও শাখা-প্রশাখাগুলো অতিক্রম করা সে যুগে একটি শত্রু বাহিনীর পক্ষে সহজ সাধ্য ছিল না। এখানকার দীর্ঘ স্থায়ী বর্ষাকাল ও জল-প্লাবিত সমতল ভূমি উত্তর ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর জন্য যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুপযোগী ছিল। এ দেশের

Dhaka University Institutional Repository

জলবায়ু, যা অযৌক্তিকভাবে নারকীয় বিবেচিত হয়েছিল তা বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার তৃতীয় সারিরূপে কাজ করত[৪৭]। বাংলার এ প্রাকৃতিক অবস্থার দরুন এখানকার শাসনকর্তাদের পক্ষে বিদ্রোহী কিংবা স্বাধীন হওয়া সহজ সাধ্য ছিল[৪৮]। সুলতানী আমলের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলা প্রায় সময় স্বাধীন ছিল, দিল্লীর সুলতানগণ বাংলা দখল করলেও তা স্থায়ী হ'ত না। ঐতিহাসিক জিয়া আল-দীন বারনী এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন যে, বাংলা দিল্লী থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল; দিল্লী হতে বাংলায় সৈন্যদের আসা যাওয়া সহজ ছিল না, মধ্যে অনেক নদী পার হতে হত এবং বিশেষ করে বর্ষাকালে যাতায়াত বেশ কঠিন ছিল। তখনকার দিনে সংবাদ আদান প্রদানও সহজ ছিল না। এ কারণে বাংলায় নিযুক্ত দিল্লীর শাসনকর্তারা প্রায় বিদ্রোহ করত; শাসন কর্তারা বিদ্রোহ না করলেও তাদের সভাসদরা তাদেরকে বিদ্রোহ করার জন্য পরামর্শ দিত। এর পরও শাসনকর্তারা বিদ্রোহ না করলে সভাসদরা একত্র হয়ে শাসনকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত। এ জন্য বাংলাকে "বলগাকপুর" বা বিদ্রোহী দেশ রূপে আখ্যা দেয়া হত[৪৯]। মুঘল ঐতিহাসিক আবুল ফযলও আকবর নামায় বাংলা সম্পর্কে একই মত প্রকাশ করেন এবং তিনি বলেন, "The country of Bengal is a land where, owing to the climate's favouring the base, the dust of dissension is always rising. .. Hence in old writings it was called a Bulghak Khana (house of turbulence)."[৫০]

বাংলার জলবায়ু এবং ধন-সম্পদের গুরুত্ব অনুধাবন করে শের শাহ্ তাঁর জীবনের প্রথম থেকেই বারংবার বাংলা বিজয়ের চেষ্টা করেন এবং ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলার রাজধানী গৌড় অধিকারে সফল হন[৫১]। শের শাহের নিকট যে বাংলার অপরিসীম গুরুত্ব ছিল তা নিম্নোক্ত ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয়। চৌষার যুদ্ধের পূর্বে বাদশাহ্ হুমায়ূন বাংলা ব্যতিরেকে বিহার এবং অন্যান্য অঞ্চল সমূহ শের শাহ্কে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। শের শাহ্ রাজী হননি, তিনিও বাদশাহ্কে বাংলা ব্যতীত তাঁর সমুদয় এলাকা সমর্পণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। এ সময় তিনি বলেন, পাঁচ ছয় বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করে আমি আমার তরবারীর সাহায্যে বাংলা জয় করেছি। এ বিজয় অভিযানে আমার বহু সৈন্য মারা গিয়েছে। সুতরাং আমি কাউকেও বাংলা সমর্পণ করবনা[৫২]। যাহোক, শের

Dhaka University Institutional Repository

শাহ্ গৌড় দখলের মাধ্যমে প্রাপ্ত ধন-সম্পদের সাহায্যে বিশাল সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করতে এবং চৌষা ও কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ূনকে পরাস্ত করতে সক্ষম হন[৫৩] । সুতরাং ইহা বলা অযৌক্তিক হবেনা যে, শের শাহ্ বাংলার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই এবং বাংলার ধন-সম্পদই হুমায়ূনের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছিল । ফলশ্রুতিতে তিনি হুমায়ূনকে পরাজিত করে পুনরায় ভারত বর্ষে আফগান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন ।

শের শাহ্ ও তাঁর পুত্র ইসলাম শাহের শাসনামলে বাংলা দিল্লী সালতানাতের অধীনে একটি প্রদেশ ছিল । কিন্তু ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ফিরূযকে হত্যা করে মুহম্মদ আদিল শাহ্ দিল্লীর সিংহাসন দখল করে নিলে বাংলার শাসনকর্তা মুহম্মদ খান সূর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন । ফলে দিল্লীর অধীনতা পাশ থেকে ছিন্ন হয়ে বাংলায় পুনরায় স্বাধীন শাসনের সূচনা হয় । অতপর ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় স্বাধীন সূর আফগান শাসন অব্যাহত ছিল । ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে তাজ খান কারারানী বাংলায় স্বাধীন কারারানী আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন । তাজ খান কারারানীর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা সুলায়মান কারারানী বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন । সুলায়মান খান কারারানীর রাজত্ব কালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে এই যে, মুসলিম শাসকদের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম ১৫৬৭ খ্রীস্টাব্দে উড়িষ্যা জয় করতে সক্ষম হন । এর ফলে তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার গৌরব অর্জন করেন । ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দে সুলায়মান মৃত্যুবরণ করলে প্রথমে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়যীদ কারারানী এবং পরে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র দায়ূদ খান কারারানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অধিপতি হন । এ দায়ূদ খান কারারানীর শাসনামলেই বাদশাহ্ আকবর বাংলা আক্রমণ করেন ।

বাংলার সৈয়দ বংশীয় সুলতান নুসরাত শাহের শাসনামলেই মুঘলরা সর্ব প্রথম বাবরের নেতৃত্বে ১৫২৯ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে বাংলার সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল । এ যুদ্ধে বাংলার সৈন্যবাহিনী পরাস্ত হলেও শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়েছিল[৫৪] । বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুমায়ূন ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে বাংলার রাজধানী গৌড় দখল করতে সক্ষম

Dhaka University Institutional Repository

হলেও শেষ পর্যন্ত শের শাহের নিকট বাংলার কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন[৫৫]। হুমায়ুনের পুত্র মুঘল বাদশাহ্ আকবর তাঁর শাসনের প্রথম থেকেই আফগানদের ঘাঁটি ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বিহার ও বাংলা বিজয়ে স্থির সংকল্প ছিলেন। কেননা তিনি সম্পূর্ণরূপে আফগানদেরকে অপছন্দ ও অবিশ্বাস করতেন। এছাড়া বাদশাহ্ আকবরের সমগ্র ভারতের অধীশ্বর হওয়ার লক্ষ্য অর্জনের পথে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার কারারানী আফগান নেতা সুলায়মান খান ছিলেন প্রবল বাধা স্বরূপ[৫৬]। কিন্তু সুলায়মান কারারানীর শক্তি ও সামর্থ্য এবং সাম্রাজ্যে নিজস্ব সমস্যার কারণে আকবর তাঁর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারেন নি। প্রকৃত পক্ষে আকবর পূর্ব ভারতের আফগান শক্তি ধ্বংস করার জন্য অনুকূল সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। শক্তিশালী আফগান শাসক সুলায়মান খান কারারানীর মৃত্যু আকবরকে সে প্রত্যাশিত সুযোগ এনে দেয়[৫৭]। সুলায়মান কারারানীর মৃত্যু সংবাদ পেয়েই বাদশাহ্ আকবর অতি সত্বর বিহার ও বাংলা বিজয় করার জন্য মুনিম খানকে নির্দেশ প্রদান করেন[৫৮]।

মুঘল বাহিনী মুনিম খানের নেতৃত্ব ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মার্চ তুকারায়ের যুদ্ধে এবং ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দের ১২ই জুলাই খান-ই-জাহানের নেতৃত্বে রাজমহলের যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন কারারানী আফগান শাসক দায়ূদ খান কারারানীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। দায়ূদ খানের পরাজয় ও হত্যার সাথে সাথেই বাংলা কেন্দ্রিক পূর্ব ভারতীয় আফগান সালতানাতের পতন ঘটে। রাজ মহলের যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে মুঘলরা বাংলা ও বিহারে আফগান অধিকার সমূহ দখল করে নেয়[৫৯]। কিন্তু সংগে সংগে বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সমগ্র বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে দীর্ঘদিন সময় লাগে। প্রকৃত পক্ষে সমগ্র বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দে বাদশাহ্ আকবরের মৃত্যু হয়[৬০]। অন্যদিকে দায়ূদ খান কারারানীর বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি কতলু খান নুহানী রাজমহলের যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ উড়িষ্যার জায়গীর লাভ করে[৬১]। কিন্তু ১৫৯২ খ্রীস্টাব্দে মুঘল সেনাপতি মানসিংহ উড়িষ্যাকে চূড়ান্তভাবে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেয়[৬২]।

১৫৮০ খ্রীস্টাব্দে বিভিন্ন কারণে বাংলা ও বিহারের মুঘল সৈন্যরা বাদশাহ্ আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহীরা ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দের ১৯ শে

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল সুবাহদার মুজাফফর খানকে হত্যা করে এবং এর সংগে সংগেই তারা বাংলায় সরকার গঠন করে। বিদ্রোহীরা আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং কাবুলের শাসন কর্তা মীর্যা হাকিমকে বাদশাহ্ নির্বাচিত করে তাঁর নামে খুতবা পাঠ আরম্ভ করে[৬৩]। এ ঘটনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এবং বাদশাহ্ আকবরের অর্থমন্ত্রী খাজা মনসুর ও মুঘল দরবারের অন্যান্য অসন্তুষ্ট কর্মকর্তাদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে মীর্যা মুহম্মদ হাকিম ভারত বর্ষের সিংহাসন দখলের আকাংখা পোষণ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি পাঞ্জাব আক্রমণ করেন। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৫৮১ খ্রীস্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী আকবর আফগানিস্তানের দিকে অগ্রসর হন। বাদশাহ্ আকবরের আগমন বার্তা শ্রবণ করে কোনরূপ প্রতিরোধ ব্যতিরেকেই মীর্যা মুহম্মদ হাকিম পাঞ্জাব থেকে কাবুলে পলায়ন করেন। অতপর ১৫৮১ খ্রীস্টাব্দের ৯ই আগষ্ট বাদশাহ্ আকবর কাবুলে প্রবেশ করেন এবং মীর্যা হাকিমকে পরাস্ত করতে সক্ষম হন। মীর্যা মুহম্মদ হাকিম আকবরের আনুগত্য স্বীকার করে নিলে কাবুলের শাসন ভার তাঁর উপর অর্পণ করে ১৫৮১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আকবর দিল্লীতে ফিরে আসেন। অতপর ১৫৮৫ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে হাকিমের মৃত্যুর পর কাবুল সম্পূর্ণ রূপে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়[৬৪]।

কাবুল বিজয়ের পর বাদশাহ্ আকবর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা বিধান কল্পে প্রথমেই দুর্ধর্ষ উজবেগ, ইউসুফজাই এবং রোশনিয়া উপজাতিকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করেন। অতপর ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে কাশ্মীর, ১৫৯০-৯১ খ্রীস্টাব্দে সিন্ধু, ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে বেলুচিস্তান ও কান্দাহারকে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এ ভাবে বাদশাহ্ আকবর ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই নিজেকে হিমালয় হতে নর্মদা এবং হিন্দুকুশ হতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অবিসংবাদিত শাসকে পরিণত করেন[৬৫]।

উত্তর ও মধ্যভারতের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর আকবর দক্ষিণ ভারতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। প্রধানতঃ এক অখন্ড সর্ব- ভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই আকবর দক্ষিণ ভারতের মুসলিম সুলতানী রাজ্য আহমদ নগর, বিজাপুর, গোলকুন্ডা, খান্দেশ প্রভৃতি স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করতে

Dhaka University Institutional Repository

চেয়েছিলেন। আকবর প্রথমে কূটনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে দাক্ষিণাত্যকে স্বীয় অধীনে আনয়নের চেষ্টা করেন এবং এ উদ্দেশ্যে তিনি ১৫৯১ খ্রীস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের সকল রাজ্য গুলোকে মুঘল প্রভুত্ব স্বীকার করে নেয়ার আহ্বান জানিয়ে তাঁদের নিকট দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু একমাত্র খান্দেশ ব্যতীত দাক্ষিণাত্যের অন্যকোন সুলতানী রাজ্য যুদ্ধ ব্যতিরেকে বশ্যতা স্বীকারে রাজী হয়নি। অতঃপর ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে আকবরের দ্বিতীয়পুত্র শাহজাদা মুরাদ ও বৈরাম খানের পুত্র আবদুর রহীমের নেতৃত্বে প্রেরিত এক বিশাল মুঘল বাহিনী আহমদ নগর অবরোধ করে। বিজাপুরের বিধবা রানী এবং হুসাইন নিযাম শাহের কন্যা চাঁদ বিবি মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দে মুঘলদের সাথে একটি সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তির শর্তানুযায়ী আহমদ নগরের অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাজা বাদশাহ্ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে নেয় এবং বেরার মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে চাঁদ বিবি আহমদ নগরের স্বার্থান্বেষী অভিজাত সম্প্রদায়ের চক্রান্তে নিহত হলে ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের আগষ্ট মাসে মুঘল বাহিনী আহমদ নগর দখল করে নেয়।

খান্দেশের সুলতান মিয়া বাহাদুর শাহ্ মুঘল কর্তৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে আকবর স্বয়ং ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে খান্দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তিনি প্রথমেই খান্দেশের রাজধানী বুরহানপুর দখল করেন। অতঃপর আকবর খান্দেশের শক্তিশালী দুর্গ আসীরগড় অবরোধ করেন এবং ১৬০১ খ্রীস্টাব্দে এ দুর্গটি জয় করতে সক্ষম হন। এই আসীরগড় দুর্গ অধিকারই ছিল বাদশাহ্ আকবরের সর্বশেষ বিজয়। যাহোক , দাক্ষিণাত্য অভিযানের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের সীমানা দক্ষিণে কৃষ্ণানদী পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে[৬৬]।

ভাগ ৩ - পূর্ব-ভারত ও এর শাসকদের প্রতি বাদশাহ্ আকবরের মনোভাব ঃ

পানি পথের প্রথম যুদ্ধের পরেই বাবরের নেতৃত্বে মুঘল শক্তি পূর্ব - ভারত তথা বাংলা ও বিহারের সংস্পর্শে আসে। এ সময় বাংলার সুলতান ছিলেন নুসরাত

শাহ্ এবং বিহারে নুহানী আফগানদের শাসন ছিল। পানি পথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ের পর একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অভিজাত ও সাধারণ আফগান বাংলার সৈয়দ বংশীয় সুলতান নুসরাত শাহের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। মানবিক কারণে নুসরাত শাহ্ তাদেরকে আশ্রয় প্রদান করেন। আবার অনেক আফগান জৌনপুর ও বিহারের নুহানী ও ফর্মুলীদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে[৬৭]। এ সময় বাবর বিহারে মাহ্মুদ লোদীর নেতৃত্বাধীন আফগানদেরকে দমন করতে গিয়ে বাংলার সুলতানের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়েছিল[৬৮]। বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুমায়ুন বাংলার সৈয়দ বংশীয় শেষ সুলতান গিয়াস আল-দীন মাহ্মুদ শাহের আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের মাঝা মাঝি সময়ে বাংলার রাজধানী গৌড়ে প্রবেশ করেন[৬৯]। কিন্তু ১৫৩৯ খ্রীস্টাব্দের ২৭ শে জুন তারিখে শের শাহ্ চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করার পর পুনরায় বাংলার উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন[৭০]।

ষষ্ঠদশ শতকে মুঘলদের প্রতি আফগানদের সর্বজনীন মনোভাব ছিল শত্রুভাবাপন্ন[৭১]। বাবর এবং হুমায়ুন বিরোধ নিবারক নীতি অনুসরণের মাধ্যমে তাদেরকে স্বপক্ষে আনয়ন করতে চেয়েছিলেন[৭২]। বাবর এবং হুমায়ূনের এ বিরোধ নিবারক নীতির কারণেই বিহারে নুহানী ও সূর আফগানরা নিরুপদ্রব থেকে যায়[৭৩]। কিন্তু বাবর ও হুমায়ূনের এ নীতি মুঘলদের জন্য আত্মঘাতী রূপ ধারণ করেছিল। কেননা বাবর এবং হুমায়ুন আফগানদেরকে বিহার ছেড়ে দিয়েছিল বলেই তারা শের শাহের নেতৃত্ব গৌড় দখল করে বাংলার ধন-সম্পদের সাহায্যে নিজদেরকে শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছিল। অবশেষে শের শাহ্ চৌষা ও কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ূনকে পরাজিত করে ভারত বর্ষ থেকে বিতাড়িত করে পুনরায় ভারতে আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

যাহোক, আফগানরা ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে হুমায়ূনের নিকট এবং ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে চূড়ান্ত ভাবে আকবরের নিকট ভারতের সার্বভৌমত্ব হারায়। এর পরও আফগানরা বাদশাহ্ আকবরের আনুগত্য স্বীকার করেনি এবং তাঁর সমগ্র রাজত্বকালব্যাপী গোলযোগের সৃষ্টি করেছিল। বাদশাহ্ আকবরের রাজত্ব কালে

Dhaka University Institutional Repository

১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আফগানরা তাদের সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য একাধিকবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। অতপর তারা বাংলা ও বিহারে তাদের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে সচেষ্ট হয়।

আকবর সম্পূর্ণরূপে আফগানদেরকে অপছন্দ করতেন। বাবর ও হুমায়ূনের প্রতি তাদের অতীত আচরণ এবং তাঁর নিজের শাসনের প্রতি আফগানদের শত্রুতার কারণে আকবর আফগানদেরকে অবিশ্বাসও করতেন। আকবর কোনক্রমেই বিস্মৃত হতে পারেননি যে, এ আফগানরাই হুমায়ূনকে পরিত্যাগ করেছিল এবং তাঁকে ভারত থেকে বিতাড়িত করেছিল[৭৪]। তাই দেখা যায় যে, রাজত্বের প্রথম থেকেই আকবর আফগানদেরকে বাংলা ও বিহার থেকে বিতাড়িত করতে উদগ্রীব ছিলেন এবং প্রথম থেকেই বাংলা ও বিহারের আফগান শাসকদের প্রতি তাঁর আক্রমণাত্মক মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ ১৫৫৭ খ্রীস্টাব্দে সিকান্দর খান সূর যখন মুঘলদের নিকট মানকোটের অধিকার সমর্পণ করেন তখন আকবর এক ফরমান জারী করে তাঁকে জৌনপুরে একটি সাময়িক জায়গীর প্রদান করেন এবং প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, খান-ই- যামান যখনই আফগানদের নিকট থেকে বাংলা জয় করবে তখনই তাঁকে বাংলায় একটি স্থায়ী জায়গীর প্রদান করা হবে[৭৫]। দ্বিতীয়তঃ ১৫৬৩ খ্রীস্টাব্দে আকবর যখন দ্বিতীয় বার খান-ই- যামানকে জৌনপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন তখন তিনি খান-ই-যামানকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, যদি তিনি আফগানদের নিকট থেকে বাংলা দখল করে নিতে পারেন তবে তাঁকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হবে[৭৬]। তৃতীয়তঃ ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দে জৌনপুরের মুঘল শাসনকর্তা খান -ই- যামান বাদশাহ্ আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে বাংলার কাররানী আফগান শাসক সুলায়মান খান যাতে খান - ই- যামানকে সাহায্য প্রদান থেকে বিরত থাকেন, সে জন্য আকবর সুলায়মান খান কাররানীর উপর চাপ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে তাঁর দূত হাজী মুহম্মদ সিস্তানীকে সুলায়মান কাররানীর নিকট প্রেরণ করেন। শুধু তাই নয়, আকবর তাঁর দূত হাসান খান খাজাঞ্চী ও মহাপাত্রকে উড়িষ্যার রাজার নিকট প্রেরণ করেন এরূপ চুক্তিতে রাজী করানোর জন্য যে, যদি সুলায়মান খান বিদ্রোহী খান-ই-যামানকে সাহায্য করে তবে তিনি যেন বিহার ও বাংলা আক্রমণ করেন। উড়িষ্যার রাজা

Dhaka University Institutional Repository

আকবরের দূত দ্বয়কে সন্মানের সাথে গ্রহণ করেন এবং বাদশাহের সাথে আঁতাত গড়ে তোলেন। উড়িষ্যার রাজা প্রতিশ্রুতি দেন যে, সুলায়মান খান কারারানী বিদ্রোহী খান - ই- যামানকে সাহায্য করলে তিনি ইব্রাহিম খান সূরকে বাংলা ও বিহার আক্রমণের জন্য প্রেরণ করবেন[৭৭]। চতুর্থতঃ মুঘল ঐতিহাসিক আবুল ফযলের লেখনী থেকেও পূর্ব-ভারত এবং এর আফগান শাসকের প্রতি আকবরের মনোভাব সম্পর্কে জানা যায়। আবুল ফযল লিখেন যে, " One of the occurrences of this time was that Sulaiman Kararani who exhaled the breath of power in Orissa, Bengal and Bihar departed this life. Ascetic sages, and politicians who had regard to the repose of mortals , which is bound up with one rule , one ruler, one guide, one aim and one thought, recognised in the emergence of this event an instance of the helps of fortune, whilst those who were void of understanding and who made the agitation of the black - fated Afghans in the eastern provinces an argument in support of their own views, and opposed the expedition to Gujrat, were by this event cast into the pit of failure. Another faction whose narrow intelfects could not comprehend the idea of marching to Gujrat and of overcoming it, and which indulged in foolish prattle, made the event a pretext for prating and urged the propriety of marching to the eastern provinces. As the God - worshipping Khedive reflected that the oppressed ones of Gujrat should be brought into the cradle of grace he did not give ear to these futilities and said with his holy lips that it was good that the news of Sulaiman's death had come during the march to Gujrat, for had it come while he was in the capital, assuredly he would, out of deference to the opinions of most of his officers, have addressed himself in the first place to an expedition to the eastern provinces. What necessity was there now for the Shahinshah's personal visit to these countries after Sulaiman's death ? Now the conquest of that country would be accomplished by the skill and courage of the officers. Accordingly an order was sent to Munim Khan Khankhanan that he should conquer Bihar, Bengal and Orissa in concurrence with the other officers".[৭৮] এ ছাড়াও আবুল ফযল অন্যত্র বাংলা ও বিহার জয়ের জন্য আকবরের মনোভাব ব্যাখ্যা করে বলেন, " so should justice - loving rulers not be satisfied with the

Dhaka University Institutional Repository

countries of which they are in possession, but should set their hearts upon conquering other countries and regard this as a choice form of Divine worship... Hence it is that the Adorner of fortune's parterre in our age is continually engaged in the conquest of other countries"[৯]. আবুল ফযলের উপরোক্ত বক্তব্য পূর্ব-ভারত তথা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এবং এতদঞ্চলের আফগান শাসকের প্রতি বাদশাহ্ আকবরের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করে।

যাহোক, নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আকবর তাঁর রাজত্বের প্রথম থেকেই পূর্ব-ভারত এবং এর আফগান শাসকদের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী ও আক্রমণাত্মক মনোভাব পোষণ করতেন এবং পূর্ব-ভারতে স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে তাৎক্ষণিক ভাবে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারেন নি। প্রথমত ঃ বাংলা ও বিহারের স্বাধীন সূর আফগান শাসক গিয়াস আল - দীন বাহাদুর শাহ্ থেকে শুরু করে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীন কাররানী আফগান শাসক সুলায়মান কাররানী পর্যন্ত প্রত্যেক শাসকই জৌনপুরের মুঘল শাসনকর্তা খান-ই- যামান ও মুনিম খানের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ এ সময়ের মধ্যে খান-ই-যামান একাধিকবার আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করায় পূর্ব-ভারতীয় আফগান সালতানাত আক্রমণের জন্য পরিস্থিতি আকবরের অনুকূলে ছিলনা[১০]। তৃতীয়তঃ সুলায়মান কাররানীর শক্তি - সামর্থ্য এবং সাম্রাজ্যে তাঁর নিজস্ব সমস্যার কারণে আকবর তাঁর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারেন নি। চতুর্থতঃ সুলায়মান খান কাররানী একজন সতর্ক ও হুঁশিয়ার ব্যক্তি ছিলেন। তাই কোনরূপ রাজ চিহ্নাদি ধারণ করে আকবরের রোষানলে পড়েন নি।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাদশাহ্ আকবর তাঁর রাজত্বের প্রথম থেকেই পূর্ব-ভারত এবং এর আফগান শাসকদের প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাব পোষণ করতেন এবং পূর্ব-ভারত আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু উপরে উল্লিখিত কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি সুলায়মান কাররানীর রাজত্বকাল পর্যন্ত পূর্ব- ভারত আক্রমণ করেননি। তবে সুলায়মান কাররানীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ মাত্রই তিনি মুনিম খানকে বাংলা,

Dhaka University Institutional Repository

বিহার ও উড়িষ্যা আক্রমণের নির্দেশ দেন। এ নির্দেশের মাধ্যমেই পূর্ব-ভারত ও এর শাসকদের প্রতি বাদশাহ্ আকবরের সাম্রাজ্যবাদী ও আক্রমণাত্মক মনোভাবের চূড়ান্ত বহিঃ প্রকাশ ঘটে।

ভাগ ৪ – মুঘল সম্প্রসারণবাদী নীতির প্রয়োগ; ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ব-ভারতে সামরিক অভিযানাদি, বিজয় ও ক্ষমতা সংহতকরণের পদক্ষেপ সমূহ ও স্থানীয় সর্দারদের প্রতিক্রিয়া ঃ

পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গেছে যে, বাদশাহ্ আকবর তাঁর রাজত্বের প্রথম থেকেই পূর্ব - ভারতীয় আফগান সালতানাত দখলের জন্য উদগ্রীব ছিলেন এবং মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীন কারারানী আফগান শাসক সুলায়মান কারারানীর মৃত্যু বাদশাহ্ আকবরকে তাঁর সে বহুল আকাংখিত সুযোগ এনে দেয়। বাদশাহ্ আকবর যখন গুজরাট অভিযানে যাত্রা করেন তখন তিনি পথি মধ্যে সুলায়মান খান কারারানীর মৃত্যু সংবাদ অবগত হন। এ অবস্থায় তাঁর অমাত্যদের অনেকেই তাঁকে গুজরাট অভিযান ত্যাগ করে পূর্ব-ভারতীয় প্রদেশগুলোয় অর্থাৎ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা অভিযানের পরামর্শ দেন। আকবর রাজধানীতে থাকলে হয়তো অমাত্যদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। কিন্তু যেহেতু ইতোপূর্বে গুজরাট অভিযান আরম্ভ হয়েছে সেহেতু তিনি গুজরাট অভিযান পরিত্যাগ না করে জৌনপুরের মুঘল শাসনকর্তা মুনিম খানকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা বিজয়ের আদেশ দেন[৮১]।

যাহোক, সুলায়মান কারারানীর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়যীদ খান কারারানী সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁর হঠকারিতার দরুন সুলায়মান কারারানীর জামাতা হাঁসুর নেতৃত্বে একদল নুহানী আফগান বায়যীদকে হত্যা করে[৮২]। বায়যীদ কারারানীর মৃত্যুর পর আফগান সালতানাতে চরম রাজনৈতিক বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং আফগানরা স্পষ্টত ঃ তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলে বিভক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে পড়ে। এ তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী দল নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে সিংহাসনে বসানোর জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। নুহানী আফগান সর্দার কতলু খান নুহানী সুলায়মান কারারানীর জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র হাঁসুর পক্ষাবলম্বন করে এবং সুলায়মান কারারানীর উযীর লোদী খান সুলায়মান কারারানীর কনিষ্ঠপুত্র দায়ূদ খান কারারানীর পক্ষাবলম্বন করে। অন্যদিকে গুজারখান কারারানী বায়যীদ কারারানীর এক পুত্রকে প্রতিদ্বন্দ্বী সুলতান রূপে বিহারের সিংহাসনে বসান। যাহোক, দায়ূদ খান ও লোদী খান হাঁসুকে পরাজিত ও হত্যা করে সিংহাসন দখল করে নিলে নুহানী আফগানরা দায়ূদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। অতপর লোদী খান গুজার খানের সাথে বুঝা পড়া করার জন্য রাজধানী তাঁড়া থেকে বিহারের দিকে অগ্রসর হন[৮০]। ঠিক এ সময় খান-ই-খানান মুনিম খান চুনার থেকে বিহারের দিকে অগ্রসর হন। তিনি তেনজরী কুলী (Tengri Quli), ফাররাখ ইরঘলিক (Farrakh Irghliq) ও পায়ান্দা মুহম্মদ সাগকাশ (Payanda Muhammad Sagkash) এবং অন্যান্যদেরকে হাজীপুর এবং তালিবি, মীর্যা আলী, নাদিম বেগ ও অন্যান্যদেরকে পাটনার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন[৮১]। এরূপ পরিস্থিতিতে দায়ূদ খানের উযীর লোদী খান মুঘল সেনাপতি মুনিম খানের এ অভিযানের গুরুত্ব অনুধাবন করে যত শীঘ্র সম্ভব গুজার খানের সাথে মিত্রতা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি গুজার খানের সাথে বিরোধ মিটিয়ে ফেলেন এবং প্রচুর উপঢৌকনের বিনিময়ে মুনিম খানকে ফিরে যেতে প্রলুব্ধ করেন। এ ভাবে লোদী খান প্রথম মুঘল আক্রমণ প্রতিহত করেন[৮২]।

উযীর লোদী খান অনুধাবন করেন যে, যদিও মুনিম খানের সাথে আফগানদের সাময়িক শান্তি স্থাপিত হয়েছে তথাপি বাংলা ও বিহার দখল না করা পর্যন্ত বাদশাহ্ আকবর কখনও সন্তুষ্ট হতে পারবেন না। তাই তিনি আফগানদের অবস্থান দৃঢ়করণে ও মুঘলদের জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন[৮৩]। প্রায় এ সময় মুনিম খান, সুলায়মান উজবেকের পুত্র ইউসুফ মুহম্মদের নেতৃত্ব গোরক্ষপুরে সংঘটিত বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অন্যদিকে এ সময় মুঘল সেনাপতিদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং অনেকেই মুনিম খানকে ছেড়ে চলে যায়। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে লোদী খান জৌনপুর বিজয়ে অগ্রসর হন এবং যামানিয়া দুর্গ দখল করে নেন। মুনিম খান গোরক্ষপুরে

Dhaka University Institutional Repository

ইউসুফ মুহম্মদকে পরাজিত করে লোদী খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। অতপর লোদী খান ও মুনিম খান গাযীপুরে পরস্পরের সম্মুখীন হন। লোদী খানের যুদ্ধ কৌশল মুঘলদেরকে বিপজ্জনক অবস্থায় ফেলে দেয়। আবুল ফযলের বক্তব্য অনুযায়ী এ সময় মুঘল বাহিনী এমন এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পতিত হয় যে, যখন তাদের পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যেমনি যুক্তিযুক্ত ছিলনা তেমনি পশ্চাদপসরণ ও ছিল দুঃসাধ্য। অন্যদিকে বাদশাহ্ আকবর এ সময় সুরাট বিজয়ে ব্যস্ত থাকার দরুন তাঁর পক্ষেও মুনিম খানকে কোনরূপ সাহায্য প্রেরণ সম্ভব ছিল না। এরূপ সংকট জনক পরিস্থিতিতে মুনিম খান লোদী খানের নিকট শান্তির প্রস্তাব দেন। কিন্তু প্রথম অবস্থায় লোদী খান মুনিম খানের প্রস্তাবে সম্মত না হলেও শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়[৮৭]। অতপর সম্ভবতঃ ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম দিকে আফগান বাহিনী গাযীপুর থেকে পাটনার দিকে ফিরে যায়[৮৮]।

১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে বাদশাহ্ আকবর গুজরাট থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর অনতিবিলম্বে বাংলা ও বিহার দখলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই মর্মে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মুনিম খানকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। খান-ই-আলম, আশরাফ খান, মুঈন উদ্দিন আহমদ খান, কাসিম আলি খান, মীর্যা আলী এবং একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তাকে মুনিম খানের সাহায্যার্থে প্রেরণ করা হয়। এমনকি আসন্ন পূর্ব - ভারতীয় অভিযান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী দিয়ে রাজা টোডরমলকেও মুনিম খানের নিকট প্রেরণ করা হয়। টোডরমল এখানে এসে মুঘল সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করার পর আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করে মুঘল সৈন্যদের আনুগত্য ও প্রস্তুতি সম্পর্কে সন্তোষজনক বিবরণ প্রদান করায় বাদশাহ্ আকবর আপাততঃ নিশ্চিত রইলেন।[৮৯] এভাবেই মুঘলরা পূর্ব-ভারত অভিযানের জন্য মঞ্চ সাজিয়েছিল। কিন্তু অনতিবিলম্বে পূর্ব ভারতের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। কেননা গুজরাটে পুনরায় গোলযোগ দেখা দেয়ায় ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দের আগষ্ট মাসে বাদশাহ্ আকবরকে আহমেদাবাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে হয়েছিল।[৯০] ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে আকবর আহমেদাবাদ থেকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। রাজধানী পৌঁছামাত্রই তিনি মীরবকশী লস্কর খান এবং

Dhaka University Institutional Repository

পরমানন্দকে একটি নৌ-বহর সহ জৌনপুর প্রেরণ করেন এবং সেখানকার অন্যান্য কর্মকর্তা ও স্থানীয় জায়গীরদারদেরকে সংঘবদ্ধ হয়েও মুনিম খানের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করার জন্য জরুরী আদেশ প্রদান করেন।[৯১]

অন্যদিকে দায়ুদ কারারানী কতলুখান, শ্রীহরি ও গুজার খান কারারানীর কুমন্ত্রণা শুনে উযীর লোদী খানকে অবিশ্বাস করে বসেন। কুমন্ত্রণা দাতারা দায়ূদ খানকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, লোদী খান তাঁর ভাবী জামাতা ও তাজ খান কারারানীর পুত্র ইউসুফকে সিংহাসনে বসানোর চেষ্টা করছেন। ফলে দায়ূদ বাংলা থেকে মুঙ্গের এসে ইউসুফকে হত্যা করেন। এ সংবাদ শ্রবণ মাত্রই লোদী খান দায়ূদের পক্ষ ত্যাগ করে মুনিম খানের সাথে সত্বর চুক্তি সম্পাদন করেন এবং দায়ূদের বিরুদ্ধেই সৈন্য পরিচালনা করেন। দায়ূদ যখন শুনলেন যে, লোদী খান তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছেন তখন তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মুঙ্গের থেকে বাংলায় পশ্চাদপসরণ করে তেলিয়াগড়িতে ঘাঁটি স্থাপন করেন। কিন্তু কালাপাহাড় ও জালাল খান সাধুরী লোদী খানের পক্ষ ত্যাগ করায় তিনি পশ্চাদপসরণ করে রোহ্তাস দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং মুনিম খানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন।[৯২] লোদী খানের আবেদনে সাড়া দিয়ে মুনিম খান তাঁর সাহায্যার্থে হাশিম খান, তেনজরী কুলী খান, বারী তাওয়াচী বাসী এবং মাওলানা মাহ্মুদ আখন্দের নেতৃত্বে একটি সৈন্য দল প্রেরণ করেন।মুনিম খান নিজেও জৌনপুর থেকে রোহ্তাস দুর্গের দিকে অগ্রসর হন।[৯৩] ১৫৭৪ খ্রীস্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারীর পূর্বে কোন এক সময় এসকল ঘটনাদি সম্পর্কে বাদশাহ্ আকবরকে জানানো হয়। ইহা বলাই বাহুল্য যে, আকবর ইতোমধ্যেই বাংলা অধিকারের ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেছিলেন। এক্ষণে তিনি মুনিম খানকে অনতিবিলম্বে বাংলা আক্রমণের নির্দেশ দেন। এ অভিযানের স্বচ্ছন্দ গতি নিশ্চিত করণের জন্য মুঘল বাহিনীর নিয়মশৃংখলা ও সুসংগঠিত করণ সংক্রান্ত বিষয়াদি তদারকির জন্য রাজা টোডরমলকে নিযুক্ত করা হয়। রাজা টোডরমল ত্রিমোহনী নামক স্থানে মুনিম খানের সাথে মিলিত হন। তখন মুনিম খান পূর্ণোদ্যমে দায়ূদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন[৯৪]।

এরূপ পরিস্থিতিতে দায়ূদ খান পুনরায় লোদী খানের স্মরণাপন্ন হন। অনেক আলাপ আলোচনার পর গুজার খানের প্রচেষ্টায় লোদী খান ও দায়ূদ খানের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। [৯৫] লোদী খান পুনরায় দায়ূদের পক্ষে যোগদান করেন এবং বীর দর্পে সৈন্য বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়ে শোন নদীর তীরে মুঘল বাহিনীর গতি রোধ করেন, মুঘল অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যায়। লোদী খান পুনঃ মুঘল আক্রমণ ব্যাহত করার জন্য বাদশাহ্ আকবরকে নগদ দু'লক্ষ টাকা এবং এক লক্ষ টাকার জিনিসপত্র প্রদানে স্বীকৃত হয়ে মুনিম খানের নিকট শান্তির প্রস্তাব পেশ করেন। সুলায়মান খান কাররানী ও লোদী খানের সাথে পুরাতন বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে মুনিম খান বাংলা ও বিহারের আফগানদের সাথে শান্তি স্থাপন করেন এবং জৌনপুর ফিরে যান[৯৬]। এভাবে লোদী খানের প্রচেষ্টায় স্বল্প সময়ের জন্য হলেও মুঘল আক্রমণ প্রতিহত হয়। কিন্তু দায়ূদ খান কাররানী পুনরায় কুমন্ত্রণা দাতাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে লোদী খানকে অবিশ্বাস করে বন্দী করেন এবং পরে হত্যা করেন [৯৭]।

লোদী খানের হত্যার ফলে আফগানদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দেয়। এ সুযোগে মুনিম খান পুনরায় পূর্ব দিকে অগ্রসর হন। তিনি শোন নদী অতিক্রম করে পাটনার দিকে অগ্রসর হন। দায়ূদের অধীনে অনেক সৈন্য সামন্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি পাটনা দুর্গে আশ্রয় নেন[৯৮]। ১৫৭৪ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে মুঘল বাহিনী পাটনা অবরোধ করে [৯৯]। দীর্ঘ তিন মাস অবরোধ পরিচালনা করা সত্ত্বেও মুনিম খান পাটনা থেকে দায়ূদ খানকে বিতাড়িত করণে ব্যর্থ হন[১০০]। অবশেষে ১৫৭৪ খ্রীস্টাব্দের ৩রা আগষ্ট আকবর স্বয়ং পাটনা অবরোধ তদারক করতে আসেন [১০১]। তিনি আসার সংগে সংগেই যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়। পাটনা গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত; তার বিপরীতে গঙ্গার উত্তর তীরে হাজীপুর অবস্থিত। এ হাজীপুর থেকেই পাটনায় দায়ূদের অবরুদ্ধ সৈন্যদের রসদ সরবরাহ হত। এ কারণেই মুনিম খান শত চেষ্টা করেও পাটনার অবরোধ ভাঙ্গতে পারেন নি। আকবর যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসেই উপলব্ধি করেন যে, হাজীপুর দখল করতে না পারলে দায়ূদকে পরাজিত কিংবা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা যাবে না। তাই তিনি ৫ই আগষ্ট রাতে খান-ই-আলমের নেতৃত্বে রাজা গজপতি ও অন্যান্যদেরকে ৬০০০ সৈন্য ও একটি শক্তি শালী নৌ-বহর সহ হাজীপুর জয়ের জন্য প্রেরণ করেন। প্রচন্ড লড়াইয়ের পর মুঘল বাহিনী হাজীপুর দখল করে নেয় [১০২]।

হাজীপুরের পতন মুঘল প্রতিরোধে আফগানদের মানোবল ভেঙ্গে দেয়। আফগান প্রধানরা বিশেষত ঃ কতলু নুহানী দায়ূদ খানকে পাটনা ত্যাগের পরামর্শ দেন। কিন্তু দায়ূদ খান পাটনা ত্যাগে সম্মত না হওয়ায় কতলু নুহানী মাদক প্রয়োগে হতচেতন করে তাঁকে নৌকা যোগে রাজধানী তাঁড়ার দিকে নিয়ে যায়। দায়ূদের হিন্দু মন্ত্রী শ্রীহরি নৌকা যোগে দায়ূদের ধন সম্পদ নিয়ে বাংলার দিকে অগ্রসর হন এবং গুজার খান কারারানীও সৈন্যবাহিনী ও হাতী সহ পাটনা দুর্গ ত্যাগ করে। বর্ষার অন্ধকার রাত, বর্ষার পানিতে নদীগুলো ভীষণ আকার ধারণ করেছিল এবং সারা দেশ ছিল জল মগ্ন। নিজাম আল-দীন আহমদ বকশী আফগানদের পাটনা ত্যাগের রাত্রিকে প্রলয় রাত্রির সাথে তুলনা করেন। পলায়ন কালে দায়ূদের সেনাবাহিনী শোচনীয় ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সৈন্যদের অনেকেই দুর্গ পরিখায় ডুবে মরে, কিছু সৈন্য হাতীর পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে মারা যায়। অধিকন্তু পলায়নমান আফগান সৈন্যদের ভারে পুন পুন নদীর পুল ভেঙ্গে গিয়ে অনেক সৈন্য ও হাতী নদীতে পড়ে গিয়ে ডুবে মারা যায়[১০৩]।

৮ই আগষ্ট সকালে বাদশাহ্ আকবর সৈন্যবাহিনী সহ পাটনায় প্রবেশ করেন। অতপর তিনি পলায়নপর আফগানদেরকে অনুসরণ করে দরিয়াপুর পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। ১২ই আগষ্ট মুনিম খান দরিয়াপুরে আকবরের সঙ্গে মিলিত হন[১০৪]। আকবর বাংলা অভিযানের দায়িত্ব মুনিম খানের উপর ন্যাস্ত করেন এবং বাংলা অভিযানের জন্য ২০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের একটি সুসজ্জিত বাহিনী মুনিম খানের অধীনে প্রদান করা হয়[১০৫]।এছাড়া মুনিম খানকে বাংলা ও বিহারের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদান করা হয় এবং অন্যান্য উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদেরকে যথাযথ ভাবে তাঁর আদেশ মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়। রাজা টোডরমল ও রামদাস কাচওয়াকে মুনিম খানের অধীনে যথাক্রমে দিওয়ান ও নায়েব দিওয়ান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। জায়গীর বন্টনকে কেন্দ্র করে মুনিম খান ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা পরিহার করার উদ্দেশ্যে আকবর সাময়িক ভাবে মুহম্মদ কুলী খান বারলাস, রাজা টোডরমল, মজনুন খান কাকশাল, ফরহাত খান ও খান - ই- আলমের জায়গীর নির্দিষ্ট করে দেন। এ সকল কর্মকর্তাদেরকে বাংলা ও বিহারের ঐ সকল স্থানের

Dhaka University Institutional Repository

জায়গীর প্রদান করা হয় যে স্থানগুলোর কর্তৃত্ব তখনও আফগানদের হাতে ছিল। সম্ভবতঃ অভিযানে উল্লিখিত কর্মকর্তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়[১০৬]। মুনিম খানকে বিহারে একটি জায়গীর প্রদান করা হয়[১০৭]। এ ভাবে সকল প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণের পর ১৫৭৪ খ্রীস্টাব্দের আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি সময় মুনিম খান দরিয়াপুর থেকে বাংলা অভিযানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন[১০৮]। বাংলা অভিযানে যে সকল কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন - মুহম্মদ কুলী খান বারলাস, মজনুন খান কাকশাল, কিয়া খান, আশরাফ খান, খান আলম, শাহাম খান, বাকী খান, রাজা টোডরমল, লস্কর খান, বাবা খান এবং আরো অনেকে[১০৯]।

বাংলা অভিযানের প্রথমেই মুনিম খান সুরুজগড়ের আফগান ঘাঁটি দখল করেন। আফগানরা প্রায় বিনা যুদ্ধেই সেখান থেকে পলায়ন করে। এর পর মুঘল বাহিনী মুঙ্গের দখল করে। মুঙ্গের দখলের পর মুঘল বাহিনী ভাগলপুর ও খলগাঁও অধিকার করে তেলিয়াগড়িতে উপনীত হয়[১১০]। সেপ্টেম্বরের ২ তারিখে মুঘল বাহিনী তেলিয়াগড়ি দখল করে। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে মুনিম খান তাঁড়া দখল করে নিলে দায়ূদ খান উড়িষ্যার দিকে পলায়ন করেন[১১১]। এ অবস্থায় মুনিম খান মুঘল বাহিনীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাঁড়া থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। মুহম্মদ কুলী খান বারলাসের নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল সাতগাঁওয়ের দিকে দায়ূদের বিরুদ্ধে, মজনুন খান, বাবা খান ও অন্যান্যদেরকে ঘোড়াঘাটের আফগানদের বিরুদ্ধে, মুরাদ খানের নেতৃত্বে একদল সৈন্য ফতেহাবাদ ও বাকলার দিকে এবং ইতিমাদ খানের নেতৃত্বে একদল সৈন্য সোনারগাঁওয়ের দিকে প্রেরণ করা হয়। মুনিম খান নিজে তাঁড়ায় অবস্থান করেন এবং সেখান থেকেই এসব কার্যাবলী পরিচালনা করেন[১১২]। ইতোমধ্যে বাংলার যে সকল অঞ্চল মুঘলদের অধীনে চলে আসে সে সকল অঞ্চল মুঘল কর্মকর্তাদেরকে জায়গীর হিসেবে প্রদান করা হলে তারা রাজস্ব সংগ্রহ এবং তাদের অধীনস্থ সৈন্যদলকে সুসজ্জিত করণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এখানে উল্লেখ্য যে, এ সময় ওয়াযীর খান -ই-জামিলকে খলগাঁও, সায়ীদ খান তোকবাইকে সোনারগাঁও, কিয়া খানকে বর্ধওয়ান, এবং সোনার গাঁও ও সাতগাঁওয়ের চতুস্পার্শ্বস্থ অঞ্চলের জায়গীর মুনিম খানের কর্মচারীদেরকে প্রদান করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া অন্যান্য কর্মকর্তাদেরকে অধিকৃত অঞ্চলের বিভিন্ন অংশের জায়গীর প্রদান করা হয়। তবে তাদের জায়গীরের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে জানা যায় না[১১৩]।

যাহোক, মজনুন খান কাকশালের নেতৃত্বাধীন মুঘল বাহিনী কালা পাহাড় ও সুলায়মান মানকলির নেতৃত্বাধীন ঘোড়াঘাটের আফগানদেরকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। যুদ্ধে সুলায়মান মানকলি নিহত হয় এবং পরাজিত আফগানরা ঘোড়াঘাট থেকে কুচবিহারের দিকে পলায়ন করে। মুঘল বাহিনী ঘোড়াঘাট দখল করে নেয়[১১৪]। অন্যদিকে মুহম্মদ কুলী খান বারলাস দায়ূদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া মাত্রই তিনি সাতগাঁও থেকে উড়িষ্যার দিকে পশ্চাদপসরণ করেন। এ সময় সংবাদ পাওয়া যায় যে, দায়ূদের মন্ত্রী শ্রীহরি যশোহরের দিকে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে[১১৫]। দায়ূদ নিজে মুঘলদেরকে মুকাবিলা করার জন্য দেবরা কেসাইয়ে(15 miles east of the Midnapur town) ঘাঁটি গেড়ে বসেন। কিন্তু টোডরমল কর্তৃক নববলে বলীয়ান হয়ে মুহম্মদ কুলী খান বারলাস যখন মান্দারণ থেকে কুলিয়ার (23 miles north - east of Midnapur town) দিকে অগ্রসর হন তখন দায়ূদ গড়হরিপুরের (11 Miles south - east of Danton Station on the B.N.R) দিকে পশ্চাদপসরণ করেন[১১৬]।

ইতোমধ্যে দায়ূদের পিতৃব্য ইমাদ খান কারারানীর পুত্র জোনায়দ কারারানী মুঘলদের জন্য ব্যাপক অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জোনায়দ কারারানী ইতোপূর্বে সুলায়মান কারারানীর শাসনামলে বাংলা থেকে পালিয়ে গিয়ে আকবরের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আকবর তাঁকে হিন্দাউন নামক স্থানে একটি জায়গীর প্রদান করেন কিন্তু সেখান থেকে তিনি গুজরাট গিয়ে আকবরের বিরুদ্ধে আফগান বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিলিত হন। মুঘলদের গুজরাট বিজয়ের পর জোনায়দ একদল সৈন্য নিয়ে বিহারের ঝাড় খন্ডে উপনীত হন এবং বিহারের মুঘল অধিকৃত অঞ্চলে লুন্ঠন যজ্ঞ শুরু করেন। জোনায়দ দায়ূদ খানের সাথে যোগদানের চেষ্টাও করেন। কিন্তু দায়ূদ তাঁকে বিশ্বাস করতে পারেননি। যাহোক, জোনায়দ মুঘল অধিকৃত অঞ্চলে তাঁর লুন্ঠন যজ্ঞ অব্যাহত রাখেন।

Dhaka University Institutional Repository

রাজা টোডরমলের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী মুঘল সৈন্যদল জোনায়দের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে তিনি ঝাড় খন্ডের জঙ্গলে পলায়ন করেন[১১৭]।

১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে মুনিম খান ও রাজা টোডরমল দায়ূদের বিরুদ্ধে একটি তেজস্বী অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন[১১৮]। রাজা টোডরমল ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী মান্দারণ থেকে চেতো পৌঁছেন। বাদশাহ্ আকবরের নির্দেশ পেয়ে ১৬ই ফেব্রুয়ারী মুনিম খানও চেতো পৌঁছেন[১১৯]। অন্যদিকে দায়ূদ খান কারারানী হরিপুরে শক্ত ঘাঁটি গেড়ে বসেন। মুনিম খান ১৮ই ফেব্রুয়ারী চেতো থেকে অগ্রসর হন এবং নানজুরা এসে জানতে পারেন যে, দায়ূদও যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হচ্ছেন। অতপর ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মার্চ তুকারায় নামক স্থানে মুঘল বাহিনী ও আফগান বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হয়[১২০]। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় আফগান বাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণে মুঘল বাহিনী ছত্র ভঙ্গ হয়ে যায় এবং পরাজিত হওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুঘল বাহিনী সৌভাগ্যক্রমে এ যুদ্ধে জয়লাভ করে। দায়ূদ খান কারারানী যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে কটকের দিকে পলায়ন করেন। অনেক আফগান সৈন্য মুঘলদের হাতে বন্দী হয়। বন্দীদেরকে হত্যা করা হয় এবং তাদের ছিন্ন মুন্ডু দিয়ে আটটি মিনার তৈরী করা হয়[১২১]। এ যুদ্ধ তুকারায়ের বা মুঘলমারীর যুদ্ধ নামে খ্যাত[১২২]। কটকে পৌঁছে দায়ূদ খান প্রথমে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মনস্থ করলেও শেষ পর্যন্ত মুনিম খানের নিকট সন্ধির প্রস্তাব দেন। টোডরমলের নিষেধ সত্ত্বেও মুনিম খান দায়ূদের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। দায়ূদ বাদশাহ্ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং মুঘল সামন্ত হিসেবে উড়িষ্যা শাসনের ভার প্রাপ্ত হন। এ চুক্তি কটকের চুক্তি নামে পরিচিত[১২৩]।

তুকারায়ের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দায়ূদ খান কারারানী মুঘলদের সাথে কটকের সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষর করলেও অন্যান্য আফগানরা এ চুক্তি গ্রহণ কিংবা মুঘলদের নিকট তাদের অধিকারভুক্ত অঞ্চল সমর্পণে স্বীকৃত হয়নি। তারা বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অব্যাহত রাখে। আফগান প্রধানরা রোহ্তাস,চাউন্দ এবং সাসারামে তাদের দখল বজায় রাখে। জোনায়দ কারারানী তাঁর ঝাড় খন্ডের ঘাঁটি থেকে দক্ষিণ বিহারে আক্রমণ চালায়। কালা পাহাড়, বাবুই মানকলি ও অনান্য আফগানরা ঘোড়াঘাট থেকে মজনুন

Dhaka University Institutional Repository

কাকশালকে তাড়িয়ে দেয়। তারা গৌড় থেকেও মুঘলদেরকে বিতাড়িত করে এবং সমগ্র উত্তর-বাংলা পুনরধিকার করে নেয়। এমনকি আফগানরা মুঘলদেরকে তাঁড়া পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করেন। যাহোক, মুনিম খান যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতিকে বিপদমুক্ত করেন। তিনি রাজধানী তাঁড়াকে বিমুক্ত করেন এবং দ্রুত গৌড়ের দিকে অগ্রসর হয়ে গৌড় পুনর্দখল করেন। মুনিম খান, মজনুন খান কাকশালের নেতৃত্বে ঘোড়াঘাটের দিকে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করলে তারা আফগানদেরকে পরাস্ত করে ঘোড়াঘাট পুনর্দখল করতে সক্ষম হয়। কিন্তু তখনও আফগানরা উত্তর বাংলা ও দক্ষিণ বিহারে মুঘলদেরকে ঝঞ্ঝাটে ফেলা অব্যাহত রাখে[১১৪]। যাহোক, মুনিম খান ঘোড়াঘাটের আফগানদেরকে দমনে সুবিধা হবে চিন্তা করে রাজধানী তাঁড়া থেকে গৌড়ে স্থানান্তর করেন[১১৫]।গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরের ঠিক একমাস পরে দূষিত আবহাওয়ার কারণে গৌড়ে মহামারী দেখা দেয়। মহামারীর কবলে পড়ে অনেক মুঘল সৈন্য মারা যায়। তখন মুনিম খান তাঁর অনুচরদেরকে তাঁড়ায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি তাঁড়ায় প্রবেশ করতে পারেননি। তাঁড়ার উপকণ্ঠে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন[১১৬]।

মুনিম খানের মৃত্যুতে দায়ুদ খান কারারানী বাংলা ও বিহার পুনরধিকারে অনুপ্রাণিত হন। তিনি দ্রুততার সাথে ভদ্রকের মুঘল সেনাপতি নযর বাহাদুরকে ঘেরাও করেন এবং অতঃপর হত্যা করেন। এ সংবাদ শুনে জালেশ্বরের মুঘল সেনাপতি মুরাদ খান কোন রূপ যুদ্ধ ব্যতিরেকেই তাঁড়ায় পলায়ন করেন। দায়ুদ খান তাঁর রাজধানীতে পুনঃপ্রবেশ করেন এবং আতংক পীড়িত মুঘলদের নিকট থেকে সহজেই তেলিয়াগড়ি পুনরধিকার করেন। এরূপ বিশৃংখল পরিস্থিতিতে জমিদার ঈসা খান মুঘল নৌ - সেনাপতি শাহ্ বর্দীকে পূর্ব-বাংলা থেকে বিতাড়িত করেন। এক কথায় বলা যায় সর্বত্রই মুঘলদের মধ্যে আতংক ও বিশৃংখলা প্রাদুর্ভূত হয় এবং তারা বাংলা ত্যাগ করে পুর্নিয়া ও ত্রিহুতের পথে বিহারের দিকে প্রস্থান করে।[১১৭]

যাহোক, মুনিম খানের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আকবর বৈরাম খানের ভাগ্নেয় খান-- ই- জাহানকে বাংলার সুবাহ্দার নিযুক্ত করেন। খান-ই-জাহানকে সাহায্য করার

জন্য রাজা টোডরমলকেও প্রেরণ করা হয়। ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে তারা আগ্রা ত্যাগ করেন এবং ভাগলপুরের নিকটে তাঁরা বাংলা থেকে পলায়নমান মুঘল কর্মকর্তা ও সৈন্যদের সাথে মিলিত হন। অনেক কষ্টে খান-ই-জাহান ও টোডরমল তাদেরকে বাংলার দিকে পুনঃঅগ্রসর হতে রাজী করান। তেলিয়াগড়িতে আয়ায খাস খেলের নেতৃত্বাধীন ৩০০০ আফগান সৈন্য কর্তৃক মুঘলদের অগ্রগতি বাধা প্রাপ্ত হয়। এক প্রচন্ড সংঘর্ষে মুঘল বাহিনী আফগানদেরকে পরাস্ত করে তেলিয়াগড়ি পুনর্দখল করে।[১২৮] অতঃপর খান-ই-জাহান তাঁড়ার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু দায়ূদ রাজমহলে গঙ্গা নদীর উত্তর - পশ্চিমে এবং পর্বত শ্রেণীর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত সংকীর্ণ স্থানে খান-ই-জাহানের পথ রোধ করেন। এ রাজমহল সংকটে (Rajmahal Pass) দায়ূদ দুর্গ নির্মাণপূর্বক স্বীয় অবস্থা সুদৃঢ় করেন এবং ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত সাত মাস ধরে মুঘলদের গতিরোধ করে রাখেন।[১২৯] সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও খান-ই- জাহান আফগানদের বিরুদ্ধে সফলতা অর্জন করতে পারেননি এবং তাঁর অবস্থান দিন দিন দুর্বলতর হতে থাকে। বৃষ্টিপাত, বিহারে আফগানদের দ্বারা মুঘল বাহিনীর রসদ সরবরাহ রোধ এবং অবস্থান স্থলের প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতি মুঘলদেরকে সাহস শূন্য করে ফেলে। এ ছাড়া সুন্নী মুঘলরা শিয়া খান ই-জাহানের অধীনে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। অধিকন্তু দিন দিন আফগানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং দায়ূদ কৌশলে পাটনা ও হাজীপুরের জমিদার গজপতিকে মুঘল পক্ষ ত্যাগ করণে এবং বিহার ও গাযীপুরে মুঘলদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে প্ররোচিত করেন [১৩০]। এরূপ বিপজ্জনক অবস্থায় খান-ই-জাহান খাদ্য ও নতুন সৈন্য সামন্ত প্রেরণের জন্য আকবরের নিকট জরুরী সাহায্য প্রার্থনা করেন। আকবর আগ্রা থেকে নৌকা বোঝাই করে খাদ্য পাঠান এবং খান - ই-জাহানকে সাহায্য করার জন্য মুজফফর খানকে সত্বর বিহার থেকে বাংলার দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দের ১০ই জুলাই মুজফফর খান তাঁর সৈন্য বাহিনী সহ রাজমহলে খান-ই-জাহানের সাথে যোগদান করেন[১৩১]। অতপর খান-ই-জাহান তাঁর বাহিনীকে যুদ্ধ সাজে সুবিন্যস্ত করেন। ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দের ১২ই জুলাই রাজমহল প্রান্তরে মুঘল ও আফগান বাহিনীর মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়[১৩২]। তুকারায়ের যুদ্ধের মতো এ যুদ্ধেও মুঘল বাহিনী জয়লাভ করে। যুদ্ধ ক্ষেত্র

Dhaka University Institutional Repository

থেকে পলায়ন কালে দায়ুদের ঘোড়া কাদায় আটকে যায়। ফলে দায়ুদ ধৃত হন এবং বন্দী অবস্থায় তাঁকে খান-ই-জাহানের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। দায়ুদ সন্ধির কথা বলেন, খান-ই-জাহানেরও সন্ধি করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অন্যান্য কর্মকর্তাদের দাবী অনুযায়ী দায়ূদ কাররানীকে হত্যা করা হয়, তাঁর ছিন্ন মস্তক আকবরের নিকট প্রেরণ করা হয় এবং তাঁর মস্তক হীন দেহ রাজধানী তাঁড়ায় ঝুলিয়ে রাখা হয়[১০৩]। দায়ূদের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব-ভারতীয় তথা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীন আফগান সালতানাতের অবসান ঘটে[১০৪]।

আফগান ঐতিহাসিক নিয়ামত উল্লাহর মতে দায়ূদের মন্ত্রী কতলু নুহানীর বিশ্বাস ঘাতকতার কারণেই আফগানরা তাঁদের পূর্ব-ভারতীয় সালতানাত হারাতে বাধ্য হয়। তিনি বলেন, কতলু নুহানী খান-ই-জাহানের সাথে এরূপ গোপন বন্দোবস্ত করেছিল যে, দায়ূদের পতনের পর তাকে উড়িষ্যার কিছু জায়গীর প্রদান করতে হবে, এবং সে যুদ্ধের দিন এমন আচরণ করবে যাতে দায়ূদের পরাজয় অনিবার্য হয়ে উঠে । এ অনুযায়ী রাজমহলের যুদ্ধের পর মুঘলরা বাংলা ও বিহারের আফগান অধিকার সমূহ দখল করে নিলেও উড়িষ্যায় কতলু নুহানীর জায়গীর অটুট ছিল। অন্যদিকে শ্রী-হরিও দায়ূদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ যশোহরের জমিদারী লাভ করে[১০৫]। যাহোক, ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আকবর যখন রাজপুতানার বাঁশওয়ারায় অবস্থান করছিলেন তখন টোডরমল ও ইতিমাদ খান খাজাসারা বাদশাহকে কুর্নিশ করেন এবং বাংলার যুদ্ধ লব্ধ সামগ্রী তাঁর সম্মুখে পেশ করেন। এ সামগ্রীর মধ্যে ছিল ৩০৪টি হাতী। সংগে সংগে আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিবরণও বাদশাহকে অবহিত করেন[১০৬]। রাজমহলের যুদ্ধের পর ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দের শেষ অংশ এবং ১৫৭৭ খ্রীস্টাব্দের প্রথম অংশের বাংলার কোন বিবরণ আকবরনামায় পাওয়া যায় না। মনে হয় আকবরনামায় স্থান পাওয়ার মতো কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা তখন বাংলায় ঘটেনি। ধারণা করা যেতে পারে যে, দায়ূদের পতনের পরে আফগানরা এবং বাংলার ভূঁঞারা হতবাক হয়ে যায় এবং তাঁদের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে কিছু ঠিক করতে কিছু সময় লাগে। অন্যদিকে খান -ই-জাহান এ সময় তাঁর বিজিত এলাকায় শান্তি স্থাপন ও শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠনের দিকে মনোনিবেশ করেন[১০৭]।

Dhaka University Institutional Repository

ভাগ ৫ - ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদের মুঘল-হুমকির মুকাবিলা

উপভাগ ১ - ঈসা খান বনাম খান-ই-জাহান ঃ

রাজমহলের যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন কারারানী আফগান শাসক দায়ূদ খানের পতনের সংগে সংগে বাংলায় স্বাধীন আফগান সালতানাতের অবসান ঘটে- একথা যেমনি দিবালোকের মতো সত্য তেমনি এর চেয়েও বড় সত্য হচ্ছে এই যে, দায়ূদ খানের পতনের সংগে সংগেই সারা বাংলায় মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় নি কিংবা বাংলার স্থানীয় নায়কগণ মুঘল আধিপত্য মেনে নেয়নি। মুঘলদের পক্ষে আফগান কেন্দ্রীয় শাসন ভেঙ্গে দেয়া যত সহজ ছিল নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা তত সহজ ছিল না । কেননা তুকারায়ের যুদ্ধে দায়ূদের পরাজয় এবং মুঘলদের সাথে তাঁর সম্পাদিত কটকের সন্ধি -চুক্তি যেমনি বাংলার আফগান প্রধান ও ভূঁঞা-জমিদারগণ মেনে নেয়নি তেমনি রাজমহলের যুদ্ধে দায়ূদের পতনেও বাংলার স্থানীয় নায়কগণ পরাজয় স্বীকার করেননি। দায়ূদের অবর্তমানে তাঁরা ভাটি-প্রধান ঈসা খানের নেতৃত্বে মুঘল বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। বস্তুত ঃ রাজমহলের যুদ্ধের পর থেকেই ঈসা খানের নেতৃত্বে বাংলার স্থানীয় নায়কদের প্রতিরোধ সংগ্রাম তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের আরম্ভ হয়। পূর্বের আলোচনায় দেখা গেছে যে, দায়ূদ কারারানীর পরাজয়ের ফলে ঈসা খানের পৃষ্ঠপোষক পরিবারের পতন ঘটলেও তিনি মুঘলদের আনুগত্য স্বীকার করেন নি, বরং রাজমহলের যুদ্ধের অব্যবহিত পরথেকেই মুঘল বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান সংগঠক ও বার-ভূঁঞাদের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

যাহোক, দায়ূদ কারারানীর পতনের ফলে বাংলার বিভিন্ন আফগান প্রধান ও ভূঁঞা- জমিদারগণ সাময়িক ভাবে হতবাক হয়ে পড়লেও অল্প কালের মধ্যেই তাঁরা তাঁদের পরবর্তী কর্তব্য কর্ম স্থির করে নেয়। এক্ষণে ভাটি-প্রধান ঈসা খানের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে তাঁরা ভাটি অঞ্চলে বিশেষতঃ ঈসা খানের ইকতা সোনারগাঁও এবং মহেশ্বরদী পরগনায় মুঘল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিরোধ সংগ্রামের আয়োজনে সচেষ্ট হয়। ফলশ্রুতিতে ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে ঈসা খান ও তাঁর মিত্রগণ প্রথম মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়। ভাটি- প্রধান ঈসা খানের নেতৃত্বে বাদশাহ আকবরের রাজত্বকালে সংঘটিত বাংলার বিশেষতঃ পূর্ব- বাংলা তথা ভাটির বার-ভূঁঞাদের মুঘল বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম ও বাংলায় মুঘল অভিযানের একমাত্র সমসাময়িক ঐতিহাসিক সূত্র হচ্ছে আবুল ফযলের আকবর নামা। ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদের বিরুদ্ধে পরিচালিত মুঘল সেনাপতিদের অভিযান সংক্রান্ত আবুল ফযলের প্রদত্ত বিবরণ অনেক ক্ষেত্রেই পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। তাঁর প্রদত্ত বিবরণে দেখা যায় যে, ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদের বিরুদ্ধে মুঘল বাহিনী প্রায় সকল অভিযানেই জয়লাভ করে। অন্যদিকে আবুল ফযলের বক্তব্যের যথার্থতা যাচাই না করেই যশস্বী ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারও নিরন্তর মুঘল সেনানায়কদের সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন। যদুনাথ সরকার তাঁর সম্পাদিত <u>The History of Bengal Vol. II</u> -এ ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদের সাথে মুঘল সেনানায়ক খান-ই-জাহান, শাহবায খান, সাদিক খান ও মানসিংহের সংঘটিত সংঘর্ষের যে বিবরণ প্রদান করেন তা পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই সকল ক্ষেত্রে তিনি শুধু আবুল ফযলের প্রদত্ত বিবরণের পুনরাবৃত্তিই করেছেন মাত্র[১৩৮]। এছাড়াও যদুনাথ সরকার আবুল ফযলের পদাংক অনুসরণ করে তাঁর রচনায় "Shahbaz Khan Pacifies Bengal : 1586 -87 ",[১৩৯] "His(Man Singh's) Vigorous Measures,"[১৪০] "the flames of disturbance in deltaic Bengal were quenched"[১৪১] ইত্যাদি উল্লেখ করে মুঘল বাহিনীর গুণগান করেন। কিন্তু ১৫৭৮, ১৫৮৪, ১৫৮৬ এবং ১৫৯৭ খ্রীস্টাব্দে ভাটি অঞ্চলে মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদের প্রতিরোধ সংঘর্ষের বিবরণ ও ফলাফল গভীর ভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, আবুল ফযল কিংবা যদুনাথ সরকারের বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা আবুল ফযল এবং তাঁর অনুকরণে যদুনাথ সরকার পুনঃপুনঃ মুঘলদের সাফল্যের কথা উল্লেখ করলেও ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদেরকে স্ব-স্ব স্থানে নিরাপদে বহাল থাকতে দেখা যায়। এক কথায় বলা যায় যদুনাথ সরকার মুঘল দরবারী ঐতিহাসিক আবুল ফযল প্রদত্ত বিবরণের চর্বিত চর্বণ করেন। এমনকি তাঁর লেখনী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি শুধু বাংলায় দিল্লী কেন্দ্রিক মুঘল সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন ; ভাটি-প্রধান ঈসা খান

Dhaka University Institutional Repository

কিংবা তাঁর মিত্রদের মুঘল আগ্রাসন বিরোধী প্রতিরোধ সংঘর্ষ তথা বাংলার স্থানীয় নায়কদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তাঁর লেখনীতে স্থান পায়নি। কেননা দেখা যায় যে, তিনি মুঘল আগ্রাসন প্রতিরোধকারী বার-ভূঁঞাদের দেশ - প্রেমের প্রতি কটাক্ষপাত করেন এবং মুঘলদের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিরোধ যুদ্ধকে স্বাধীনতা যুদ্ধরূপে আখ্যায়িত করতে কুণ্ঠাবোধ করেন। তিনি বার-ভূঁঞাদেরকে ভুঁইফোড় (upstarts), দস্যু সর্দার(captains of plundering bands), জবর দখলকারী (usurpers), "The Enemies of Mughal peace and Unification" ইত্যাদি হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন যে, প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, ঈসা খান ও আনোয়ার গাযী কোন গোত্র প্রধান (tribal heads) কিংবা কোন পুরাতন এবং পতিত রাজপরিবারের বংশধর (scions of any old and decayed royal house) ছিলেন না[১৮৩]। কিন্তু এক্ষেত্রে যদুনাথ সরকারের সাথে সম্পূর্ণরূপে একমত হওয়া যায় না। কেননা বাদশাহ্ আকবর ও বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে যথাক্রমে ভাটি-প্রধান ঈসা খান ও তাঁর পুত্র মুসা খানের নেতৃত্বে বার-ভূঁঞাগণ যেভাবে অভিন্ন শত্রু ও আক্রমণকারী মুঘলদের বিরুদ্ধে এক যোগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেন তা গভীর মনোযোগের সাথে পর্যালোচনা করলে তাঁদের স্বাধীনচেতা মনোভাব সম্পর্কে কোনরূপ দ্বিধা - দ্বন্দ্ব থাকা সম্ভব নয়। তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থের সাথে স্বদেশ প্রেমের সংযোগ না থাকলে তাঁদের পক্ষে পুরুষানুক্রমে তিন যুগ ধরে বাংলায় মুঘল অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করা সম্ভব হতোনা। এতদ্ভিন্ন আধুনিক ঐতিহাসিকগণ অকুণ্ঠচিত্তে বার-ভূঁঞাদের স্বাধীনচেতা মনোভাব ও স্বদেশ প্রেমের কথা স্বীকার করেছেন। এমন কি তাঁরা ঈসা খানের নেতৃত্বে বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বকালে এবং তাঁর পুত্র মুসা খানের নেতৃত্বে বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বার-ভূঁঞাদের মুঘল বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামকে স্বাধীনতা সংগ্রাম রূপে আখ্যায়িত করেন। এ ক্ষেত্রে নলিনী কান্ত ভট্টশালী ও আবদুল করিমের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ভট্টশালী বার-ভূঁঞাদের দেশ প্রেম সম্পর্কে বলেন যে, "I cannot but say that the thirty - eight years (1575-1612A.D.) struggle for independence of the Bengal Chiefs has not received the recognition it deserves. Rana Pratap of Mewar spent his whole life in fighting Akbar and ended his days sword in hand and independent. We have almost deified Rana Pratap and there is no name more honoured from one end of the

Dhaka University Institutional Repository

country to the other than Rana Pratap's. But what then have the Bengal Chiefs done to deserve this oblivion? They did the same ; they fought with the greatest generals of Akbar, the very generals who had fought Rana Pratap. Rana Pratap was strong in cavalry , the Bengalees were strong in war - boats. The imperial generals were defeated again and again and driven out of Bengal. ...It was not before 1613, in the reign of Jahangir that Bengal was completely subjugated. And all these the Bengal Chiefs accomplished with the children of the soil of Bengal and not with hirelings from Nepal or Rajputana. ... though their Chiefs and their forefathers had fought and maintained their independence for more than a third of a century."[১৪৩] আবদুল করিম বলেন, "দেশ প্রেম না থাকলে বা স্বাধীনচেতা না হলে তারা এত রক্তক্ষয়, লোক ক্ষয় এবং সম্পদ ক্ষয় করবে কেন। ...বার-ভূঁঞার দেশ-প্রেম বা স্বাধীনতা - প্রেম অস্বীকার করা মানে তাদের প্রতি অবিচার করা। মোগলদের তুলনায় তারা ছিল অতি ক্ষুদ্র, ধনবল বা জনবল-এ তারা মোগল সাম্রাজ্যের তুলনায় ছিল অতি নগণ্য, কিন্তু তাদের ছিল অদম্য মনোবল, সাহস এবং দেশ প্রেম, এই পুঁজি নিয়েই তারা কঠোর সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়"[১৪৪]। যাহোক, ভট্টশালী ও আদুল করিমের সাথে সম্পূর্ণরূপে একমত পোষণ করে নিসন্দেহে বলা যায় যে, বার-ভূঁঞাদের দেশ-প্রেম কিংবা স্বাধীনচেতা মনোভাবের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রশ্ন থাকা সমীচীন হবে না। দ্বিতীয়তঃ ঈসা খানকে কোন ক্রমেই ভুঁইফোড় কিংবা তিনি পূর্ববর্তী কোন রাজবংশের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন না; এ রূপ বলা যাবেনা। কেননা পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, ঈসা খানের পিতা সুলায়মান খান বাংলার সৈয়দ বংশীয় সুলতান নুসরাত শাহের কন্যার পাণি গ্রহণ করেছিলেন এবং ঈসা খান ছিলেন নুসরাত শাহের দৌহিত্র। এ ছাড়া পূর্বের আলোচনা থেকে আরো জানা যায় যে, ঈসা খান এ বাংলাতেই জন্ম গ্রহণ করেন এবং তিনি এ মাটিরই সন্তান ছিলেন। এই পূর্ব-বাংলা তথা ভাটি অঞ্চলেই তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনকাল কেটেছে এবং কাররানী বংশের প্রতিষ্ঠাতা তাজ খান কাররানীর নিকট থেকে তিনি এ ভাটি অঞ্চলেই জমিদারী লাভ করেন। বাংলার কাররানী শাসকদের সামন্ত হিসেবেই ঈসা খানের গৌরবময় কর্মজীবনের সূচনা হয় এবং মুঘলদের হস্তে তাঁর পৃষ্ঠপোষক পরিবারের পতন ঘটলেও তিনি মুঘলদের

Dhaka University Institutional Repository

বশ্যতা স্বীকার করেননি, বরং জন্ম ভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় আমরণ সংগ্রামের কঠোর ব্রত গ্রহণ করেন। সুতরাং ঈসা খানকে ভুঁইফোড় কিংবা জবরদখলকারী অথবা দস্যু সর্দার হিসেবে চিহ্নিত করা এবং তাঁর স্বাধীনচেতা মনোভাব ও দেশ-প্রেম সম্পর্কে প্রশ্ন করার অর্থ হবে ঐতিহাসিক সত্যের বিরোধীতার শামিল ।

যাহোক, এখন রাজমহলের যুদ্ধের পর মুঘলদের বিরুদ্ধে ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদের প্রথম প্রতিরোধ সংঘর্ষের ঘটনাবলী নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দের শেষ ভাগে ভাটি-প্রধান ঈসা খানের নেতৃত্বে ভাটি অঞ্চলে বিশেষতঃ ঈসা খানের জমিদারী সোনারগাঁও ও মহেশ্বরদী পরগনায় ইব্রাহিম নারাল, করিম দাদ মুসাজাই এবং অন্যান্য আফগানরা মুঘল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের আয়োজনে সচেষ্ট হন। এমনকি তাঁরা মুঘল নৌ-সেনাপতি শাহ্ বর্দীকেও নিজেদের স্বপক্ষে আনয়নে সক্ষম হন। ফলশ্রুতিতে মুঘল সুবাহ্দার খান-ই-জাহান ভাটি-প্রধান ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। আবুল ফযল আকবরনামায় এ অভিযানের নিম্নরূপ বিবরণ প্রদান করেনঃ "When by the glory of activity and skill the delightful country of Bengal had been cleared of the weeds and rubbish of the ingrates, Ibrahim Naral and Karimdad Musazai waited for an opportunity of making a disturbance in the country of Bhati. Isa the zamindar of that country spent his time in dissimulation. Shah Bardi also, the admiral (mir nawara), raised the head of presumption. The able servant (Khan Jahan) led an army thither.... Shah Bardi, who was a vagabond in the desert of insubordination, accepted good counsels and became loyal. When the town of Bhawal became the station of the army, Ibrahim Naral, Karimdad and other Afghans of that country brought forward propositions of obedience and used the language of harmony. Isa however sate in the ravine of disobedience, and was presumptuous. A large force was sent against him under Shah Bardi and Muhammad Quli. It proceeded by the river Kiyara Sundar, and a hot engagement took place on the borders of Kastal ? Isa was defeated and fled, and much valuable booty fell into the hands of the warriors for dominion. Inasmuch as pride increases the blindness of the heart and eyes, Majlis Dilawar and Majlis Pratap, who were landholders in that part of the country, suddenly brought out a

Dhaka University Institutional Repository

crowd of boats from the rivers and channels and kindled the flames of contention. The warriors of the victorious army lost courage and turned to flee, and in that encounter some of the voyagers left their boats and fled. Muhammad Quli in his activity and courage threw himself upon the enemy's boats and carried on the fight. He contended as much as he could and then was made prisoner... when the army was retreating, Tila Ghazi, a landholder, came and opened the hand of courage so that ... Together with abundant booty they gained their object... proceeded to Sihhatpur which he had founded in the neighbourhood of Tanda."[১৪৫] আবুল ফযলের উপরোক্ত বিবরণ থেকে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী পাওয়া যায়ঃ

"যখন কর্মতৎপরতা ও দক্ষতার চমৎকারিত্বের দ্বারা পরমানন্দদায়ক দেশ বাংলাকে অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের আগাছা ও আবর্জনা থেকে মুক্ত করা হয় (অর্থাৎ বাংলা যখন শান্ত ও বিদ্রোহীদের যখন দমন করা হয়), তখন ইব্রাহিম নারাল ও করিমদাদ মুসাজাই ভাটির দেশে গোলযোগ সৃষ্টির সুযোগের অপেক্ষায় ছিল । সে দেশের (ভাটির) জমিদার ঈসা খান কপটতার সাথে সময় কাটাচ্ছিলেন। এমন কি মুঘল নৌ-সেনাপতি শাহ্ বর্দীও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেন (অর্থাৎ বিদ্রোহ করেন)। ফলশ্রুতিতে খান -ই- জাহান সে দিকে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেন।... শাহ্ বর্দী অবাধ্যতার মরুভূমিতে ভবঘুরের মতো আচরণ করেছিলেন, কিন্তু (খান - ই- জাহানের আগমনের সংবাদ পেয়ে) শুভবুদ্ধির উদ্রেক হলে পুনরায় অনুগত হন। খান - ই- জাহান যখন ভাওয়ালে শিবির স্থাপন করেন তখন ইব্রাহিম নারাল, করিমদাদ এবং ঐ দেশের (ভাটির) অন্যান্য আফগানগণ আনুগত্যের প্রস্তাব দেন এবং আনুগত্যের ভাষায় কথা বলেন (অর্থাৎ তাঁরা মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে নেন)। তৎসত্ত্বেও ঈসা খান আনুগত্য স্বীকার করেননি এবং অবাধ্যই থেকে যান। ফলে শাহ্ বর্দী ও মুহম্মদ কুলীর নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী ঈসা খানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। এ বাহিনী কিয়ারা সুন্দর নদী দিয়ে অগ্রসর হয় এবং কত্রুলের সীমানায় ঈসা খানের সাথে এক প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়। ঈসা খান পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন এবং অনেক মূল্যবান সম্পদ মুঘল সৈন্যদের হস্তগত হয়। যেহেতু অতিমাত্রিক অহমিকা হৃদয় ও চক্ষুকে অন্ধকরে দেয়, সেহেতু মজলিস দিলাওয়ার ও

Dhaka University Institutional Repository

মজলিস প্রতাপ নামক ঐ অঞ্চলের দু'জন জমিদার (landholders) হঠাৎ নিকটবর্তী নদী ও নালা থেকে অসংখ্য যুদ্ধ-নৌকা এনে বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে দেয় (অর্থাৎ ঈসা খানের পরাজয়ের পর মুঘল সৈন্যরা যখন কত্তুলে লুটতরাজে মত্ত তখন মজলিস দিলাওয়ার ও মজলিস প্রতাপ নামক দু'জন স্থানীয় জমিদার ঐ অঞ্চলের নদী-নালা গুলো থেকে অসংখ্য যুদ্ধ-নৌকা এনে অকস্মাৎ মুঘল বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়)। ফলে বিজয়ী সেনাদলের যোদ্ধারা (অর্থাৎ মুঘল সৈন্যরা) সাহস হারিয়ে পলায়ন শুরু করে এবং অনেকেই নৌকা ছেড়ে পলায়ন করে। কিন্তু মুঘল নৌ-সেনাপতি মুহম্মদ কুলী সাহসিকতার সাথে শত্রুপক্ষের নৌকার উপর (অর্থাৎ মজলিস দিলাওয়ার ও মজলিস প্রতাপের পক্ষীয় নৌকার উপর) ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করেন ও বন্দী হন। ... মুঘল সৈন্যরা যখন পশ্চাদপসরণে রত তখন টিলা গাযী নামক একজন জমিদার মুঘলদের প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করেন (অর্থাৎ মুঘল বাহিনীকে পলায়নে সাহায্য করেন)। এতে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ সহ মুঘল বাহিনী ফিরে যেতে সক্ষম হয়। ... অতপর খান- ই- জাহান তাঁড়ার নিকটবর্তী তাঁর প্রতিষ্ঠিত সিহহতপুর শহরের দিকে গমন করেন...।"

এখন আবুল ফযলের বিবরণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর আলোকে ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদের সাথে খান - ই- জাহানের যুদ্ধের গতি প্রকৃতি ও ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। তবে প্রথমেই যুদ্ধ ক্ষেত্রের প্রকৃত অবস্থান নির্ণয়ের জন্য উপরোক্ত স্থান গুলো যেমন ভাওয়াল, কিয়ারা সুন্দর ও কত্তুলের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা গেল ঃ

ভাওয়াল ঃ ভট্টশালী ও আবদুল করিম ভাওয়ালকে ভাওয়াল পরগনার ভাওয়ালের সাথে অভিন্ন মনে করেন। ভাওয়ালের গাযীদের প্রধান কেন্দ্র ছিল চৌরায়। চৌরা লক্ষ্যা নদীর তীরে বর্তমান কালিগঞ্জের নিকট অবস্থিত। বর্তমানে ইহা নাগরী নামে পরিচিত। চৌরা কালিগঞ্জের এক মাইল উত্তরে, টংগী- ভৈরব বাজার রেললাইনের আধামাইল উত্তরে, বর্তমান আড়িখোলা রেল ষ্টেশনের দেড় মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত[১৪৩]।

এগার সিন্দুর ঃ ভট্টশালী ও আবদুল করিম কিয়ারা সুন্দরকে আধুনিক বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত এগার সিন্দুরের সাথে অভিন্ন মনে করেন। এগার সিন্দুর ব্রহ্মপুত্র-নদের প্রধান ধারার পূর্ব তীরে অবস্থিত, ঠিক যে স্থানে পশ্চিম তীরে বানার নদী শাখারূপে বের হয়েছে, তার সামনে । বানার নদী যেখানে ব্রহ্মপুত্রের শাখা হয়ে বের হয়েছে সেখানেই টোক অবস্থিত [১৪৭] ।

কত্তুল ঃ তাঁরা কত্তুলের ভৌগোলিক অবস্থানও নির্ণয় করেন। কত্তুল জোয়ানশাহী পরগনায় অবস্থিত অষ্টগ্রামের দুই মাইল পশ্চিমে মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত[১৪৮] । এই কত্তুলেই ঈসা খানের সাথে মুঘল বাহিনীর সংঘর্ষ হয়।

যাহোক, মুঘল সুবাহ্‌দার খান -ই- জাহান রাজধানী তাঁড়া থেকে ভাটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে প্রথমে গোয়াস যান,[১৪৯] সেখান থেকে তিনি ভাওয়ালে এসে শিবির স্থাপন করেন। পথে তিনি কোথাও অবস্থান করেন কিনা তা আবুল ফযল উল্লেখ করেননি। ভাওয়ালে শিবির স্থাপন করায় প্রতীয়মান হয় যে, খান - ই- জাহান লক্ষ্যা নদী দিয়ে অগ্রসর হয়েই লক্ষ্যার তীরে অবস্থিত ভাওয়াল শহর তথা চৌরা নামক স্থানে পৌঁছেন। আপাত দৃষ্টিতে ইব্রাহিম নারাল ও করিমদাদ মুসাজাই, খান - ই- জাহানের প্রথম প্রতিপক্ষ হলেও তাঁদের পশ্চাতে নেতৃত্ব দান কারী প্রধান শক্তি ছিলেন ঈসা খান। কেননা আবুল ফযলের বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইব্রাহিম নারাল ও করিমদাদ মুসাজাই তখন ঈসা খানের জমিদারীতেই অবস্থান করছিলেন। সুতরাং ইহা নির্দ্ধিধায় বলা যায় যে, ঈসা খানের আশ্রয়ে থেকে এবং তাঁর মদদ পুষ্ট হয়েই তাঁরা মুঘল বিরোধী কর্মতৎপরতায় লিপ্ত হয়েছিলেন। পূর্বের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, তখন ঈসা খান ছিলেন সোনারগাঁও ও মহেশ্বরদী, মজলিস দিলাওয়ার ছিলেন জোয়ানশাহী এবং মজলিস প্রতাপ ছিলেন খালিয়াজুরী পরগনার জমিদার । আবুল ফযলের বর্ণনায় দেখা যায় যে, কত্তুলের যুদ্ধে ঈসা খানের পরাজয়ের অব্যবহিত পরেই মজলিস দিলাওয়ার ও মজলিস প্রতাপ মুঘল বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, এতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরাও ঈসা খানের নেতৃত্বে আস্থাশীল ছিলেন এবং এজন্যই মুঘল আগ্রাসন প্রতিরোধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এককথায় বলা যায় যে, ইব্রাহিম নারাল, করিমদাদ মুসাজাই, মজলিস

Dhaka University Institutional Repository

দিলাওয়ার ও মজলিস প্রতাপ সকলেই ছিলেন ঈসা খানের মিত্র অর্থাৎ সোনারগাঁও, মহেশ্বরদী, জোয়ানশাহী ও খালিয়াজুরী পরগনার জমিদারগণ ছিলেন খান - ই- জাহানের প্রতিপক্ষ। সুতরাং দেখা যায় যে, লক্ষ্যা, বানার, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা বিধৌত বিস্তীর্ণ এলাকার জমিদারগণ ঈসা খানের নেতৃত্বে মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা মুঘল নৌ-সেনাপতি শাহ্ বর্দীকেও নিজেদের দলভুক্ত করে নিতে সক্ষম হন। যাহোক, খান - ই- জাহান ভাওয়ালে শিবির স্থাপন করলে ইব্রাহিম নারাল, করিমদাদ ও অন্যান্য আফগানগণ খান -ই- জাহানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। শাহ্ বর্দীও পুনরায় মুঘল শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু প্রধান প্রতিপক্ষ ঈসা খান আত্মসমর্পণ করেননি। ফলশ্রুতিতে খান -ই- জাহান, শাহ্বর্দী ও মুহম্মদ কুলীর নেতৃত্বে ঈসা খানের বিরুদ্ধে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ অবস্থায় ঈসা খান মুঘল বাহিনীর আগমনের সংবাদ শুনেই তাঁর জমিদারী থেকে পশ্চাদপসরণ করতে থাকেন। এ পশ্চাদপসরণ ছিল ঈসা খানের একটি যুদ্ধ কৌশল। কেননা তিনি অনুধাবন করেন যে, খান - ই- জাহানের নেতৃত্বাধীন যে মুঘল বাহিনী দায়ূদখান কারারানীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছে সে মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফলতা অর্জন করতে হলে যুদ্ধ ক্ষেত্রের জন্য তাঁর এমন একটা কৌশলগত স্থান বেছে নেয়া উচিৎ যে স্থান থেকে তিনি তাঁর সামরিক শক্তির প্রধান ভিত্তি যুদ্ধ- নৌকার জন্য বাড়তি সুযোগ পেতে পারেন এবং প্রয়োজন বোধে নিরাপদে সে স্থান থেকে সরে পড়তে পারেন। এখানে উল্লেখ্য যে, নদী- নালায় পরিপূর্ণ পূর্ব - বাংলা তথা ভাটি অঞ্চলে তখন নৌকাই ছিল প্রধান যুদ্ধোপকরণ। এ যুদ্ধ - নৌকাই ছিল ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদের সামরিক শক্তির প্রধান ভিত্তি এবং তাঁরা ছিল নৌ-যুদ্ধে পারদর্শী। অন্য দিকে মুঘল বাহিনীর প্রধান বল ছিল অশ্বারোহী সৈন্য, সম্ভবত এ কারণেই ঈসা খান মুঘলদের সাথে স্থল-যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চান নি। অধিকন্তু মুঘল বাহিনীর আক্রমণ থেকে নিজ জমিদারীকে নিরাপদ রাখার নিমিত্তে মুঘল বাহিনীর দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্যই তিনি এই পশ্চাদপসরণ কৌশল অবলম্বন করেন। যাহোক, ঈসা খানের উদ্দেশ্য ছিল মুঘল বাহিনীকে এমন এক কৌশলগত স্থানে নিয়ে যাওয়া যেখানে তাদের প্রধান শক্তি অশ্বারোহী বাহিনী কোন কাজে আসবে না এবং তারা নৌ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেই বাধ্য হবে।

Dhaka University Institutional Repository

এ সব দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, মেঘনা নদীর তীরে অষ্টগ্রামের দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কস্তুল ছিল ঐ ধরনেরই একটি স্থান যেখানে কোন ক্রমেই স্থল-যুদ্ধ সম্ভব ছিল না এবং সেখানে নৌ-বহর ব্যতিরেকে যুদ্ধ পরিচালনা ছিল এক কথায় অসম্ভব। কেননা জোয়ানশাহী[১৩০] পরগনার অন্তর্গত কস্তুল এমন একটি স্থানে অবস্থিত যার চতুর্দিকে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে শুধু পানি আর পানি এবং সেখানে একমাত্র তাদের পক্ষেই যুদ্ধে সফলতা অর্জন সম্ভব যারা এ স্থানের নদী-নালার সাথে সমধিক পরিচিত। এসব কারণেই ঈসা খান যুদ্ধস্থান হিসেবে কস্তুলকে বেছে নিয়েছেন বললে ভুল হবে না। যাহোক, শাহ বর্দী ও মুহম্মদ কুলীর নেতৃত্বাধীন মুঘল বাহিনী লক্ষ্যা নদী ধরে অগ্রসর হয়ে এগার সিন্দুর পৌঁছে এবং ব্রহ্মপুত্রের মাধ্যমে মেঘনা নদী দিয়ে জোয়ানশাহী পরগনার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এ ভাবে মুঘল বাহিনী যখন কস্তুলের সীমানায় পৌঁছে তখন ঈসা খান তাদের গতিরোধ করেন। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচন্ড সংঘর্ষ হয়। ঈসা খান মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে টিকতে না পেরে পরাজিত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে সরে পড়েন। এখানে উল্লেখ্য যে, আবুল ফযল যুদ্ধে ঈসা খানের পরাজয় ও পলায়নের কথা বললেও ঈসা খান কোথায় পলায়ন করেন তা আবুল ফযলের বিবরণ থেকে জানা যায় না । তবে ভট্টশালী ও আবদুল করিম ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালার উদ্ধৃতি দিয়ে মত প্রকাশ করেন যে, ঈসা খান মুঘলদের নিকট পরাজিত হয়ে মেহেরকুলের পথ ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে যান এবং ত্রিপুরা রাজ অমর মাণিক্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন[১৩১]। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁদের সাথে একমত হওয়া যায় না এবং এ বিষয়ে আপত্তির কারণ সমূহ পূর্বের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। এতদভিন্ন এক্ষেত্রে সঠিক বক্তব্য হচ্ছে এই যে, ঈসা খান পরাজিত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে সরে পড়লেও তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে যাননি, তাঁর পক্ষে তাঁর মিত্র মজলিস প্রতাপের জমিদারী খালিয়াজুরী পরগনায় আশ্রয় নেয়াই ছিল স্বাভাবিক। কেননা যুদ্ধ হয় মজলিস দিলাওয়ারের জমিদারী জোয়ানশাহী পরগনার অন্তর্গত কস্তুলে এবং এ পরগনার উত্তরে অবস্থিত খালিয়াজুরী ছিল যুদ্ধহীন ও বিলপূর্ণ হওয়ায় নিরাপদও ছিল। সুতরাং ভিনদেশী রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়া অপেক্ষা তাঁর পক্ষে বিলপূর্ণ মিত্র জমিদারীতে আশ্রয় নেয়া অধিকতর যুক্তি সংগত নয় কি ? যাহোক, ধারণা করা যায় যে, ঈসা খান মুঘলদের সাথে যুদ্ধে টিকতে না পেরে যুদ্ধ ক্ষেত্র কস্তুল

ত্যাগ করে আরো উত্তর দিকে পশ্চাদপসরণ করেন এবং খালিয়াজুরী পরগনায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঈসা খানের এ পলায়ন কিংবা পশ্চাদপসরণও ছিল একটি যুদ্ধকৌশল। কেননা ঈসা খান যখন জোয়ানশাহী পরগনার অন্তর্গত কস্তুলে মুঘলবাহিনীর সাথে যুদ্ধরত ছিলেন তখন এপরগনা ও এর উত্তরাস্থ পরগনার জমিদার মজলিস দিলাওয়ার ও মজলিস প্রতাপ কোন ভূমিকা পালন করেন কিনা তা আবুল ফযল উল্লেখ করেননি। কিন্তু ঈসা খানের পরাজয়ের পর মুঘল বাহিনী যখন কস্তুলে লুটতরাজে মত্ত তখন মজলিস দিলাওয়ার ও মজলিস প্রতাপ ঐ অঞ্চলের নদী-নালা থেকে অসংখ্য যুদ্ধ - নৌকা এনে হঠাৎ মুঘল বাহিনীর উপর আক্রমণ রচনা করায় মনে হয় যে, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁরা হয়তঃ নিকটবর্তী কোন স্থানে অবস্থান করে ঈসা খান ও মুঘল বাহিনীর মধ্যকার যুদ্ধের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং ঈসা খানের পরাজয় ও সরে পড়ার পর যুদ্ধে জয় লাভ করেছে মনে করে মুঘল বাহিনী যখন লুটতরাজে মত্ত তখন মুঘল বাহিনীর এই অসতর্কতার মুহূর্তে তাঁরা এসে অকস্মাৎ মুঘল বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। এরূপ ধারণার কারণ হচ্ছে এই যে, ঈসা খান হয়তঃ পূর্বেই তাঁর মিত্রদের সাথে এরূপ পরিকল্পনা স্থির করে রেখেছিলেন যে, প্রথমে তিনি নিজে মুঘলদের গতিরোধ করবেন এবং যুদ্ধে টিকতে না পারলে যুদ্ধ স্থান ত্যাগ করে সরে পড়বেন। যেহেতু ঈসা খানই ছিলেন মুঘলদের প্রধান প্রতিপক্ষ সেহেতু তিনি যখন পরাজিত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করে সরে পড়বেন তখন মুঘল বাহিনী যুদ্ধে জয়লাভ করেছে মনে করবে এবং যখনই তারা লুটতরাজে মত্ত হবে তখনই যেন মজলিস দিলাওয়ার ও মজলিস প্রতাপ অকস্মাৎ মুঘল বাহিনীর উপর আক্রমণ রচনা করেন। এ অকস্মাৎ আক্রমণে মুঘল বাহিনী হতবাক হয়ে পড়বে এবং পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হবে। এ রূপ অসতর্ক মুহূর্তে প্রতিপক্ষের যুদ্ধ জয়ের নযীর ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে দায়ূদখান কারারানী ও মুঘল সেনাপতি মুনিম খানের মধ্যে সংঘটিত তুকারায়ের যুদ্ধের প্রথম অবস্থার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তুকারায়ের যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় আফগানদের প্রচন্ড আক্রমণে মুঘল বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং মুঘল সেনাপতি মুনিম খান আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। এ অবস্থায় আফগান বাহিনী যুদ্ধে জয় লাভ করেছে বলে মনে করে লুটতরাজে মত্ত হয়। ফলে আফগানদের মধ্যেও বিশৃংখলা দেখা

Dhaka University Institutional Repository

দেয়। মুঘল সেনাপতিরা এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে এবং কিয়া খান ও অন্যান্য সেনাপতিরা তাঁদের সৈন্যদের পুনরায় একত্রিত করে বিশৃংখল আফগানদেরকে আক্রমণ করে[১৩২]। ফলশ্রুতিতে শেষ পর্যন্ত মুঘল বাহিনীই যুদ্ধে জয় লাভ করে। বলা বাহুল্য ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদের সাথে যুদ্ধে মুঘল বাহিনীর পরিণতি উপরোক্ত আফগান বাহিনীর অনুরূপই হয়েছিল। কেননা দেখা যায় যে, মুঘল বাহিনী যুদ্ধে জয়লাভ করেছে বলে মনে করে যখনই লুটতরাজে মত্ত হয় তখনই মজলিস দিলাওয়ার ও মজলিস প্রতাপ মুঘলদের অসতর্কতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে তাদের উপর অকস্মাৎ আক্রমণ চালায়। ফলশ্রুতিতে মুঘল বাহিনী শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয় এবং মুঘল সৈন্যরা সাহস হারিয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয় এবং মুঘল নৌ-সেনাপতি মুহম্মদ কুলীও ঈসা খানের মিত্রদের হস্তে বন্দী হয়। এমনকি তালিপাবাদের জমিদার টিলা গাযী মুঘলদেরকে পলায়নে সাহায্য না করলে তারা নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতো না। সুতরাং দেখা যায় যে, ঈসা খানের কৌশল সফল হয়েছে। এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। যাহোক, আবুল ফযল মুখ রক্ষার জন্য যুদ্ধ - লব্ধ সম্পদসহ মুঘল বাহিনী ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছে এবং শত্রুরা অর্থাৎ ঈসা খান ও তাঁর মিত্ররা নিরাশ হয়ে পড়েছে বললেও বস্তুতঃ খান - ই- জাহান যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাহিনী নিয়েই সিহহতপুরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ ভাবেই ভাটি-প্রধান ঈসা খানের নেতৃত্বে পূর্ব-বাংলার স্বাধীনতাকামী ভূঁঞা-জমিদারদের প্রথম প্রতিরোধ সংগ্রাম তথা স্বাধীনতা-সংরক্ষণ সংগ্রামের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, রাজমহলের যুদ্ধে দায়ূদ খান কাররানীর পতন হলেও সমগ্র বাংলা বিশেষতঃ পূর্ব - বাংলা তথা ভাটি অঞ্চলের ঈসা খান ও তাঁর মিত্র জমিদারগণ বাদশাহ্ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়নি। দায়ূদের পতনে তাঁরা সাময়িকভাবে হতবাক হয়ে পড়লেও অল্পকালের মধ্যেই ভাটি- প্রধান ঈসা খানের নেতৃত্বে সুসংগঠিত হয়ে তাঁরা পরবর্তী কর্তব্যকর্ম স্থির করে নেয় এবং ঈসা খানের ইকতা সোনারগাঁও ও মহেশ্বরদী পরগনায় মুঘল বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের আয়োজনে সচেষ্ট হয়। এমনকি তাঁরা মুঘল নৌ-সেনাপতি শাহ্ বর্দীকেও নিজেদের দলভুক্ত করাতে

Dhaka University Institutional Repository

সক্ষম হয়েছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে মুঘল সুবাহ্দার খান - ই- জাহান রাজধানী তাঁড়া থেকে ভাটি অভিযানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। প্রথম দিকে খান - ই- জাহানের প্রতিপক্ষ ছিল ভাটি- প্রধান ঈসা খান, ইব্রাহিম নারাল ও করিমদাদ মুসাজাই এবং পরে মজলিস দিলাওয়ার ও মজলিস প্রতাপ। খান - ই- জাহান ভাওয়াল শহরে শিবির স্থাপন করলে প্রথম অবস্থায় ইব্রাহিম নারাল ও করিমদাদ মুসাজাই এবং অন্যান্য আফগানগণ তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। শাহ্ বর্দীও মুঘল শিবিরে পুনঃযোগদান করেন । তৎসত্ত্বেও প্রধান প্রতিপক্ষ ঈসা খান আত্মসমর্পণ করেননি। ফলশ্রুতিতে শাহ্ বর্দী ও মুহম্মদ কুলীর নেতৃত্বে ঈসা খানের বিরুদ্ধে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হয়। কস্তুলের নিকট সংঘটিত যুদ্ধে প্রথম দিকে ঈসা খান মুঘল বাহিনীর হস্তে পরাজিত হলেও অপূর্ব যুদ্ধ কৌশল অবলম্বনের কারণে শেষ পর্যন্ত ঈসা খান ও তাঁর মিত্র মজলিস দিলাওয়ার ও মজলিস প্রতাপের হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে মুঘল সৈন্যরা পলায়ন করে। ফলশ্রুতিতে খান - ই- জাহান, ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদেরকে দমন করতে এসে নিজেই তাঁদের হস্তে নিস্তানাবুদ হয়ে ভাটি ত্যাগ করে সিহহতপুরে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। ভাটি থেকে প্রত্যাবর্তনের কয়েকদিন পরে ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি সিহহতপুরে মৃত্যুবরণ করেন[১৫৩]। অন্যদিকে ভাটি-প্রধান ঈসা খান, খান - ই- জাহানের নেতৃত্বাধীন এই মুঘল আক্রমণ সফলতার সাথে প্রতিরোধ করে নিরাপদে নিজ জমিদারীতে বহাল থাকেন। পরিশেষে বলা যায় যে, ঈসা খানের অসাধারণ বুদ্ধি মত্তা, যোগ্য নেতৃত্ব ও অপূর্ব যুদ্ধ কৌশলের কারণেই তুলনামূলক ভাবে সীমিত সৈন্যবল ও অস্ত্রবলের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ঈসা খান ও তাঁর মিত্রগণ বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী মহাপরাক্রমশালী বাদশাহ্ আকবরের সেনাবাহিনীকে প্রথমবারের মতো পূর্ব - বাংলা তথা ভাটি অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সীমিত সৈন্যবল ও অস্ত্রবল নিয়ে বিশাল মুঘল বাহিনীর উপর বিজয় লাভ নিঃসন্দেহে ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদের মনোবল বহুলাংশে বৃদ্ধি করে, যা তাঁদের স্বাধীনচেতা মনোভাবকে আরো তীব্রতর করে। ফলে ভাটি-প্রধান ঈসা খান হয়ে উঠেন দুর্দমনীয় এবং পূর্ব-বাংলা তথা ভাটি অঞ্চলে মুঘল সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ ও আধিপত্য স্থাপনের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। যে কারণে

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায় যে, পরবর্তী সময়ে বাদশাহ্ আকবর ঈসা খানকে দমনের জন্য কয়েক দফা তাঁর বিখ্যাত সেনানায়কদেরকে ভাটি অভিযানে প্রেরণ করেন।

ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদের মুঘল-হুমকির মুকাবিলা

উপভাগ ২- ঈসা খান বনাম শাহ্‌বায খান ঃ

ঈসা খান তাঁর মিত্রদের সহায়তায় ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে সুবাহ্‌দার খান-ই-জাহানের নেতৃত্বাধীন মুঘল আক্রমণ সফলতার সাথে প্রতিহত করার পর থেকে ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দের মার্চ-এপ্রিলের পূর্ব পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী কয়েক বছর তাঁকে কোন প্রকার মুঘল আক্রমণের সন্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু এর অর্থ - এই নয় যে, খান-ই-জাহানের শোচনীয় পরাজয়ের ফলে সাম্রাজ্যবাদী মুঘল বাদশাহ্ আকবরের পররাজ্য গ্রাসী মনোভাবের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে কিংবা মুঘলরা ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদের স্বাধীনচেতা মনোভাবকে মেনে নিয়েছে। বস্তুত এর কোনটাই ঘটেনি, বরং উল্টোটাই ঘটেছে। কেননা দেখা যায় যে, ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে শাহ্‌বায খানের[১৭৬] নেতৃত্বে ভাটির বিরুদ্ধে মুঘলদের দ্বিতীয় এবং এতদঞ্চলে শাহ্‌বায খানের প্রথম অভিযান পরিচালিত হয়। এ'তে প্রমাণিত হয় যে, ভাটি অভিযানে খান-ই-জাহানের চরম বিপর্যয় ঘটলেও মুঘলদের আগ্রাসন নীতির বিন্দু মাত্র পরিবর্তন হয়নি এবং তারা ভাটি আক্রমণের পরিকল্পনাও ত্যাগ করেনি। তবে কয়েক বছর বিরতির পর দ্বিতীয়বার ভাটি আক্রমণ করায় ধরে নেয়া যায় যে, প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রতিকূল অবস্থার কারণে মুঘলরা এই মধ্যবর্তী কয়েকবছর ভাটি আক্রমণ করতে পারেনি। প্রথমত ঃ খান-ই-জাহান ভাটি অভিযানে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার অল্পদিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করায় সম্ভবতঃ তাৎক্ষণিক ভাবে পুনরায় ভাটি অভিযান করা মুঘলদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কেননা তারা হয়তো বাদশাহের পরবর্তী নির্দেশ কিংবা নতুন সুবাহ্‌দারের আগমনের অপেক্ষায় ছিল। খান-ই-জাহানের মৃত্যুর প্রায় ৪ মাস পর নতুন সুবাহ্‌দার মুজফফর খান তুরবতী বাংলায় আগমন করেন[১৭৭]। তাঁর বাংলায় আগমনের প্রায় সংগে সংগেই বিহার ও বাংলায় মুঘল সেনানায়কদের

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্রোহ হয়। প্রথম থেকেই তিনি বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হন এবং ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল বিদ্রোহীদের হাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে[১৭৬]। ফলে ভাটি অভিযানের সুযোগ তিনি পান নি। অন্যদিকে মুজফফর খানকে হত্যা করার সংগে সংগেই বিদ্রোহীরা বাংলায় সরকার গঠন করে এবং ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দুই বছর তারা বাংলা শাসন করে। এই দুই বছর বাংলায় বাদশাহ্ আকবরের কোন কর্তৃত্ব ছিল না[১৭৭]। ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখে আকবর মীর্যা আযীয কোকাকে বাংলার সুবাহ্দার নিযুক্ত করেন। ১৫৮৩ খ্রীস্টাব্দের মে-মাস পর্যন্ত তিনি বাংলার সুবাহ্দারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন[১৭৮]। বিদ্রোহীদের সংগে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় তিনিও ভাটি অভিযান করতে পারেননি। মীর্যা আযীয কোকার পর বাদশাহ্ আকবর শাহ্বায খানকে ১৫৮৩ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই মে তারিখে বাংলার সুবাহ্দার নিযুক্ত করেন। তিনি সুবাহ্দার নিযুক্ত হওয়ার ৫ মাস পর সুবাহ্দারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন[১৭৯]। শাহ্বায খান দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই বিদ্রোহীদের দমনে আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৫৮৩ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর এক যুদ্ধে বিদ্রোহীদের প্রধান নেতা মাসুম খান কাবুলী[১৮০] শাহ্বায খানের নিকট পরাজিত হয়ে ভাটির দিকে পলায়ন করে। এ সুযোগে শাহ্বায খান বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাঁটি ঘোড়াঘাট ও শেরপুর মুর্চা দখল করে নেন। ফলে ১৫৮৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে যমুনা নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত এলাকা মুঘলদের দখলে আসে[১৮১]। অতপর শাহ্বায খান ভাটি আক্রমণের পরিকল্পনা করেন এবং ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দের মার্চ-এপ্রিলের দিকে ভাটি আক্রমণ শুরু করেন[১৮২]। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্রোহী মুঘল সেনানায়কদেরকে দমনে ব্যস্ত থাকার কারণে মুঘলরা ভাটি আক্রমণ করার সুযোগ পায়নি। জানা যায় যে, বাদশাহ্ আকবরের বিরুদ্ধে মুঘল সেনানায়কদের এ বিদ্রোহ মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত নেড়ে দিয়েছিল। যাহোক, এক কথায় বলা যায় যে, এই মধ্যবর্তী কয়েক বছর মুঘলরা নিজেদের ঘর সামলাতে এতই ব্যস্ত ছিল যে, তাদের পক্ষে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ঈসা খান এবং তাঁর মিত্রদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়তঃ অন্যদিকে ঈসা খান কিন্তু এই মধ্যবর্তী কয়েক বছর নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকেন নি। মুঘলদের এ আত্মকলহের সুযোগে তিনি নিজের শক্তি আরো বৃদ্ধি করেন এবং প্রায় সম্পূর্ণ ভাটি অঞ্চলে স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। আবুল ফযল এ

Dhaka University Institutional Repository

সময় ঈসা খানকে ভাটির শাসক হিসেবে উল্লেখ করেন[১৮৩]। এমনকি এ সময় ঈসা খান এতই শক্তিশালী ছিলেন যে, তিনি কুচ রাজ্যেও সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। কেননা দেখা যায় যে, আবুল ফযল ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে শাহ্বায খানের ভাটি অভিযানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, "At this time Isa, who had gone to Koc (Cooch Bihar) arrived with a large and well - equipped army."[১৮৪] আবুল ফযলের এ উক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঈসা খান তাঁর এ অভিযানে সফল হয়েছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে এক বিশাল ও সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে ফিরে আসা সম্ভব হয়েছিল। যাহোক, ইহা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, মুঘলরা ঈসা খানের শক্তি ও সামর্থ্যের কথা চিন্তা করেই হয়তো নিজেদের ঘর সামলানোর পূর্বে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে উৎসাহী হয়নি।

যাহোক, মুঘল বিদ্রোহীদের দমনে কিছুটা সফলতা অর্জনের পরেই দেখা যায় যে, ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দের মার্চ - এপ্রিলের দিকে শাহ্বায খান ভাটি অভিযান করেন। আবুল ফযল এ অভিযানের বিবরণ দেন নিম্নরূপ ঃ "When the bank of the river Ganges near Khizrpur became an imperial camp, there were strong forts on the two sides of the river ...In a short time both of these were taken with severe fighting, and Sonargaon came into the possession of the imperial servants. They also reached Karabuh? Which was his (Isa's) home. That populous city was plundered. A force was sent against Bara Sindar, which is a large town , and much plunder was obtained. From there they came to the Brahmaputra... After a little fight, which took place with the scouts (qarawalan), Masum lost firmness and took refuge in an island. He was nearly made prisoner. At this time Isa, who had gone to Koc (Cooch Bihar) arrived with a large and well - equipped army. The imperial servants took post at Totak on the bank of the said river and opposite the city of Kinara Sindar and established a fort there. On both sides there were hot engagements by land and water. The imperialists were continually successful. They sent to Tarsun K. and directed that he should make a demonstration at Bajasrapur and so distract the enemy (lit.make them of two minds or hearts). Two roads led from the town of Bhawal (i.e. Nagari). One was far away from the enemy and the other was by the

Dhaka University Institutional Repository

river bank. and this was very near them. By heaven's decree Tarsun K. took the latter route. Masum K. heard of this and marched rapidly with a large force. Shahbaz K. sent Muhibb Ali K., Rajah Gopal, Khangar and others. He also sent a swift courier to warn him and to bid him take up a strong position until the reinforcements arrived. He (Tarsun) did not believe the message and grieved for Shahbaz K., thinking (or saying) that the rebels had committed a fraud, and had by this contrivance separated a body of troops from Shahbaz. As the courier was very urgent and his companions represented the advantages of caution and the evils of carelessness , he set about looking for a shelter and found a suitable place. But as he in no way believed what the courier said he did not halt there but went on towards the camp (of Shahbaz). Just then news came that an enemy was approaching. He cast away the thread of farsightedness and concluded that it was the reinforcement, and was preparing to receive it with hospitality. He had gone some steps when the tumult of the foe filled with dust the field of his security. Though his well wishers urged him to hasten to the shelter until the men should come from the camp (of Shahbaz) and urged that possibly the officers of the reinforcement might come up, it was of no avail. He set himself with a strong heart and a tranquil mind to engage in combat. Some went off, alleging that they were going for arms. Though not more than fifteen men remained with him, he boldly took the field. Faridun Husain, and Ali Yar, who was related to him, were favoured by fortune and bought eternal fame with the money of life. Tarsun K. was wounded and made prisoner. Masum K. ... put him to death,"

"When he went there, he encamped on the bank of the Panar which is a branch of the Brahmaputra. He occupied himself in sending messages and in giving counsels. The suggestion was that he (Isa) should deliver up the rebels, or drive them away from his presence. Isa had recourse to coaxing expressions, and for a time indulged in plausible speeches. When it appeared that his tongue and his heart were not in accord, there arose the turbulence of battle . For seven months there were victories

Dhaka University Institutional Repository

from time to time, and the evil - doers were put to shame and suffered failure. It was a time when both parties (Shahbaz and his officers) should have lighted the lamp of discernment, and have practised conciliatory measures. But from somnolences of intellect, there was an increase of blindness, and arrogance rose high. From self-conceit Shahbaz K. vexed people, and his officers snapped the thread of moderation and behaved in a silly manner. The evil- doings of the enemy increased. Death (Pestilence) made his appearance and the stock of life became dear. The enemy relied upon the circumstances that the rainy season was at hand, and that the victorious troops would be compelled to return. Fortunately the rainfall was less than usual, and so they had to wait in a shameful condition for the dark days. They collected a number of diggers (bildar) and cut the (bank of) river Brahmaputra in fifteen places. The water rushed upon the camp and the batteries were submerged. The enemy brought large war - boats, which had very high and long bows, and in the country language are called pitara, and took them close to Shahbaz K.'s fort. On both sides there was firing of artillery and muskets. The warriors were somewhat disconcerted, but by heaven's aid the enemy's leader was struck by a bullet and killed, and some boats were broken to pieces, and all at once the waters decreased, and the enemy had to fly. A large amount of booty was obtained, and many of the enemy were drowned... But the foe prevailed against Saiyid Husain, the thanadar of Dacca, and he was made prisoner. Isa awoke from his heavy sleep of ignorance and set afoot negotiations for peace through the instrumentality of his prisoner. Shahbaz K. accepted them. Isa bound up the waist of obedience, and thought that by service he would obtain deliverance. He agreed that a royal daroghah should be appointed in the port of Sonargaon, and that Masum should be sent to the Hijaz. He also sent presents and peshkash and won over the hearts of the officers by large gifts, and the victorious army retired. When Shahbaz K. had crossed the rivers and reached Bhawal, and was looking for the fulfilment of Isa's promises (lit. for words to be converted into deeds), wicked men in the army in improper language made Isa doubtful in his mind. He changed his language, and brought forward conditions.

Dhaka University Institutional Repository

The commander of the army was indignant, and said that to make confusions on every occasion and to introduce new clauses was not the rule with right-minded persons. He became stern and spoke harshly. Preparations were made for battle, and on 19 Mihr, divine month, 30 September 1584, that crooked - minded one (Isa) came forward to fight. The officers from short-sightedness saw their gain in what was their loss, and thought that the defeat of Shahbaz K. would be an advantage to themselves . The first to go off without fighting was Muhibb Ali K. Every one left his place and went a roadless road. Shah Quli K. Mahram made some stand and fought, but from being unsupported and from being wounded he left Bhawal. Shahbaz K. awoke from his sleep of haughtiness and made some effort to win the affections of his officers, but misplaced repentance is of no avail. He was obliged to march for Tanda. All his collections were lost, and the sons of Mir Adila and others were made prisoners. S. Muhammad Ghaznavi and others were killed."[১৬৫]

আবুল ফযলের উপরোক্ত বিবরণ থেকে মোটামুটি নিম্নলিখিত তথ্যাবলী পাওয়া যায় ঃ

"শাহ্বায খান গংগা নদীর তীরবর্তী খিযিরপুরের নিকটে শিবির স্থাপন করেন। খিযিরপুরে নদীর দুই তীরে দু'টি দুর্গ ছিল। মুঘল বাহিনী প্রচন্ড যুদ্ধ করে অল্পক্ষণের মধ্যেই দুর্গ দু'টি দখল করে নেয় এবং সোনারগাঁওও মুঘল বাহিনীর অধিকারে চলে আসে। এমনকি তারা ঈসা খানের বাসস্থান কতরাবতেও (কারাভু) পৌঁছে এবং ঐ জনাকীর্ণ শহরটিও লুণ্ঠিত হয়। সেখান থেকে একটি বাহিনী এগার সিন্দুরের (বারা সিন্দর) বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়, এ শহরটিও বড় এবং ইহাও লুট করা হয়। সেখান থেকে মুঘল বাহিনী লক্ষ্যা বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রে আসে। এখানে অগ্রগামী সৈন্যদের সাথে সামান্য যুদ্ধের পর মাসুম খান কাবুলী দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলেন এবং লক্ষ্যা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী একটি দ্বীপে আশ্রয় নেন। তিনি প্রায় বন্দী হওয়ার উপক্রম হন। এ সময় ঈসা খান কুচবিহারে ছিলেন, সেখান থেকে তিনি একটি বিশাল ও সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে ফিরে আসেন। এ অবস্থায় মুঘল বাহিনী ব্রহ্মপুত্রের তীরে এগার সিন্দুর শহরের

Dhaka University Institutional Repository

বিপরীত দিকে অবস্থিত টোকে (Totak) অবস্থান গ্রহণ করে এবং সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। অতপর উভয় পক্ষে জলে - স্থলে প্রচন্ড সংঘর্ষ চলতে থাকে এবং মুঘল বাহিনী অনবরত যুদ্ধে জয়লাভ করতে থাকে। এ অবস্থায় শত্রু পক্ষকে (ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদেরকে) বিভ্রান্ত করার জন্য তরসুন খানকে (তিনি তখন ভাওয়ালে ছিলেন) বাজিত পুরের (Bajasrapur) দিকে অভিযান করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। ভাওয়াল শহর (অর্থাৎ নাগরী) থেকে বাজিতপুর যাওয়ার দু'টি রাস্তা ছিল, একটি রাস্তা ছিল শত্রু বাহিনী থেকে অনেক দূরে এবং অন্যটি ছিল নদীর তীর দিয়ে ও শত্রুদের বেশ নিকটে। ভাগ্যচক্রে তরসুন খান শেষোক্ত রাস্তা ধরে যাত্রা করেন। এ সংবাদ পেয়ে মাসুম খান কাবুলী এক বিশাল বাহিনী সহ দ্রুততার সাথে তরসুন খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এ অবস্থায় শাহবায খান, মুহিব আলী খান, রাজা গোপাল, খানগার এবং অন্যান্যদেরকে তরসুন খানের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। এমনকি শাহবায খান তরসুন খানকে সতর্ক করে দেয়ার জন্য এবং সাহায্যকারী সৈন্যদল না পৌঁছা পর্যন্ত কোন দৃঢ় - অবস্থান গ্রহণ করার আদেশ দিয়ে একজন দ্রুতগামী দূতও প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি এ সংবাদ বিশ্বাস করেননি এবং শাহবায খানের জন্য দুঃখ করেন এবং মনে করেন যে, বিদ্রোহীরা (ঈসা খান ও তাঁর মিত্ররা) প্রতারণা করেছে এবং এ কৌশলের দ্বারা শাহবায খানের নিকট থেকে একদল সৈন্য অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছে। তথাপি সংবাদ বাহকের তাগিদে এবং তাঁর সহচরেরা সতর্কতার সুবিধা সমূহ ও অসতর্কতার অমঙ্গল সমূহ বর্ণনা করায় তিনি একটি নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করেন এবং একটি উপযুক্ত স্থানও খুঁজে পান। কিন্তু যেহেতু তিনি দূতের সংবাদ কোন ক্রমেই বিশ্বাস করেননি সেহেতু তিনি সে স্থানে অপেক্ষা না করে শাহবায খানের শিবিরের দিকে অগ্রসর হন। এমন সময় সংবাদ আসলো, শত্রুরা নিকটে, কিন্তু তিনি তাদেরকে সাহায্যকারী সৈন্যদল মনে করে সাদরে গ্রহণ করতে প্রস্তুতি নেন। তিনি কিছু দূর অগ্রসর হলে শত্রুদের প্রবল আলোড়নে তাঁর নিরাপত্তার ক্ষেত্র ধূলিময় হয়ে যায়। এ অবস্থায় তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষীরা তাঁকে শাহবায খানের শিবির থেকে সৈন্যদল না আসা পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার অনুরোধ করলেও তিনি তাতে কর্ণপাত করেননি। তরসুন খান দৃঢ় অন্তকরণ ও স্থির সংকল্প নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন। এ অবস্থায় তাঁর সৈন্যদের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে অনেকেই অস্ত্র আনার ওজর দেখিয়ে তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। যদিও ১৫ জনের অধিক সৈন্য তাঁর সাথে ছিল না তথাপি তিনি সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন। তাঁর আত্মীয় ফরীদুন হুসাইন ও আলী ইয়ার মৃত্যুবরণ করে। তরসুন খান নিজে আহত হয়ে বন্দী হন এবং বন্দী অবস্থায় মাসুম খান কাবুলী তাঁকে হত্যা করেন।

অন্যদিকে শাহবায খান ব্রহ্মপুত্রের শাখা বানার (Panar) নদীর তীরে শিবিরে অবস্থান করছিলেন। সেখানে তিনি সংবাদ প্রেরণ ও পরামর্শ প্রদানে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। ঈসা খানের নিকট প্রস্তাব দেয়া হয় যে, হয় তিনি বিদ্রোহীদেরকে সমর্পণ করবেন, না হয় তাদেরকে তাঁর আশ্রয় থেকে তাড়িয়ে দিবেন। কিন্তু ঈসা খান তাঁকে মিষ্ট কথায় ভুলিয়ে রাখেন এবং সময় সময় মুঘলদেরকে খুশী করার জন্য প্রশংসার উক্তি করেন। যখন বুঝা গেল যে, ঈসা খানের জিহ্বা ও অন্তরের মধ্যে তথা কথায় ও কাজে কোন মিল নেই তখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সাতমাস ধরে যুদ্ধ চলতে থাকে এবং মুঘল বাহিনী সময় সময় জয়লাভ করে এবং দুর্বৃত্তরা (ঈসা খান ও তাঁর মিত্রগণ) হতবিহ্বল ও ব্যর্থ হতে থাকে। কিন্তু এসময় শাহ্বায খান ও তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়, বিরোধ নিরসনের পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়।   কিন্তু বোধোদয় না হওয়ায় বিভ্রান্তি ও ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি পায়। শাহ্বায খানের আত্ম অহমিকার কারণে তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তাগণ বিক্ষুব্ধ ও অসংযমী হয়ে নির্বোধের মতো ব্যবহার করতে থাকে। অন্যদিকে শত্রুদের অপতৎপরতাও বৃদ্ধি পায় । তদুপরি মহামারীর কারণে সৈন্য সংখ্যাও হ্রাস পায়। এ অবস্থায় শত্রুরা (ঈসা খান ও তাঁর মিত্রগণ) ভেবেছিল, বর্ষা নিকটবর্তী, এবং বিজয়ী বাহিনী (মুঘল বাহিনী) প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হবে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেই বছর বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের চেয়ে কম হওয়ায় তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়নি। তখন শত্রুপক্ষ বহু সংখ্যক কোদালি সংগ্রহ করে পনর স্থানে ব্রহ্মপুত্রের পাড় কেটে দেয়। ফলে শাহ্বায খানের শিবির ও কামানগুলো পানিতে ডুবে যায়। তখন শত্রু পক্ষ বড় বড় পালওয়ার নৌকা শাহ্বায খানের দুর্গের নিকটে নিয়ে আসে। অতপর উভয় পক্ষের মধ্যে কামান ও বন্দুকের গুলি বিনিময় শুরু হয়। মুঘল বাহিনী কিছুটা ছত্র ভঙ্গ হয়ে পড়লেও সৌভাগ্যবশতঃ শত্রুপক্ষের নেতা গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা

Dhaka University Institutional Repository

যায় এবং তাদের কিছু যুদ্ধ-নৌকা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং সহসা নদীর পানি হ্রাস পাওয়ায় শত্রুরা পলায়নে বাধ্য হয়। বিপুল লুণ্ঠিত দ্রব্য মুঘল সৈন্যদের হস্তগত হয় এবং অনেক শত্রু সৈন্য পানিতে ডুবে মারা যায়। কিন্তু শত্রু পক্ষ ঢাকার থানাদার সৈয়দ হুসাইনকে পরাজিত ও বন্দী করে। এক্ষণে ঈসা খান অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর বন্দীর মারফতে শান্তি - আলোচনায় তৎপর হন। শাহ্‌বায খানও তা গ্রহণ করেন। ঈসা খান আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হন, এবং মনে করেন যে, খেদমতের দ্বারা তিনি নিষ্কৃতি লাভ করবেন। ঈসা খান এ মর্মেও স্বীকৃত হন যে, একজন বাদশাহী দারোগা সোনারগাঁও বন্দরে নিযুক্ত হবে এবং মাসুম খান কাবুলীকে হেজাজে পাঠানো হবে। ঈসা খান পেশকাশ ও উপঢৌকন প্রেরণ করেন এবং মোটা উপহার দিয়ে কর্মকর্তাদের মন জয় করেন। অতপর মুঘল সৈন্যরা প্রত্যাবর্তন করে এবং শাহ্‌বায খান নদী অতিক্রম করে ভাওয়ালে পৌঁছে ঈসা খানের প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু শাহ্‌বায খানের সৈন্য দলের দুষ্ট লোকদের অসঙ্গত বাক্যে ঈসা খানের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। ঈসা খান তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করেন এবং আরো শর্ত আরোপ করেন। ফলে শাহ্‌বায খান ক্রোধান্বিত হয়ে বলেন যে, বারবার গোলযোগ করা এবং শর্তারোপ করা ন্যায়বানের নীতি নয়। তিনি অনমনীয় হয়ে উঠেন এবং কঠোর ভাষায় কথা বলেন। শাহ্‌বায খান পুনরায় যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দের ৩০ শে সেপ্টেম্বর ঈসা খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কিন্তু শাহ্‌বায খানের অদূরদর্শী কর্মকর্তাগণ মনে করে যে, শাহ্‌বায খানের পরাজয়ে তারা লাভবান হবে। মুহিব আলী খান যুদ্ধ না করে প্রথমেই চলে গেলেন। এ ভাবে প্রত্যেকেই স্ব-স্থান ত্যাগ করে বিপথে গমন করে। শাহ্ কুলী খান মাহরাম কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে সাহায্যের অভাবে এবং আহত হয়ে ভাওয়াল ত্যাগ করেন। অবশেষে শাহ্‌বায খান তাঁর ঔদ্ধত্যের শোচনীয় পরিণতি লক্ষ্য করে কর্মকর্তাদের প্রীতি অর্জনের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। ফলশ্রুতিতে শাহ্‌বায খান তাঁড়া অভিমুখে যাত্রা করতে বাধ্য হন। তাঁর সমস্ত রণ-সম্ভার শত্রুদের হস্তগত হয় এবং মীর আদিলার পুত্রগণ ও অন্যান্যরা বন্দী হয়। সৈয়দ মুহম্মদ গযনবী এবং অন্যান্যরা নিহত হয়।"

Dhaka University Institutional Repository

এখন আবুল ফযলের বিবরণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর আলোকে ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদের সথে শাহ্বায খানের যুদ্ধের গতি - প্রকৃতি ও ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। তবে প্রথমেই যুদ্ধ ক্ষেত্রের প্রকৃত অবস্থান নির্ণয়ার্থে উপরে উল্লিখিত স্থান গুলো যেমন- খিযিরপুর, সোনারগাঁও, কারাভু, বারা সিন্দর, কুচবিহার, টোটাক, কিনারা সিন্দর, বাজাসরাপুর ও ভাওয়ালের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা গেলঃ পূর্ববর্তী আলোচনায় বারা সিন্দর বা কিনারা সিন্দর বা এগার সিন্দুর এবং ভাওয়ালের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাই এখন শুধু খিযিরপুর, সোনারগাঁও, কারাভু, কুচবিহার, টোটাক ও বাজাসরাপুরের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হল ঃ

খিযিরপুর ঃ বর্তমান নারায়ণগঞ্জের প্রায় এক মাইল উত্তরে খিযিরপুর অবস্থিত। মুঘল আমলে খিযির পুর গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাটি রূপে বিবেচিত হয়। আবদুল করিম মনে করেন যে, ঈসা খানই সর্ব প্রথম খিযিরপুরে দুর্গ নির্মাণ করেন[১৬৬]।

সোনারগাঁও ঃ খিযিরপুরের তিন মাইল পূর্বে সোনারগাঁও অবস্থিত[১৬৭]। পূর্বের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, শাহ্বায খান কর্তৃক কতরাব ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার পর ঈসা খান সোনারগাঁওয়ে রাজধানী স্থানান্তর করেন। ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ পরিব্রাজক রাল্‌ফ্ ফিচ এ সোনারগাঁওয়েই ঈসা খানের সাথে সাক্ষাত করেন।

কতরাব ঃ কারাভু বা কতরাব শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্বতীরে রূপগঞ্জ থানার মাসুমাবাদ গ্রামের সাথে অভিন্ন। পূর্বের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, কতরাব-তেই ঈসা খানের প্রথম রাজধানী ছিল।

কুচবিহারঃ কুচবিহার রাজ্য বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। ১৫৮১ খ্রীস্টাব্দে কুচবিহার রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পশ্চিম অংশের রাজা হন নরনারায়ণ এবং পূর্ব অংশের রাজা হন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেব [১৬৮]।

Dhaka University Institutional Repository

টোকঃ বানার নদী যেখানে ব্রহ্মপুত্রের শাখা হয়ে বের হয়েছে সেখানেই টোটাক বা টোক অবস্থিত[১৬৯]।

বাজিতপুর ঃ বাজাসরাপুর বা বাজিতপুর বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত।

যাহোক, ঈসা খান ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে কুচবিহার অভিযানে ব্যস্ত থাকার সময় মুঘল সুবাহ্দার শাহ্বায খান ভাটি আক্রমণ করেন । ভাটি আক্রমণের জন্য তিনি কোন স্থান থেকে যাত্রা করেন আবুল ফযলের বর্ণনা থেকে জানা না গেলেও ধারণা করা যায় যে, তিনি রাজধানী তাঁড়া থেকেই যাত্রা করেন। ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দের মার্চ-এপ্রিলের দিকে শাহ্বায খান ভাটি আক্রমণ শুরু করেন। আপাত দৃষ্টিতে শাহ্বায খান বিদ্রোহী মুঘল সেনাপতি মাসুম খান কাবুলীর পশ্চাৎদ্ধাবন করে ভাটি আক্রমণ করলেও তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন ঈসা খান। কেননা আবুল ফযল আকবর নামায় শাহ্বায খানের ভাটি আক্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন যে, "His idea was to test Isa K. the ruler of that country, who was always expressing his loyalty. If he delivered up Masum K. and the other rebels, his lips and his heart would accord. Otherwise the veil over his conduct would be removed, and his wickedness would have its retribution."[১৭০] আবুল ফযলের এ বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শাহ্বায খান বিদ্রোহী মুঘল সেনাপতি মাসুম খান কাবুলী ও অন্যান্য বিদ্রোহীদেরকে তাঁর নিকট সমর্পণের জন্য ঈসা খানের উপর চাপ প্রয়োগের উদ্দেশ্যেই ভাটি আক্রমণ করেন। দ্বিতীয়তঃ এখানে আবুল ফযল ঈসা খান কর্তৃক সর্বদা মুঘলদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের কথা উল্লেখ করলেও ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে মুঘল সুবাহ্দার খান -ই -জাহান ভাটি অভিযানে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর ঈসা খান কেন এবং কখন মুঘলদের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন এর কোন উল্লেখ আকবরনামাতে পাওয়া যায় না। এতে বুঝা যায় যে, ঈসা খানের বিশ্বস্ততা যাচাই ছিল শাহ্বায খানের ভাটি আক্রমণের একটি অজুহাত মাত্র। সুতরাং ইহা বলা অযৌক্তিক হবেনা যে, শাহ্বায খান ভাটি অঞ্চলে মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক ভাটি-প্রধান ঈসা খানকে দমন করার উদ্দেশ্যেই ভাটি আক্রমণ করেছিলেন। এ সময় মাসুম খান কাবুলী ব্যতীত ঈসা

Dhaka University Institutional Repository

খানের অন্য কোন মিত্রের নাম আবুল ফযলের বর্ণনায় পাওয়া যায়না। এতে বুঝা যায় যে, এ সময় ভাটি অঞ্চলে ঈসা খান ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কোন ভূঁঞা বা জমিদার ছিল না এবং তিনিই ছিলেন ভাটি অঞ্চলের একচ্ছত্র অধিপতি । যাহোক, শাহ্বায খান তাঁড়া থেকে এসে প্রথমে খিযিরপুরে শিবির স্থাপন করেন। ঈসা খানের অনুপস্থিতির সুযোগে মুঘল বাহিনী খিযিরপুরের নিকটে লক্ষ্যা নদীর দুই তীরে অবস্থিত হাজিগঞ্জ ও নবীগঞ্জ, এ দুর্গ দু'টি দখল করে নেয়[১৭১] এবং সোনারগাঁওও মুঘল বাহিনীর অধিকারে আসে। অতপর মুঘল বাহিনী ঈসা খানের রাজধানী কতরাবতে পৌঁছে এবং এ জনাকীর্ণ শহরটিও মুঘল সৈন্যদের দ্বারা লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয়। কতরাব লুণ্ঠনের পর শাহ্বায খান এগার সিন্দুরের দিকে একদল সৈন্য প্রেরণ করলে তারা এ শহরটিও লুণ্ঠন করে। অতপর মুঘল বাহিনী ব্রহ্মপুত্রে আসলে মাসুম খান কাবুলী তাদের গতিরোধ করেন। কিন্তু পরাজিত হয়ে তিনি লক্ষ্যা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী একটি দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঠিক এ সময় ঈসা খান এক বিশাল ও সু-সজ্জিত বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। মাসুম খান কাবুলীর পরাজয়ের পর পরই ঈসা খান যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ায় ধরে নেয়া যায় যে, তিনি মুঘল বাহিনীর আগমনের সংবাদ শুনে কুচবিহার থেকে আগমন করে নিকটবর্তী কোন স্থানে অবস্থান করে মুঘল বাহিনীর গতি বিধি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এ ছাড়া মুঘল বাহিনী প্রায় বিনা বাধায় খিযিরপুর, সোনারগাঁও , কতরাব ও এগার সিন্দুর পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ায় মনে হয় যে, ঈসা খান নিজেই মুঘল বাহিনীকে নদী-নালায় পরিপূর্ণ ভাটির একবোরে অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ দিয়েছিলেন, যাতে তিনি তাঁর সুবিধাজনক সময় ও স্থানে তাদের মুকাবিলা করতে পারেন। যাহোক, ঈসা খানের আগমনে শাহ্বায খান এগার সিন্দুর শহরের বিপরীত দিকে ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত টোকে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। অন্যদিকে ঈসা খানও মাসুম খান কাবুলীর সহায়তায় মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। অতপর উভয় পক্ষে জলে-স্থলে প্রচন্ড সংঘর্ষ শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে আবুল ফযল মুঘল বাহিনীর অনবরত যুদ্ধ জয়ের কথা বললেও বস্তুত জয় পরাজয় তখনও অনির্ধারিত থেকে যায়। এ অবস্থায় শাহ্বায খান, ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য তরসুন খানকে ভাওয়াল থেকে একদল সৈন্য নিয়ে বাজিত পুরের দিকে

Dhaka University Institutional Repository

অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। এ সংবাদ শুনে মাসুম খান দ্রুত তরসুন খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এ অবস্থায় শাহ্বায খান মাসুম খান কাবুলীর গতিবিধির সংবাদ পেয়ে মুহিব আলী খান, রাজা গোপাল, খানগার এবং অন্যান্যদেরকে তরসুন খানের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। এবং তরসুন খানকে সতর্ক করে দেয়ার জন্য দূতও প্রেরণ করেন। কিন্তু তরসুন খান এ সংবাদ বিশ্বাস করলেন না এবং সতর্ক সংকেত পাওয়া সত্ত্বেও সতর্ক হলেন না। অন্যদিকে মাসুম খান কাবুলী সাহায্যকারী মুঘল বাহিনী পৌঁছার পূর্বেই তরসুন খানকে আক্রমণ করে পরাজিত ও বন্দী করেন এবং বন্দী অবস্থায় তাঁকে হত্যা করা হয়।

যাহোক, এ সময় শাহ্বায খান বানার নদীর তীরে অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকে তিনি ঈসা খানের নিকট প্রস্তাব দেন যে, হয় আপনি বিদ্রোহীদেরকে আমার নিকট হস্তান্তর করেন, না হয় তাদেরকে আপনার আশ্রয় থেকে তাড়িয়ে দেন। কিন্তু ঈসা খান তালবাহানার মাধ্যমে কালক্ষেপণের কৌশল অবলম্বন করেন। ফলে পুনরায় উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং সাতমাস ধরে যুদ্ধ চলতে থাকে। কিন্তু জয় পরাজয় অমীমাংসিত রয়ে যায়। তবে ঈসা খানের কালক্ষেপণের কৌশল সফল হয়। কেননা দেখা যায় যে, একদিকে এ সময় শাহ্বায খানের রুক্ষ ব্যবহারের কারণে অধীনস্থ কর্মকর্তাদের সাথে তাঁর মতানৈক্য দেখা দেয় এবং অন্যদিকে প্রত্যাশিত বর্ষাকালও আগমন করে। কিন্তু সেই বছর আশানুরূপ বৃষ্টিপাত না হলেও ঈসা খান ও তাঁর মিত্রগণ এক অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করে পরিস্থিতির মুকাবিলা করেন, যার ফলে শাহ্বায খান অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। তাঁরা বহুসংখ্যক কোদালি সংগ্রহ করে পনর স্থানে ব্রহ্মপুত্রের পাড় কেটে দিলে সমগ্র এলাকা প্লাবিত হয়ে শাহ্বায খানের শিবির, গোলাবারুদ ও কামানগুলো পানিতে ডুবে যায়। তখন ঈসা খান ও তাঁর মিত্রগণ বড় বড় পালওয়ার নৌকা মুঘল শিবিরের নিকটে নিয়ে আসে এবং গোলাবর্ষণ করতে থাকে। এ অবস্থায় মুঘল সৈন্যরা ছত্র-ভঙ্গ হয়ে পড়ে। কিন্তু হঠাৎ মুঘল বাহিনীর গুলিতে ঈসা খানের পক্ষীয় একজন নেতা মৃত্যুবরণ করায় এবং সহসা নদীর পানি কমে যাওয়ায় ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদের সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করায় সৌভাগ্যবশতঃ শাহ্বায খান এ যাত্রায় রক্ষা পান। কিন্তু ঢাকার

Dhaka University Institutional Repository

মুঘল থানাদার সৈয়দ হুসাইন ঈসা খানের নিকট পরাজিত ও বন্দী হয়। আবুল ফযলের বক্তব্য অনুযায়ী এ অবস্থায় ঈসা খান তাঁর বন্দী সৈয়দ হুসাইনের মারফত শাহ্‌বায খানের নিকট শান্তি-চুক্তির প্রস্তাব করেন এবং শাহ্‌বায খানও তা গ্রহণ করেন। কিন্তু আবুল ফযলের এ বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কেননা যেখানে শাহ্‌বায খানের শিবির ও গোলাবারুদ পানিতে ডুবে যায় এবং ঈসা খানের প্রচন্ড আক্রমণে মুঘল বাহিনী ছত্র-ভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং কেবল ভাগ্যগুণে নদীর পানি কমে যাওয়ায় ঈসা খান ও তাঁর মিত্রগণ যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করায় শাহ্‌বায খান চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেলেও ঢাকার মুঘল থানাদার সৈয়দ হুসাইন ঈসা খানের হস্তে বন্দী হয় সেখানে তুলনামূলক ভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে থেকেও ঈসা খান কর্তৃক শান্তি-চুক্তির প্রস্তাব প্রদান অযৌক্তিক নয় কি ? প্রকৃতপক্ষে শাহ্‌বায খানই ঈসা খানের নিকট শান্তি-চুক্তির প্রস্তাব দেন। কেননা একদিকে শাহ্‌বায খানের সাথে তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তাদের মতানৈক্য চরম আকার ধারণ করায় এবং অন্য দিকে ঈসা খানের হস্তে মুঘল বাহিনী নিস্তানাবুদ হওয়ায় শাহ্‌বায খান বিপাকে পড়ে যান। ফলশ্রুতিতে তিনি ঈসা খানের নিকট শান্তি- চুক্তির প্রস্তাব দিতে বাধ্য হন। এ ছাড়া আহসান-জান-কায়সারও মত প্রকাশ করেন যে, শাহ্‌বায খানই ঈসা খানের নিকট শান্তি-চুক্তির প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, " Eventually, Shahbaz was forced to sue for peace. Isa agreed that a royal darogha should be appointed in the port of Sonargaon and that Masum Kabuli would be sent away to Hejaz". [১৭২] সুতরাং বলা অযৌক্তিক হবেনা যে, শাহ্‌বায খানই ঈসা খানের নিকট শান্তি-চুক্তির প্রস্তাব দেন। সর্বোপরি ঈসা খান শাহ্‌বায খানের নিকট শান্তি চুক্তির প্রস্তাব দিয়ে থাকলেও ইহাও ছিল ঈসা খানের কালক্ষেপণের একটি কৌশল । কেননা দেখা যায় যে, পরবর্তীতে ঈসা খান চুক্তির শর্তাবলী পালনের ক্ষেত্রে গড়িমসি করেন। এতেও প্রমাণিত হয় যে, ঈসা খান শান্তি-চুক্তির প্রস্তাব দিতে বাধ্য ছিলেন না। যাহোক, চুক্তি অনুযায়ী স্থির হয় যে, সোনারগাঁওয়ে একজন মুঘল দারোগা নিযুক্ত হবে এবং মাসুম খান কাবুলীকে হেজাজে পাঠানো হবে। এছাড়া ঈসা খান বাদশাহের নিকট উপঢৌকন ও পেশকাশ প্রেরণ করেন এবং মোটা উপহার দিয়ে মুঘল কর্মকর্তাদের মন জয় করেন। অতপর শাহ্‌বায খান নদী অতিক্রম করে ভাওয়ালে পৌঁছেন এবং ঈসা খানের প্রতিশ্রুতি পূরণের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য সেখানে অপেক্ষা করতে থাকেন । কিন্তু ঈসা খান চুক্তির শর্তাবলী পালনে গড়িমসি করেন এবং আরো নতুন শর্ত আরোপ করেন। এতে শাহ্‌বায খান বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন এবং যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ফলে শান্তি অলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়। অবশেষে ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দের ৩০ শে সেপ্টেম্বর পুনরায় উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু শাহ্‌বায খানের রুক্ষ ব্যবহারের কারণে অন্যান্য মুঘল সেনানায়কগণ ইতোমধ্যেই তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যোগদান থেকে বিরত থাকে এবং শাহ্‌বায খানের পরাজয় কামনা করে। আবুল ফযল শাহ্‌বায খানের অধীনস্থ কর্মকর্তাদের বিক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ হিসেবে শাহবায খানের রুক্ষ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করলেও এর পশ্চাতে অন্য কারণও রয়েছে । একদিকে দীর্ঘদিন যাবত প্রাণপণে লড়াই করা সত্ত্বেও দুর্ধর্ষ ভাটি -প্রধান ঈসা খানকে পরাজিত করা তাদের পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় তারা মনোবল হারিয়ে ফেলে, উপরন্ত অনেক মুঘল সৈন্য ঈসা খানের হাতে বেঘোরে প্রাণ বিসর্জন দেয়ায় ও মহামারীর কারণে এবং অন্যদিকে অসংখ্য নদ-নদী, জলাভূমি ও বিল-ঝিলপূর্ণ পূর্ব-বাংলা তথা ভাটির আবহাওয়া উত্তর ভারত থেকে আগত মুঘল সৈন্যদের নিকট ভীতিপ্রদ ছিল বিধায় এখানে দীর্ঘদিন অবস্থান করায় তারা অধৈর্য হয়ে উঠে এবং যত শীঘ্র সম্ভব এ স্থান ত্যাগ করে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের জন্যও উদগ্রীব হয়ে উঠে। সুতরাং এখানকার প্রতিকূল আবহাওয়াও তাদের বিক্ষুব্ধ হওয়ার একটি অন্যতম কারণ ছিল। তাই দেখা যায় যে, অনেক সৈন্যই যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করে বিভিন্ন দিকে চলে যেতে থাকে। মুহিব আলী খান প্রথমেই যুদ্ধ না করে চলে যায়। শাহ্ কুলী মাহরাম খানও কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে সাহায্যের অভাবে এবং আহত হয়ে ভাওয়াল ত্যাগ করে। এ অবস্থায় শাহ্‌বায খান তাঁর ঔদ্ধত্য ত্যাগ করে অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রীতি অর্জনের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। ফলশ্রুতিতে শাহ্‌বায খান ঈসা খানের নিকট পরাজিত হয়ে বিপর্যস্ত অবস্থায় তাঁর সমস্ত রণ-সম্ভার ত্যাগ করে তাঁড়া অভিমুখে যাত্রা করতে বাধ্য হন। সৈয়দ মুহম্মদ গযনবী সহ অনেক মুঘল সৈন্য নিহত হয় এবং মীর আদিলার পুত্ররা সহ অনেক মুঘল সৈন্য ঈসা খানের হস্তে বন্দী হয়। যাত্রা পথে শাহ্‌বায খান বগুড়ার শেরপুর মুর্চায় পৌঁছে পুনরায় প্রস্তুতি নিয়ে ভাটি আক্রমণ করে প্রতিশোধ গ্রহণে সচেষ্ট হলেও অন্যান্য কর্মকর্তারা এতে সম্মত হয়নি। অবশেষে তিনি তাঁড়ায় ফিরে যান[১৭৩] । এ ভাবেই

Dhaka University Institutional Repository

ভাটি-প্রধান ঈসা খানের নেতৃত্বে পূর্ব-বাংলার মুঘল-বিরোধী দ্বিতীয় প্রতিরোধ সংগ্রাম তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জানা যায় যে, ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে মুঘল সুবাহ্দার খান -ই-জাহানের ব্যর্থ ভাটি অভিযানের পর কয়েক বছর বিরতি দিয়ে পুনরায় ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে সুবাহ্দার শাহ্বায খানের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী ভাটি আক্রমণ করে। এসময় ঈসা খানের মিত্র ছিলেন বিদ্রোহী মুঘল সেনাপতি মাসুম খান কাবুলী এবং যুদ্ধ ক্ষেত্র ছিল লক্ষ্যা, বানার ও ব্রহ্মপুত্র বিধৌত বিস্তীর্ণ এলাকা। ঈসা খান কুচবিহার অভিযানে ব্যস্ত থাকার সুযোগে মুঘল বাহিনী প্রায় বিনা বাধায় খিযিরপুর, সোনারগাঁও, কতরাব এবং এগার সিন্দুর পর্যন্ত অগ্রসর হতে সক্ষম হয়। মাসুম খান কাবুলী মুঘল বাহিনীর অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। কিন্তু মাসুম খানের পরাজয়ের অব্যহিত পরে ঈসা খান এক বিশাল ও সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হন এবং মুঘল অগ্রযাত্রা কার্যকর ভাবে বন্ধ করে দেন। ঈসা খান মাসুম খান কাবুলীকে সাথে নিয়ে মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে নৌ ও স্থল উভয় ক্ষেত্রেই তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ঈসা খানের প্রচন্ড আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে মুঘল বাহিনী প্রথমে এগার সিন্দুর থেকে পরাজিত হয়ে ভাওয়ালে যায় এবং সেখান থেকে পরাজিত হয়ে একেবারে তাঁড়ায় ফিরে যেতে বাধ্য হয় । আবুল ফযল পুনঃপুনঃ মুঘল বাহিনীর যুদ্ধ জয়ের কথা উল্লেখ করলেও বস্তুত ঈসা খানেরই জয় হয়েছিল। কেননা মুঘল বাহিনী ভাটির বিন্দুমাত্র অংশেও বাদশাহ্ আকবরের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এমনকি তারা ঈসা খানকে তাঁর দৃঢ়-অবস্থান থেকে একটুও সরাতে পারেনি। পরিশেষে বলা যায় যে, ঈসা খান তাঁর বিচক্ষণতা ও অভিনব রণকৌশলের দ্বারা প্রথম বারের মতো দ্বিতীয় বারও মুঘল আগ্রাসন থেকে নিজেকে এবং নিজের জন্ম ভূমিকে রক্ষা করতে সক্ষম হন। এই বিজয় লাভ ঈসা খানের মুঘল বিরোধী মনোভাবকে আরো উজ্জীবিত করে এবং তাঁরই উৎসাহে মাসুম খান কাবুলী শেরপুর মুর্চা দখল করে নেয় এবং অন্যান্যরা রাজধানী তাঁড়ার ১২ ক্রোশ দূরত্বে অবস্থিত মালদহ পর্যন্ত এলাকা দখল করে নেয়। ফলে বাংলায় মুঘল অধিকার পুনরায় সংকুচিত হয়ে পড়ে[১৭৮]।

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদের মুঘল - হুমকির মুকাবিলা

উপভাগ ৩ - ঈসা খান বনাম শাহ্‌বায খান ও সাদিক খান ঃ

পূর্বের আলোচনায় দেখা যায় যে, শাহ্‌বায খান ভাটি অভিযানে ব্যর্থ হয়ে তাঁড়ায় চলে আসেন। তাঁড়ায় এসে তিনি পুনরায় অন্যান্য সেনানায়কদের নিকট তাঁর পূর্ব প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তাঁর পূর্ব প্রস্তাব ছিল ভাটি আক্রমণ করা। কিন্তু সেনানায়কেরা এবারও একমত হতে পারেনি। অবশেষে তাঁরা বিষয়টি বাদশাহের গোচরীভূত করার সিদ্ধান্ত নেয়। বাদশাহ্ আকবর শাহ্‌বায খানের ভাটি অভিযানের ব্যর্থতার সংবাদ পেয়ে ভীষণ ক্ষুব্ধ হন এবং বাংলায় নিযুক্ত সেনানায়কদের ভর্ৎসনা করে দ্রুত সংবাদ পাঠান। বাদশাহ্ সাইদ খান এবং বিহার ও বাংলার অন্যান্য মুঘল জায়গীরদারদের নিকট এ মর্মে আদেশ জারী করেন যে, তাঁরা যেন ভাটি-প্রধান ঈসা খানকে শায়েস্তা করার জন্য এক যোগে কাজ করেন। তিনি রাজধানী থেকে প্রথমে পেশরাও খান ও খাজেগী ফতেহ উল্লাহ এবং পরে রামদাস কাচওয়া ও মুজাহিদ কামবোর মারফত উপরোক্ত আদেশ বাংলার সেনানায়কদের নিকট প্রেরণ করেন[১৭৭]। এ দিকে শাহ্‌বায খানের সাথে অন্যান্য সেনানায়কদের বিরোধ নিষ্পত্তি না হয়ে বরং বৃদ্ধি পেতে থাকায় তিনি বাদশাহ্ আকবরের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য রাজধানীর দিকে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নেন[১৭৮]। আকবর কর্তৃক প্রেরিত সংবাদবাহকেরা রাজধানী তাঁড়া যাওয়ার পথে বিহারে শাহ্‌বায খানের সাক্ষাত পান এবং তাঁরা শাহ্‌বায খানকে বাদশাহের আদেশের কথা বলে তাঁকে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত রাখেন এবং বিহারের জায়গীরদারদেরকে শাহ্‌বায খানের সাথে একযোগে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেন। এছাড়া বাদশাহ্ আকবর এ মর্মেও আদেশ দেন যে, যদি শাহ্‌বায খানের আরো সৈন্য দরকার হয় তবে রাজা টোডরমল, মুত্তালিব খান, সৈয়দ জামাল বখতিয়ার এবং অন্যান্য সুযোগ্য ও

Dhaka University Institutional Repository

উৎসাহী কর্মকর্তা তাঁর সাহায্যার্থে প্রেরণ করা হবে। শাহ্বায খান উত্তর দেন যে, তাঁর নিকট অনেক সৈন্য রয়েছে এবং এ কার্য সম্পাদনে তিনি পূর্ণ উদ্যমে নিবদ্ধ হন। যাহোক, ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর শাহ্বায খান বাংলায় প্রবেশ করেন এবং ভাটি জয়ে মনোনিবেশ করেন[১৭৭]।

এরূপ পরিস্থিতিতে ঈসা খানও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেননি। দেখা যায় যে, তিনি দ্বি-ভিদ উপায়ে এ সংকট মুকাবিলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ ঈসা খান পূর্ববর্তী জয়লাভের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করেন। তবে এ ক্ষেত্রে তিনি নিজে মুঘলদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে মাসুম খান কাবুলীকে মুঘল অধিকৃত অঞ্চলে আক্রমণ পরিচালনায় প্ররোচিত করেন, যাতে মুঘল বাহিনী মাসুম খানের সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকে এবং ভাটি আক্রমণের সুযোগ না পায়। এ অনুযায়ী দেখা যায় যে, মাসুম খান কাবুলী মুঘলদের নিকট থেকে বগুড়ার শের পুর মুর্চা দখল করে নেয় এবং অন্যান্যরা তাঁড়ার ১২ ক্রোশ দূরত্বে অবস্থিত মালদহ পর্যন্ত অধিকার করে নেয়[১৭৮]। অন্যদিকে শাহ্বায খান বাংলায় প্রবেশ করে সরাসরি ভাটির দিকে অগ্রসর হয়ে গঙ্গার তীরে এসে জানতে পারেন যে, মাসুম খান কাবুলী শেরপুর মুর্চায় অবস্থান করছেন। এ অবস্থায় শাহ্বায খান নদী অতিক্রম করে নিকটবর্তী হওয়া মাত্রই মাসুম খান কাবুলী শেরপুর মুর্চা ত্যাগ করে ফতেহাবাদে তথা আধুনিক ফরিদপুরে চলে যায়। ফলে শেরপুর মুর্চা মুঘল অধিকারে চলে আসে[১৭৯]। অতপর মুঘল বাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে ১৫৮৫ খ্রীস্টাব্দের ১লা মার্চ উযীর খান, শাহ্ কুলী খান মাহরাম, সাদিক খান, মুহিব আলী খান, রাজা গোপাল দাস, কীচক খাজা এবং অন্যান্যরা মাসুম খানের বিরুদ্ধে যাত্রা করে এবং শাহ্বায খান ও অন্যান্যরা যেখানে ছিলেন সেখানেই থেকে যান, অর্থাৎ মনে হয় তাঁরা বগুড়ার শেরপুর মুর্চায় অবস্থান করতে থাকেন[১৮০]। অন্যদিকে মাসুম খান কাবুলী ফতেহাবাদ থেকে ত্রিমোহনীতে যান এবং সেখানে দু'টি দুর্গ নির্মাণ করেন। ত্রিমোহনীর অবস্থান নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। আবুল ফযল বলেন যে, গঙ্গা, যমুনা ও সকনী নদীর সংগমস্থল ত্রিমোহনী[১৮১]। বেভেরীজ হুগলীর ত্রিবেনীকে ত্রিমোহনীর সাথে অভিন্ন মনে করেন[১৮২]। যদুনাথ সরকারও ইহা সমর্থন করেন[১৮৩]। কিন্তু আবদুল করিম মনে করেন যে,

Dhaka University Institutional Repository

ত্রিমোহনীকে যাত্রাপুর বা কাটাসগড়স্থ বা খাল যোগিনীর ত্রিমোহনীর সাথে চিহ্নিত করা অধিকতর যুক্তি যুক্ত। মাসুম খান কাবুলী এ তিনটির যে কোন একটিতেই দুর্গ নির্মাণ করেন[১৮৮]। যাহোক, মাসুম খান কাবুলী ত্রিমোহনীতে দুইটি দুর্গ নির্মাণ করে বেগ মুহাম্মদ, উলুগ বেগ নামক দুইজন সেনানায়ক এবং কয়েকজন জমিদারকে সেখানে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়ে নিজে পিছনে থেকে যুদ্ধ প্রস্তুতি নেন। অন্যদিকে মুঘল বাহিনীও উযীর খানের নেতৃত্বে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। এ অবস্থায় ঈসা খান লোক পাঠিয়ে মুঘল সেনানায়কদের নিকট শান্তির প্রস্তাব দেন। কিন্তু মুঘলরা তাঁর প্রস্তাবে কর্ণপাত না করে দুর্গ অধিকারের কাজে লিপ্ত হয়। প্রচন্ড সংঘর্ষের পর মুঘল বাহিনী দুর্গ দু'টি দখল করে মাসুম খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে তিনি প্রতিরোধ করতে না পেরে নদী পথে পলায়ন করেন। কিন্তু তাঁর নৌকা পানিতে ডুবেগিয়ে অনেক সৈন্য মারা যায় এবং মাসুম খান সহ কয়েকজন পলায়নে সক্ষম হয়[১৮৯]। মাসুম খান কাবুলী কোন দিকে পলায়ন করেন তা আবুল ফযল উল্লেখ না করলে ও ধরে নেয়া যায় যে, তিনি ভাটিতে ঈসা খানের নিকটই আশ্রয় গ্রহণ করেন। কেননা ঈসা খানের উৎসাহেই তিনি মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। সুতরাং পরাজয়ের পর ঈসা খানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করাই ছিল স্বাভাবিক। যাহোক, মাসুম খান কাবুলী মুঘলদের নিকট পরাজিত হলেও ঈসা খানের উদ্দেশ্য অনেকাংশেই সফল হয়। কেননা মুঘল বাহিনী মাসুম খানের সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার কারণে কিছু সময়ের জন্য হলেও সরাসরি ভাটি আক্রমণের সুযোগ পায়নি।

দ্বিতীয়তঃ ঈসা খান মুঘল সুবাহ্দারও সেনানায়কদের নিকট শান্তির প্রস্তাব দিয়ে, মূল্যবান উপহার-উপঢৌকন প্রেরণ করে এবং মুঘলদের প্রতি অনুগত থাকার কথা বলে তাদেরকে ভাটি আক্রমণ থেকে বিরত রাখার কৌশল অবলম্বন করেন। এ অনুযায়ী তিনি মুঘল সুবাহ্দারের নিকট শান্তির প্রস্তাব দেন। এ সময় শাহ্বায খান ও সাদিক খানের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়ায় বাদশাহ্ আকবর তাদেরকে উপদেশ প্রদানের জন্য খাজা সুলায়মানকে বাংলায় প্রেরণ করেন। বাদশাহ্ আদেশ দেন যে, যিনি বাংলার শাসন ভার গ্রহণ করবেন তিনি অন্যজনকে বিহারের শাসনভার ছেড়ে দিবেন এবং তাঁরা

Dhaka University Institutional Repository

নিজেরাই সাব্যস্ত করবেন কে বাংলায় থাকবেন এবং কে বিহারে যাবেন। খাজা সুলায়মান প্রথমে সাদিক খানের নিকট যান এবং সাদিক খান বাংলায় থাকতে রাজী হওয়ায় তাঁকে বাংলার দায়িত্ব দেয়া হয়। সংগে সংগে শাহ্বায খান রাগান্বিত হয়ে বাংলা ছেড়ে চলে যান[১৬৬]। যাহোক, শাহ্বায খান বাংলা ছেড়ে যাওয়ার প্রাক্কালে ঈসা খান সাদিক খানের নিকট শান্তির প্রস্তাব দিয়ে সংবাদ প্রেরণ করেন। ঈসা খান এ মর্মে স্বীকৃত হন যে, তিনি মাসুম খান কাবুলীকে হেজাজে পাঠাবেন, তাঁর (ঈসা) এক আত্মীয়কে বাদশাহের দরবারে প্রেরণ করবেন এবং মূল্যবান উপহারও পাঠাবেন। এমনকি তিনি ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে মুঘল বাহিনীর নিকট থেকে যা কিছু হস্তগত করেছিলেন তাও ফেরত পাঠানোর প্রস্তাব দেন। কিন্তু হঠাৎ শাহ্বায খান, সাইদ খান ও অন্যান্য মুঘল কর্মকর্তাগণ বাংলা ত্যাগ করায় ঈসা খান তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করেন এবং মাসুম খান কাবুলীকে হেজাজে কিংবা তাঁর কোন আত্মীয়কে বাদশাহের দরবারে প্রেরণ করেন নি । তবে তিনি মাসুম খান কাবুলী কে কোনরূপ গোলযোগ করতে দেননি অর্থাৎ মাসুম খান কে তিনি মুঘল অধিকারভুক্ত এলাকায় পুনরায় আক্রমণ পরিচালনা থেকে বিরত রাখেন। ঈসা খান কতকটা নমনীয় ভাবও প্রদর্শন করেন। অন্যদিকে সাদিক খান কিছু এলাকা ঈসা খানকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। বিনিময়ে ঈসা খানও ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দের যুদ্ধে মুঘলদের নিকট থেকে অধিকৃত হাতী, কামান ইত্যাদি বাদশাহের নিকট পাঠিয়ে দেন। বাদশাহ্ আকবর এসব বিষয় মেনে নেন । কিন্তু তিনি মুঘল কর্মকর্তাদের বাংলা ত্যাগ অনুমোদন করেন নি[১৬৭]। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, আবুল ফযল ঈসা খানের এই শান্তি-প্রস্তাবকে মুঘলদের নিকট তাঁর "আত্মসমর্পণ" হিসেবে উল্লেখ করেন। কিন্তু কার্যত ঃ ইহাকে আত্মসমর্পণ বলা যায়না । কেননা দেখা যায় যে, ঈসা খান যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তন্মধ্যে ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দের যুদ্ধে মুঘলদের নিকট থেকে অধিকৃত হাতী, কামান ইত্যাদি প্রত্যর্পণ করা ব্যতিরেকে কার্যতঃ অন্যকোন প্রতিশ্রুতিই পালন করেন নি। অন্যদিকে তিনি যদি মুঘলদের নিকট আত্মসমর্পণই করে থাকেন তবে বাদশাহ্ আকবর শাহ্বায খানকে পুনরায় ঈসা খানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করতেন না। তাই বলা যায় যে, ঈসা খান শুধু মুঘলদের নিকট শান্তি-প্রস্তাবই দিয়েছিলেন, তিনি কোন অবস্থাতেই মুঘলদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন নি। অন্য কথায় বলা যায় যে, ঈসা খান

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মুঘলদের প্রতি অনুগত থাকার ভান করেছেন মাত্র। যাহোক, ঈসা খান উক্ত কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে মুঘলদেরকে সাময়িক ভাবে ভাটি আক্রমণ থেকে বিরত রাখতে এবং তাদের নিকট থেকে কিছু এলাকা হাতিয়ে নিতে সক্ষম হলেও মুঘলদের সাথে তাঁর এই সমঝোতা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। কেননা দেখা যায় যে, বাদশাহ্ আকবর পুনরায় শাহ্বায খানকে বিহার থেকে বাংলায় প্রেরণ করেন[১৬৮]।

১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শাহ্বায খান পুনরায় বাংলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন[১৬৯]। এরূপ পরিস্থিতিতে ঈসা খান পূর্ব কৌশল অবলম্বন করেন অর্থাৎ তিনি পুনরায় মুঘলদের নিকট শান্তি- প্রস্তাব দেন। আবুল ফযল এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই উল্লেখ করেন যে, বাংলাকে শান্ত করা হয়েছে (was the pacification of Bengal)। অতপর তিনি বলেন যে, "ঈসা খানকে শাস্তি প্রদানের জন্য শাহ্বায খান ভাটিতে সৈন্য প্রেরণ করেন। ঈসা খানের যুদ্ধ করার সাহস ছিল না এবং ইতোপূর্বে সাদিক খান শান্তি - চুক্তি অনুযায়ী যে এলাকা ঈসা খানকে ছেড়ে দিয়েছিলেন তা পুনরায় মুঘল অধিকারে চলে আসে। মুঘল বিজয় চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং সন্তোষজনক ভাবে কাজ সমাধা করা হয়। ঈসা খান দুর্লভ উপহার সামগ্রী প্রেরণ করেন এবং আপোসের ভাষা ব্যবহার করেন। তিনি বলেন যে, যেহেতু মাসুম খান কাবুলী দুর্ভাগ্য বশতঃ অকৃতজ্ঞ হয়েছেন সেহেতু তিনি (মাসুম) এখন ভীত - সন্ত্রস্ত। তাই তিনি দূর থেকে বাদশাহের খেদমত করবেন এবং তাঁর (মাসুম) ছেলেকে বাদশাহের দরবারে পাঠাচ্ছেন। শাহ্বায খান উত্তর দেন যে, মাসুম খান কাবুলী যদি প্রথমে হেজাজে গিয়ে পরে সেখান থেকে বাদশাহের দরবারে আসেন তবে ভাল হয়"[১৭০]।

আবুল ফযলের উপরোক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেননা তিনি এমন ভাবে বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেন যে, যাতে মনে হয় শাহ্বায খান ভাটিতে সৈন্য প্রেরণের সংগে সংগে ঈসা খান সাহস হারিয়ে ফেলেন এবং বিনা যুদ্ধেই মুঘলদের আনুগত্য স্বীকার কিংবা তাদের সাথে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেন। কিন্তু যেখানে ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে খান-

Dhaka University Institutional Repository

ই-জাহান এবং ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি নিজে ঈসা খানের নিকট পরাজিত হয়ে ভাটি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে ছিলেন সেখানে ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে ভাটিতে সৈন্য প্রেরণের সাথে সাথে কোনরূপ যুদ্ধ ব্যতিরেকে ঈসা খান মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করবেন ইহা কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন যে, মুঘল বিজয় চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাঁর এ কথাটিও সত্য নয়। কেননা জানা যায় যে, ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম জয় করার পুর্বে চট্টগ্রাম কখনও মুঘল অধিকারে ছিল না [১৯১]। তৃতীয়তঃ দেখা যায় যে, ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বাদশাহ্ আকবর উযীর খানকে বাংলার সুবাহ্দার ও শাহ্বায খানকে বখশী নিযুক্ত করেন[১৯২]। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, শাহ্বায খান যদি বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষমই হয়ে থাকেন তবে তাঁর পদন্নোতি না হয়ে পদাবনতি হলো কেন ? আবুল ফযল কোথাও এ প্রশ্নের উত্তর দেননি। চতুর্থতঃ ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সুবাহ্দার মানসিংহের ঈসা খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা, ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দে ঈসা খান ও মাসুম খান কাবুলীর ঘোড়াঘাট আক্রমণ এবং ১৫৯৭ খ্রীস্টাব্দে মানসিংহের পুত্র দূর্জন সিংহের ভাটি আক্রমণ ও ঈসা খানের সাথে যুদ্ধে পরাজয় ও মৃত্যু এসব কিছুই প্রমাণ করে যে, ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে শাহ্বায খান বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। সুতরাং আবুল ফযল শাহ্বায খান কর্তৃক বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা তথা বংলাকে শান্ত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করলেও প্রকৃত ঘটনা ছিল ভিন্নরূপ এবং তা হচ্ছে এই যে, শাহ্বায খানের পুনরায় বাংলায় আগমন এবং ভাটিতে সৈন্য প্রেরণের গুরুত্ব অনুধাবন করে ঈসা খান সরাসরি মুঘলদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে তাঁর পূর্ব কৌশল অবলম্বন করে সাদিক খানের নিকট থেকে তিনি যে এলাকা হাতিয়ে নিয়েছিলেন তা ফেরত দিয়ে, দুর্লভ উপহার প্রদান করে, মাসুম খান কাবুলীর ছেলেকে বাদশাহের দরবারে প্রেরণের কথা বলে এবং কিছুটা নমনীয় ভাব প্রদর্শন করে মুঘলদের নিকট শান্তি- প্রস্তাব দেন। এ সময় মুঘলদের সাথে ঈসা খানের কোনরূপ সংঘর্ষ না হওয়ায় ধরে নেয়া যায় যে, তাঁরা ঈসা খানের শান্তি-প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে এই যে, শাহ্বায খানের পরবর্তী সুবাহ্দার উযীর খান এবং সাইদ খানের সময় মুঘল বাহিনী ভাটিতে কোন আক্রমণ পরিচালনা করেনি। এ সময় তুলনামূলক ভাবে মুঘলদের সাথে ঈসা খানের শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল এবং দেখা যায় যে,

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খান সাইদ খানের মারফত বাদশাহ্ আকবরের নিকট একবার উপহারও প্রেরণ করেছিলেন[১৯৩]।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, ঈসা খান মুঘলদের বিরুদ্ধে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়েও একদিকে মাসুম খান কাবুলীকে সহায়তা দানের মাধ্যমে মুঘল অধিকারভুক্ত এলাকায় আক্রমণ পরিচালনা করে মুঘল বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত রেখে এবং অন্যদিকে মুঘল সুবাহ্দার ও সেনানায়কদেরকে উপহার প্রদান করে এবং মুঘলদের প্রতি অনুগত থাকার ভান করে ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এক দশকেরও কিছু বেশী সময় ধরে মুঘলদেরকে সরাসরি ভাটি আক্রমণ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হন। উল্লিখিত সময় কালের মধ্যে বিশেষতঃ ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে শাহ্বায খানের সাথে শান্তি স্থাপনের পর থেকে ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ঈসা খান নিজ-ভূখন্ডে তথা ভাটিতে কার্যতঃ প্রায় নিরুপদ্রব ছিলেন।

ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদের মুঘল-হুমকির মুকাবিলা

উপভাগ ৪ – ঈসা খান বনাম মানসিংহ ঃ

১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে মুঘলরা ঈসা খানের শান্তি-প্রস্তাব মেনে নিয়ে পরবর্তী কয়েক বছর ভাটি আক্রমণ থেকে বিরত থাকলেও এই শান্তি-চুক্তিকে কোন স্থায়ী সমাধান হিসেবে মেনে চলার প্রবণতা পরবর্তীকালে মুঘলদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়নি। কেননা দেখা যায় যে, বাদশাহ্ আকবর ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদেরকে দমন করার উদ্দেশ্যে সাইদ খানের স্থলে মানসিংহকে বাংলার সুবাহ্দার পদে নিযুক্ত করেন এবং ১৫৯৪ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা 'মে নানা রকম উপদেশ প্রদান করে বাংলায় প্রেরণ করেন[১৯৪]। মানসিংহ বাংলার রাজধানী তাঁড়ায় পৌঁছানোর পর ঈসা খানের বিরুদ্ধে পুনঃ আক্রমণ রচনার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ হিসেবে মানসিংহ বিভিন্ন দিকে কয়েকটি প্রাথমিক অভিযান প্রেরণ করেন এবং নৌ- আক্রমণ থেকে রাজধানীকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৫৯৫

Dhaka University Institutional Repository

খ্রীস্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তাঁড়া থেকে রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তর করেন। নতুন রাজধানীর নামকরণ করেন আকবর নগর[১৯৫]। যাহোক, ইতোমধ্যে মানসিংহের পুত্র হিম্মত সিংহের নেতৃত্বে প্রেরিত একটি মুঘল বাহিনী ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২রা এপ্রিল ভূষণা দুর্গ দখল করে নেয়[১৯৬]। নতুন রাজধানী থেকে ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর মানসিংহ ঈসা খানের বিরুদ্ধে যাত্রা শুরু করেন[১৯৭]।

এরূপ সংকটময় পরিস্থিতিতে ঈসা খান, নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেন নি, বরং মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধ করণার্থে তিনি যথাসম্ভব প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং তাঁর মিত্রদেরকে সুসংগঠিত করেন। এ সময় ঈসা খানের মিত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন উড়িষ্যার কতলু নুহানীর মন্ত্রী ও ভ্রাতা খাজা ঈসার পুত্র খাজা সুলায়মান ও খাজা উসমান, মাসুম খান কাবুলী এবং কেদার রায় । এখানে উল্লেখ্য যে, উড়িষ্যার আফগানরা আত্মসমর্পণ করার পর মানসিংহ খাজা উসমান, খাজা সুলায়মান, শের খান এবং হায়বাত খানকে ফরিদপুরে (খলিফতাবাদ) জায়গীর প্রদান করেন। কিন্তু পরে মানসিংহ তাদের জায়গীর কেড়ে নিয়ে তাদেরকে তাঁর নিকট ডেকে পাঠান। ফলে তাঁরা বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং পথিমধ্যে লুণ্ঠন করতে করতে তাঁরা সাতগাঁওয়ে পৌঁছেন। কিন্তু সাতগাঁও অধিকার করতে ব্যর্থ হয়ে তাঁরা চাঁদ রায়ের জমিদারী ভূষণার দিকে অগ্রসর হন। চাঁদ রায় তাঁর পিতা কেদার রায়ের পরামর্শে তাঁদেরকে নিমন্ত্রণ করে কৌশলে বন্দী করার চেষ্টা করেন। কিন্তু খাজা উসমান ও খাজা সুলায়মান চাঁদ রায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন এবং ১৫৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী চাঁদ রায়কে হত্যা করে ভূষণা দুর্গ দখল করে নেন। শেষ পর্যন্ত ঈসা খানের প্রচেষ্টায় উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয় এবং আফগানরা চাঁদ রায়ের পিতা কেদার রায়কে দুর্গটি প্রত্যর্পণ করেন[১৯৮]। এছাড়া ঈসা খান খাজা সুলায়মানকে কেদার রায়ের সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং খাজা উসমানকে বুকাইনগরের জমিদারী দান করেন[১৯৯]। এভাবে ঈসা খানের সাথে খাজা উসমান, খাজা সুলায়মান এবং কেদার রায়ের মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং তাঁরা মুঘল বিরোধী সংগ্রামে ঈসা খানের সাথে অংশ গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

যাহোক, মানসিংহ তাঁর নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানী থেকে ঈসা খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে ঈসা খান পশ্চাদপসরণ কৌশল অবলম্বন করেন এবং ব্রহ্মপুত্রের অপর পারে চলে যান। এ ক্ষেত্রে আবুল ফযল উল্লেখ করেন যে, এ সময় ঈসা খানের রাজ্যের অনেকাংশ মুঘলদের অধিকারে চলে আসে[২০০]। কিন্তু আবুল ফযলের এ বক্তব্য সত্য নয়। কেননা তাঁর এ বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করার মতো তথ্য আকবর নামায় নেই। যাহোক, বর্ষা মওসুম এসে পড়ায় মানসিংহ আর অগ্রসর না হয়ে বগুড়ার শেরপুর মুর্চায় শিবির স্থাপন করেন এবং সেলিম নগর নামে সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন[২০১]। অন্যদিকে ঈসা খানের মিত্র খাজা সুলায়মান এবং কেদার রায় পুনরায় মুঘলদের নিকট থেকে ভূষণা দুর্গ দখল করে নেন। এ অবস্থায় মানসিংহ তাঁর পুত্র দুর্জন সিংহকে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জুন মুঘল বাহিনী অনেক যুদ্ধের পর ভূষণা দুর্গ পুনর্দখলে সক্ষম হয় এবং দুর্গ অবরোধকালে দুর্গাভ্যন্তরে একটি কামান বিস্ফোরিত হয়ে খাজা সুলায়মান মৃত্যু বরণ করেন এবং কেদার রায় আহত হয়ে ঈসা খানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন[২০২]। এক্ষণে ঈসা খান ঘোড়াঘাটের মুঘল শিবির আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দের বর্ষাকালে তথা জুলাই- সেপ্টেম্বর মাসে মানসিংহ ঘোড়াঘাটে অবস্থান কালে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঠিক এসময় ঈসা খান মাসুম খান কাবুলীকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়াঘাট আক্রমণ করেন এবং মুঘল শিবিরের ২৪ মাইল দূরত্বের মধ্যে চলে আসেন। কিন্তু বৃষ্টিপাত কম হওয়ার দরুন নদীর পানি কমে যাওয়ায় তাঁরা সরে পড়েন। মানসিংহ সুস্থ হয়েই তাঁর পুত্র হিম্মত সিংহের নেতৃত্বে একদল সৈন্য ঈসা খানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলে ঈসা খান ও মাসুম খান কাবুলী এগার সিন্দুরে চলে আসেন[২০৩]।

অতপর মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধে ঈসা খান ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি মুঘলদের দৃষ্টি ভাটি থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে মানসিংহকে পশ্চাৎদিকে অর্থাৎ উত্তর দিকে তথা কুচবিহারের দিকে ব্যতিব্যস্ত রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সৌভাগ্যবশতঃ কুচবিহার রাজ্যের রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ ও তাঁর পিতৃব্য পুত্র রঘুদেবের মধ্যকার গৃহ-বিবাদ ঈসা খানকে তাঁর অভীষ্ট অর্জনে কিছুটা সুযোগ এনে দেয়। এখানে উল্লেখ্য যে, লক্ষ্মী নারায়ণের পিতা

Dhaka University Institutional Repository

নরনারায়ণ (মাল গোসাইন) অপুত্রক থাকা অবস্থায় তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র রঘুদেবকে (পাটকুনওয়ার) উত্তরাধিকারী মানোনীত করেছিলেন। কিন্তু নরনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র লক্ষী নারায়ণ কুচবিহারের রাজা হন। ফলশ্রুতিতে রঘুদেব তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এ অবস্থায় ঈসা খান রঘুদেবের প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করেন। ঈসা খানের সাহায্যে রঘুদেব লক্ষী নারায়ণের উপর আক্রমণ পরিচালনা করলে লক্ষী নারায়ণ মানসিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন [২০৪]। এখানে উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণ মুঘল বাদশাহের নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করেছিলেন[২০৫]। এছাড়া মুঘলদের নিকট বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত কুচবিহার রাজ্যের সামরিক গুরুত্বও ছিল অত্যধিক। কেননা দেখা যায় যে, বিভিন্ন আফগান প্রধান ও মুঘল বিদ্রোহীরা ঘোড়াঘাটে পরাজিত হলেই কুচবিহার রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নিত। এবং সুযোগ বুঝে সেখান থেকে ঘোড়াঘাটে এসে মুঘল বাহিনীর উপর আক্রমণ পরিচালনা করতো[২০৬]। যাহোক, এক্ষণে মানসিংহ কুচবিহারের রাজা লক্ষী নারায়ণের আবেদনকে গুরুত্বের সাথ অনুধাবন করেন এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য সেলিম নগর থেকে আনন্দ পুরে [২০৭] গমন করেন। সেখানে ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর লক্ষী নারায়ণ রাজা মানসিংহকে অভ্যর্থনা জানান এবং পরে তাঁর বোনকে মানসিংহের সংগে বিয়ে দেন। অন্যদিকে মানসিংহের আগমনের সংবাদ পেয়ে রঘুদেব সরে পড়েন[২০৮]। কিন্তু মানসিংহ কুচবিহার থেকে ফিরে আসলে ঈসা খানের সহায়তায় রঘুদেব পুনরায় লক্ষী নারায়ণকে আক্রমণ করেন এবং তিনি আবারও মানসিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। মানসিংহ এবার জাব্বর খান ও ফতেহ খান সূরের নেতৃত্বে একটি বাহিনী লক্ষী নারায়ণের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। ১৫৯৭ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মে মুঘল বাহিনী সেখানে পৌঁছে এবং প্রচন্ড সংঘর্ষের পর রঘুদেব পরাজিত হন[২০৯]। এ সময় ঈসা খান স্বয়ং একদল সৈন্য সংগ্রহ করে রঘুদেবের সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে মানসিংহ ঈসা খানের বিরুদ্ধে ভাটিতে অভিযান প্রেরণ করেন[২১০]। ফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এ যাত্রায় ঈসা খানের পক্ষে তাঁর মিত্র রঘুদেবের সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। তবে ঈসা খানের উদ্দেশ্য অনেকাংশেই সফল হয়। কেননা দেখা যায় যে, ঈসা খানের সাহায্যপুষ্ট হয়ে রঘুদেব তাঁর প্রতিপক্ষ লক্ষী নারায়ণকে যতোবারই আক্রমণ করেন ততোবারই লক্ষী নারায়ণ মানসিংহের নিকট সাহায্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রার্থনা করেন এবং মানসিংহও বারবার লক্ষী নারায়ণের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন ফলে মুঘল বাহিনী লক্ষী নারায়ণের সাহায্যার্থে কুচবিহারে গিয়ে সেখানে রঘুদেবের সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার কারণে ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরের পর থেকে ১৫৯৭ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত মুঘল বাহিনী সরাসরি ভাটি আক্রমণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়েছিল। সুতরাং বলা যায় যে, ঈসা খানের এ নব-উদ্ভাবিত কৌশল তাঁর জন্য কিছুটা হলেও সুফল বয়ে এনেছিল।

যাহোক, মানসিংহ ঈসা খানের বিরুদ্ধে ভাটিতে জলে ও স্থলে দু'টি বাহিনী প্রেরণ করেন। নৌ - বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল মানসিংহের পুত্র দূর্জন সিংহ। দূর্জন সিংহের নেতৃত্বাধীন নৌ-বাহিনী ঈসা খানের কিছু এলাকা লুট করে রাজধানী কতরাব আক্রমণ করেন। ঈসা খানও প্রস্তুত ছিলেন এবং এরূপ পরিস্থিতিতে তিনি মাসুম খান কাবুলীকে সাথে নিয়ে বিক্রমপুরের ছয় ক্রোশ দূরে বহু রণ-তরী নিয়ে উপস্থিত হন এবং মুঘল নৌ-বাহিনীকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেন। ১৫৯৭ খ্রীস্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে দূর্জন সিংহ সহ মুঘল বাহিনীর অনেক সৈন্য নিহত হয়। এ ছাড়া অনেক সৈন্য ঈসা খানের হস্তে বন্দী হয় এবং অনেক সৈন্য পলায়ন করে[২১১]। এ ভাবেই ঈসা খান তাঁর বিরুদ্ধে মানসিংহ কর্তৃক প্রেরিত সর্বাত্মক প্রস্তুতি সম্পন্ন অভিযানকে দৃঢ়তার সাথে প্রতিরোধ করে মুঘল বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দেন। কিন্তু আবুল ফযল বাদশাহ্ আকবরের মুখরক্ষার জন্য বলেন যে, "এ সর্বনাশ সত্ত্বেও কুচরাজা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা পেলেন। ঈসা খান দূরদৃষ্টি বশতঃ মুঘলদেরকে খোশামোদ করেন এবং বন্দীদেরকে ফেরত দেন"[২১২]। আবুল ফযলের এ বক্তব্য অনুসরণ করে স্যার যদুনাথ সরকার বলেন যে, ঈসা খান শান্তি স্থাপন করা বুদ্ধি মানের কাজ মনে করে যুদ্ধ বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেন এবং লক্ষী নারায়ণের উপর আক্রমণ পরিচালনা থেকে বিরত থাকেন এবং বাদশাহের নিকট আত্ম- সমর্পণ করেন[২১৩]। কিন্তু আবুল ফযল ও যদুনাথ সরকারের বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা যে যুদ্ধে সেনাপতি সহ অনেক সৈন্য নিহত হয় এবং মুঘল বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয় এবং ঈসা খান সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করেন সে যুদ্ধের পর মুঘলদের নিকট তাঁর আত্মসমর্পণের প্রশ্ন অবান্তর নয় কি? দ্বিতীয়তঃ যে যুদ্ধে মুঘল বাহিনীর

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষে ভাটির বিন্দুমাত্র এলাকাও জয় করা সম্ভব হয়নি সে যুদ্ধের পর তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে ঈসা খানের আত্মসমর্পণের ঘটনা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত হতে পারেনা। তৃতীয়তঃ মুঘলদের নিকট আত্মসমর্পণ করার মনোভাব কখনই ঈসা খানের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। যদি তাই হতো তবে তিনি যুদ্ধের পূর্বেই মুঘলদের নিকট আত্মসমর্পণ করতেন এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধে বিজয় লাভের পর আত্মসমর্পণ করার প্রয়োজন মনে করতেন না। সুতরাং নিসন্দেহে বলা যায় যে, ঈসা খান মুঘলদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন নি। তবে একদিকে এ যুদ্ধের পর প্রতিশোধ গ্রহণার্থে ঈসা খানের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ভাবে কোন অভিযান পরিচালনা না করায় এবং মানসিংহের[২১৪] বাংলা ছেড়ে চলে যাওয়া এবং অন্যদিকে ঈসা খান কর্তৃক মুঘল বন্দীদেরকে মুক্তিপ্রদান এবং কুচবিহারের রাজা লক্ষী নারায়ণকে পুনঃ আক্রমণ না করায় ধারণা করা অযৌক্তিক হবেনা যে, ঈসা খান ও মানসিংহের মধ্যে কার্যতঃ কোন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত না হলেও উভয় পক্ষের মধ্যে আপাতঃ সমঝোতা স্থাপিত হয়েছিল। ঈসা খান ও মানসিংহের মধ্যে এরূপ সমঝোতা একে বারেই অসম্ভব ছিল না। কেননা একদিকে মুঘল বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ও বিশেষতঃ দুই যোগ্য পুত্র মৃত্যুবরণ করায়[২১৫] স্বভাবতই মানসিংহ মনমরা হয়ে পড়েন এবং তাৎক্ষণিক ভাবে ঈসা খানের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযান পরিচালনা করার মতো মানসিক অবস্থাও হয়তো তাঁর ছিলনা, অন্যদিকে এ সময় ঈসা খানেরও যথেষ্ট বয়স হয়েছিল বিধায়[২১৬] তিনিও হয়তো মুঘলদের বিরুদ্ধে আর কোন সংঘর্ষে না জড়িয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করার প্রত্যাশায় মুঘল বন্দীদেরকে মুক্তি প্রদান করে ও কুচরাজার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা থেকে বিরত থেকে সমঝোতা স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। মুঘল বাহিনী তাৎক্ষণিক ভাবে ভাটি আক্রমণ না করায় ধরে নেয়া যায় যে, উভয় পক্ষের মধ্যে আপাতঃ সমঝোতা স্থাপিত হয়। এ সমঝোতাকেই যদুনাথ সরকার মুঘলদের নিকট ঈসা খানের আত্মসমর্পণ হিসেবে ধরে নিয়েছেন, সন্দেহ নেই। যাহোক, এ যুদ্ধের দু'বছর পর ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ঈসা খান মৃত্যুবরণ করেন[২১৭] এবং তাঁর মৃত্যুর পূর্বে মুঘলদেরকে ভাটিতে আর কোন অভিযান পরিচালনা করতে দেখা

Dhaka University Institutional Repository

যায়নি। সুতরাং উপরোক্ত যুদ্ধই ছিল মুঘলদের বিরুদ্ধে ঈসা খনের জীবনের সর্বশেষ প্রতিরোধ সংগ্রাম তথা স্বাধীনতা সংগ্রাম ।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, ঈসা খান পূর্বের মতো জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধেও তাঁর অসাধারণ বীরত্ব ও নব-উদ্ভাবিত রণ-কৌশলের দ্বারা মুঘল বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করতে সক্ষম হন। ফলশ্রুতিতে তিনি স্বাধীন ও সার্ব ভৌম অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এক কথায় বলা যায় যে, ঈসা খান স্বীয় জন্ম ভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থে মুঘল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উদ্ধত তরবারী হস্তেই মৃত্যুবরণ করেন।

ভাগ ৬ - ঈসা খানের মুঘল-বিরোধী অবস্থান ও আপেক্ষিক সুবিধে-অসুবিধে ঃ

প্রবল পরাক্রান্ত মুঘল বাদশাহ্ আকবর এবং তাঁর সুবাহ্দারদের বিরুদ্ধে ভাটি প্রধান ঈসা খানের যুদ্ধ যে একটি অসম যুদ্ধ ছিল এ বিষয়ে কোনরূপ দ্বিমতের অবকাশ না থাকারই কথা। কেননা এক দিকে ছিল বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী মুঘল বাদশাহ্ আকবরের সকল সম্পদ ও শক্তি নিয়ে মুঘল সুবাহ্দারগণ এবং অন্যদিকে বাদশাহ্ আকবরের কর্তৃত্বাধীন অনেক গুলো সুবাহ্র মধ্যে মাত্র একটি সুবাহ্র একাংশের অধিকারী ঈসা খান ও তাঁর মিত্র কয়েকজন জমিদার। মুঘল সুবাহ্দারদের অধীনে ছিল অনেক সেনাপতি, অশ্বারোহী সৈন্য, নৌ-বহর এবং হস্তী-বাহিনী থাকাও অসম্ভব ছিল না। ঈসা খান কর্তৃক ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দের যুদ্ধে মুঘলদের নিকট থেকে অধিকৃত হাতী ফেরত প্রদানের ঘটনা দৃষ্টে বুঝা যায় যে, মুঘল সৈন্যবাহিনীতে হাতীও ছিল[২১৮]। মুঘল নৌ-বহরের নৌকার মোট সংখ্যা নিরূপণ করার মতো কোন তথ্য জানা না থাকলেও ধারণা করা যায় যে, মুঘল সুবাহ্দারদের অধীনে ছয়/সাত শত নৌকা থাকা অসম্ভব নয়। কেননা বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের শাসনামলে বাংলার সুবাহ্দার ইসলাম খান চিশতীর সময়

মুঘল নৌ-বহরে নৌকার সংখ্যা ছয়/সাত শত ছিল বলে আবদুল করিম ধারণা করেন [২১৯]। মুঘল সুবাহ্‌দারগণ ছাড়াও আরো অনেক মুঘল সেনাপতিকে ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। সুবাহ্‌দার খান -ই-জাহানের সময় উল্লেখযোগ্য মুঘল নৌ-সেনাপতি ছিলেন শাহ্ বর্দী ও মুহম্মদ কুলী, শাহ্‌বায খানের সময় তরসুন খান, মুহিব আলী খান ও শাহ্ কুলী খান মাহরাম এবং মানসিংহের সময় তাঁর পুত্র হিম্মত সিংহ ও দূর্জন সিংহ এবং জাঝর খান ও ফতেহ খান সূর। এ ছাড়াও মুঘল বাহিনীতে আরো অনেক সেনাপতি ছিল। অন্যদিকে মাসুম খান কাবুলী ব্যতীত অন্য কাউকে ঈসা খানের সার্বক্ষণিক সংগী হিসেবে দেখা যায় না। ঈসা খানের অধীনে অশ্বারোহী ও হস্তীবাহিনী ছিল কিনা জানা যায় না । তবে ঈসা খানের অধীনে একটি শক্তিশালী নৌ-বাহিনী থাকা অসম্ভব ছিল না। কেননা জানা যায় যে, ঈসা খানের পুত্র মুসা খান ও বার -ভূঁঞাদের অধীনে সাতশত নৌকার একটি নৌ-বহর ছিল [২২০]। সর্বোপরি বাদশাহ্ আকবরকে সুবাহ্‌দারদের শক্তি বৃদ্ধিকল্পে সময় সময় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায়। এ খানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে শাহ্‌বায খান ভাটি অভিযান থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর বাদশাহ্ আকবর সাইদ খান এবং বিহার ও বাংলার অন্যান্য মুঘল জমিদারদের নিকট এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তাঁরা যেন ভাটি-প্রধান ঈসা খানকে দমন করার জন্য একযোগে কাজ করেন। এ ছাড়াও বাদশাহ্ আকবর শাহ্‌বায খানের সাহায্যার্থে রাজা টোডরমল, মুত্তালিব খান, সৈয়দ জামাল বখতিয়ার এবং অন্যান্য সুযোগ্য ও উৎসাহী কর্মকর্তাকে প্রেরণের প্রস্তাব দেন [২২১]। পক্ষান্তরে ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদের অতিরিক্ত সাহায্য পাওয়ার মতো কোন উৎস ছিলনা। অতএব, সম্পদ বল, সৈন্যবল ও অস্ত্রবলের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, তুলনামূলক ভাবে মুঘলরা ঈসা খানের চেয়ে সন্দেহাতীত ভাবে বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ঈসা খানের এমন কিছু অবস্থানগত সুবিধা ছিল যার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পক্ষে প্রায় ২৫ বছর পর্যন্ত কার্যকর ভাবে মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রচুর সম্পদ, সৈন্যবল ও অস্ত্রবল থাকা সত্ত্বেও ঈসা খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে মুঘল বাহিনীকে অনেক অসুবিধার

Dhaka University Institutional Repository

সন্মুখীন হতে হয়েছে এবং ঈসা খান তাদের অসুবিধা সমূহের পূর্ণসদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মুঘল বাহিনী ঈসা খানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে প্রথমেই প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার সন্মুখীন হয়। কেননা সমসাময়িক কালে বাংলার অসংখ্য নদ-নদী, বিল-ঝিল এবং জলাভূমি উত্তর ভারত থেকে আগত মুঘল সৈন্যদের অভিযানে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা এবং তাদের অসংখ্য শাখা- প্রশাখা বাংলার বিশেষতঃ পূর্ব-বাংলার তথা ভাটি অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে। এ তিন বৃহত নদী ও তাদের শাখা-প্রশাখা বিধৌত ও বেষ্টিত অঞ্চল নিয়েই ভাটি গঠিত এবং এ ভাটিতেই ছিল ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদের প্রধান ঘাঁটি। বর্ষাকালে ভয়ংকর রূপধারণকারী এ নদীগুলো বিশেষতঃ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদেরকে আক্রমণ বা পরাজিত করা সহজ ছিলনা। তাছাড়া মুঘলরা তখনও পূর্ব বাংলার নদ-নদী এবং রাস্তাঘাটের সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলনা। পক্ষান্তরে এরূপ নদ-নদী, বিল-ঝিল ও জলাভূমিপূর্ণ ভাটি অঞ্চলে ঈসা খানের জন্ম হয় এবং এখানেই তিনি বড় হয়ে উঠেন, যে কারণে এখানকার সবকিছুই ছিল তাঁর নখদর্পণে এবং মুঘল বাহিনীর আক্রমণ মুকাবিলা তাঁর পক্ষে কিছুটা সহজ হয়। দ্বিতীয়তঃ ইহা সর্বজনবিদিত যে, উত্তর ভারতের অধিবাসীরা বাংলার জলবায়ুকে ভীতির চোখে দেখত। মুঘলরাও এর ব্যতিক্রম ছিলনা। মুঘল সুবাহ্দার এবং মুঘল সৈন্যরা বাংলায় চাকুরী করতে পছন্দ করতোনা। এ প্রসংগে দু'একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। গৌড় দখলের পর বাদশাহ্ হুমায়ুন জাহিদ বেগকে বাংলার শাসন কর্তা নিয়োগ করেন। সমৃদ্ধশালী প্রদেশের এ রকম একটি উচ্চ পদে নিযুক্তির জন্য বাদশাহের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে জাহিদ বেগ মন্তব্য করেন যে, "জাঁহাপনা কি আমাকে মারার জন্য বাংলা অপেক্ষা উত্তম জায়গা খুঁজে পান নি"[১১২]। এমনকি দেখা যায় যে, সুবাহ্দার খান-ই-আযমের নিকট বাংলার জলবায়ু অপছন্দ হওয়ার কারণে তিনি বাদশাহ্ আকবরের নিকট বাংলা থেকে অন্যত্র বদলীর আবেদন করেন। বাদশাহ্ আকবর খান-ই-আযমের স্থলে শাহবায খানকে বাংলার সুবাহ্দার নিযুক্ত করেন[১১৩]। এ ছাড়া সুবাহ্দার মানসিংহও বাংলার জলবায়ুকে ভয় করতেন[১১৪]।

অন্যদিকে বাদশাহ্ আকবর বাংলায় অবস্থানকারী মুঘল সৈন্যদের উৎসাহ দেয়ার জন্য তাদের বেতন শতকরা একশত ভাগ বৃদ্ধি করেন। এ প্রসংগে আবুল ফযল বলেন যে, "because that country is by its climate inimical to horses, and some parts of it also are injurious to men."[২২৫] সুতরাং দেখা যায় যে, মুঘল সুবাহ্দার ও সৈন্যরা বাংলার জলবায়ুকে ভীতির চোখে দেখত। বাংলার জলবায়ুকে ভয় পাওয়ার কতিপয় কারণও ছিল। এদেশের দীর্ঘ স্থায়ী বর্ষাকাল, প্রচুর বৃষ্টিপাত, খরস্রোতা নদ-নদী, নৌকা যোগে যাতায়াত ইত্যাদি জীবন প্রণালীর সাথে উত্তর ভারত থেকে আগত মুঘলদের পরিচয় ছিলনা এবং এ ধরনের পরিবেশে বসবাস করার অভ্যাসও তাদের ছিল না। সর্বোপরি এদেশের মহামারীও তাদের নিকট ভীতির কারণ ছিল। কেননা দেখা যায় যে, ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে গৌড়ে মহামারীর কারণে সুবাহ্দার মুনিম খান সহ অনেক মুঘল সৈন্য মারা যায় এবং ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে শাহ্বায খানের ভাটি অভিযানের সময়ও অনেক মুঘল সৈন্য মৃত্যু বরণ করে[২২৬]। স্বভাবতই এসব মৃত্যু মুঘল সৈন্যদের মনে ভয়ের সঞ্চার করে। যাহোক, বাংলার জলবায়ুর ভীতি মুঘল সৈন্যদের মনোবল নষ্ট করে দিত এবং ইহা ছিল ঈসা খানের জন্য নিঃসন্দেহে একটি বাড়তি সুবিধা। তৃতীয়তঃ মুঘল বাহিনীর প্রধান শক্তি ছিল অশ্বারোহী সৈন্য। নদী-নালা, বিল-ঝিল, ঝোপ-ঝাড়, বৃক্ষরাজি ও লতাগুল্মে পরিপূর্ণ ভাটি অঞ্চল এই অশ্বারোহী সৈন্যদের স্বচ্ছন্দে চলাফেরার জন্য সুবিধাজনক ছিলনা। কাজেই মুঘল বাহিনীকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঈসা খানের বিরুদ্ধে স্থল যুদ্ধের পরিবর্তে নৌ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। কিন্তু নৌ-যুদ্ধে ঈসা খানের বিরুদ্ধে মুঘল বাহিনী সফল হতে পারেনি। কেননা চতুর্দিকে নদ-নদী ও জলবেষ্টিত হওয়ায় এখানকার অধিবাসীরা স্বভাবত নৌ-চালনায় ও নৌ-যুদ্ধে পারদর্শী ছিল বিধায় ঈসা খানের পক্ষে একটি শক্তিশালী নৌ-বহর গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। এছাড়া ঈসা খানের নৌ-বহরের সৈনিক ও নাবিকরা জল পথে দ্রুত চলতে পারত এবং সুবিধাজনক স্থানে আক্রমণ করে সহজেই তুলনামূলক ভাবে নৌ-চালনা ও নৌ-যুদ্ধে অনভিজ্ঞ উত্তর ভারত থেকে আগত মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে সফলতা লাভে সক্ষম হয়। সর্বোপরি, এখানে অনেক ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দ্বীপ থাকার কারণে ঈসা খানের নৌ-সৈন্যরা সহজেই এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে সরে পড়তে পারতো, যে কারণে মুঘল সৈন্যদের পক্ষে তাদের হদিস পাওয়া সম্ভব

Dhaka University Institutional Repository

হতোনা। তাই দেখা যায় যে, ঈসা খান ১৫৭৫,১৫৭৮, ১৫৮৪ এবং ১৫৯৭ খ্রীস্টাব্দে যথাক্রমে মুঘল নৌ-সেনাপতি শাহ্ বর্দী, সুবাহ্দার খান-ই-জাহান, শাহ্বায খান, এবং সেনাপতি দূর্জন সিংহকে নৌ-যুদ্ধে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হন। ফলশ্রুতিতে প্রচন্ড মুঘল আক্রমণের মুখেও ঈসা খান স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে কৃতকার্য হয়েছিলেন। চতুর্থতঃ ভাটি-প্রধান ঈসা খান ছিলেন সমসাময়িক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও সেনাপতি। সামরিক-সংগঠন, সেনাপতিত্ব ও শৌর্য বীর্যে তিনি সন্দেহাতীত ভাবে খান-ই-জাহান, শাহ্বায খান, সাদিক খান এবং মানসিংহের মতো বাদশাহ্ আকবরের খ্যাতনামা সেনানায়কদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতম ছিলেন। তিনি বুদ্ধিবলে স্বীয় নেতৃত্বাধীনে তাঁর মিত্রদের সমন্বয়ে মুঘল বিরোধী সামরিক জোট গঠন করেন এবং তাদেরকে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে মুঘলদের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেন। ফলশ্রুতিতে বহু বছর তিনি মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে সক্ষম হন। পঞ্চমতঃ মুঘল বাহিনীর তুলনায় ঈসা খানের সৈন্যবাহিনী ছিল অধিকতর সুসংগঠিত ও সুশৃংখল। কেননা প্রায়ই মুঘল সুবাহ্দারদের সাথে অন্যান্য কর্ম কর্তাদের বিরোধ ও মতানৈক্য ঘটতে দেখা যায়। এখানে শাহ্বায খানের সাথে তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তা এবং শাহ্বায খানের সাথে সাদিক খানের মতানৈক্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শাহ্বায খানের সাথে অন্যান্য মুঘল কর্মকর্তাদের বিরোধ প্রসংগে আবুল ফযল বলেন যে, "It was a time when both parties (Shahbaz and his officers) should have lighted the lamp of discernment, and have practised conciliatory measures. But from somnolences of intellect, there was an increase of blindness, and arrogance rose high . From self - conceit Shahbaz K. vexed people , and his officers snapped the thread of moderation and behaved in a silly manner."[২২৭] আবুল ফযল আরো বলেন যে, "The officers from short- sightedness saw their gain in what was their loss, and thought that the defeat of Shahbaz K. would be an advantage to themselves. The first to go off without fighting was Muhibb Ali K. Every one left his place and went a roadless road... Shahbaz K. awoke from his sleep of haughtiness and made some effort to win the affections of his officers, but misplaced repentance is of no avail. He was obliged to march for Tanda."[২২৮] শাহ্বায খানের সাথে সাদিক খানের

Dhaka University Institutional Repository

মতবিরোধের কারণে বাদশাহ্ আকবর তাদেরকে বুঝানোর জন্য খাজা সুলায়মানকে বাংলায় প্রেরণ করেন । এ প্রসংগে আবুল ফযল বলেন যে, "The Bengal officers out of conceit and selfishness severed the thread of singleness of heart. Sadiq went off with some men in one direction, and Shahbaz went off in another ...They withdrew their hands from work and indulged in mutual animosity. Khwaja Sulaiman was sent to them from court to give them advice, and an order was given that it was not right to do one work in two divisions."[২২৯] যাহোক, মুঘল সুবাহ্দার ও কর্মকর্তাদের মধ্যকার উপরোক্ত মতানৈক্য ও মতবিরোধ ঈসা খানের জন্য একটি বাড়তি সুবিধা ছিল। ষষ্ঠতঃ ঈসা খানের ছিল অসীম সাহস, অদম্য মনোবল, নব-নব রণ কৌশল উদ্ভাবনের ক্ষমতা এবং অকুণ্ঠ দেশ-প্রেম, যে কারণে তুলনামূলক ভাবে সীমিত শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কখনও পিছপা হননি। সর্বোপরি ইহা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, ঈসা খান মুঘল বিরোধী সংগ্রামে নিশ্চিত ভাবেই এ দেশের জনগণের সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন লাভ করেছিলেন। কেননা সাধারণ মানুষের সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন ব্যতিরেকে কোন স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষেই সীমিত শক্তি নিয়ে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী কোন শাসকের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। তবে ঈসা খানের পক্ষাবলম্বন করে এ দেশের জনগণ যে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিল সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও বাংলার জনগণ যে, স্বদেশ প্রেমিক ছিল এবং স্বাধীনতা-প্রিয় ব্যক্তিদেরকে সমর্থন করেছিল তার নযীর ইতিহাসে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে লখনৌতির শাসক মুগীস আল-দীন তুগরল ও দিল্লীর সুলতান গিয়াস আল-দীন বলবনের মধ্যকার যুদ্ধের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। গিয়াস আল-দীন বলবন লখনৌতি আক্রমণ করলে তুগরল আত্মগোপন করেন। বলবন তুগরলের সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন, কিন্তু এদেশের কোন ব্যক্তিই তুগরলের অবস্থানের সংবাদ বলবনকে দেয়নি। এমনকি দু'জন ব্যবসায়ী যারা তুগরলের সেনা ছাউনী থেকে ফিরছিল, তারাও বলবনের সেনাপতিদের প্রশ্নের জবাবে কোন তথ্য প্রকাশ করেনি। কিন্তু ব্যবসায়ীদের একজনকে হত্যা করার পর অন্যজন প্রাণ ভয়ে তুগরল ও তাঁর সৈন্যদের অবস্থানের তথ্য প্রকাশ করে[২৩০]। যাহোক, তুগরলের মতো ঈসা

Dhaka University Institutional Repository

খানের প্রতিও যে এ দেশের সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল তা বলা অযৌক্তিক হবে না। এ জন সমর্থনও ছিল মুঘলদের বিরুদ্ধে ঈসা খানের একটি উল্লেখযোগ্য অবস্থান গত সুবিধা।

ভাগ ৭ - ঈসা-মুঘল সংঘর্ষের চূড়ান্ত পরিণতি ঃ

পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গেছে যে, তুকারায়ের যুদ্ধে দায়ূদ খান কাররানীর পরাজয় এবং মুঘলদের সাথে তাঁর সম্পাদিত কটকের সন্ধি-চুক্তি যেমনি বাংলার আফগান প্রধান ও ভূঁঞা-জমিদারগণ মেনে নেয়নি তেমনি রাজমহলের যুদ্ধে দায়ূদ খানের পতনেও বাংলার এ সকল স্থানীয় নায়কগণ পরাজয় স্বীকার করেন নি। দায়ূদের অবর্তমানে তাঁরা ভাটি-প্রধান ঈসা খানের নেতৃত্বে মুঘল-বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। ফলশ্রুতিতে বাদশাহ্ আকবরও বাংলার বিশেষতঃ পূর্ববাংলা তথা ভাটি অঞ্চলের এই মুঘল-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান সংগঠক ঈসা খানকে দমনের জন্য ভাটি অঞ্চলে একের পর এক অভিযান প্রেরণ করেন। দেখা যায় যে, মুঘলরা মোট চারবার ঈসা খানের বিরুদ্ধে ভাটি অঞ্চলে অভিযান প্রেরণ করে। প্রথমবার ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে সুবাহ্দার খান-ই-জাহানের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী ভাটির কেন্দ্রস্থলে কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। প্রথম দিকে মুঘল বাহিনী কিছুটা সফলতা অর্জনে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে ভাটি ত্যাগ করে রাজধানী তাঁড়ার নিকটবর্তী সিহহতপুরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। অতপর কয়েক বছর বিরতি দিয়ে ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে সুবাহ্দার শাহ্বায খানের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী দ্বিতীয়বার সরাসরি ভাটি আক্রমণ করে। প্রথমবারের মতো এবারও ঈসা খান মুঘল বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করতে সক্ষম হন। ফলে তাদের দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও চরম ভাবে ব্যর্থ হয়। ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে শাহ্বায খান তৃতীয়বার ঈসা খানের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেন। এ পর্যায়ে আবুল ফযল শাহ্বায খান কর্তৃক বাংলাকে শান্ত করার কথা উল্লেখ করলেও বস্তুতঃ শাহ্বায খানের পক্ষে ঈসা খানের বিরুদ্ধে কোন কিছুই করা সম্ভব

Dhaka University Institutional Repository

হয়নি। অতপর ১৫৯৭ খ্রীস্টাব্দে সুবাহ্দার মানসিংহ তাঁর পুত্র দূর্জন সিংহের নেতৃত্বে চতুর্থবারের মতো ভাটির কেন্দ্রস্থলে অভিযান প্রেরণ করেন। এ পর্যায়ে ঈসা খানের হস্তে মুঘল বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয় এবং যুদ্ধে দূর্জন সিংহ মৃত্যুবরণ করেন। সুতরাং এ বারও মুঘলদের ভাটি অভিযান চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আবুল ফযল পুনঃপুনঃ মুঘল বাহিনীর সফলতার কথা উল্লেখ করলেও বস্তুত ঈসা খান মুঘলদের প্রত্যেকটি প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দেন। ফলশ্রুতিতে মুঘল বাহিনীর পক্ষে ভাটি অঞ্চলে বাদশাহ্ আকবরের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি এবং মুঘল বাহিনীর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ঈসা খানকে স্বীয় অবস্থানে অক্ষত ও দৃঢ় ভাবে বহাল থাকতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ঈসা খানের মৃত্যুতে আবুল ফযল খুশী হয়ে "বিদ্রোহের কাঁটা দূরীভূত হয়েছে" (the thornbush of commotion was extirpated)[২৩১] বলে উল্লেখ করলেও ঈসা খানের মৃত্যুর পরেও কয়েক বছর পর্যন্ত ভাটি অঞ্চলে মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। কেননা ঈসা খানের গৌরবময় এবং বীরত্বপূর্ণ দীর্ঘ-সংগ্রামী জীবনের সফলতায় অনুপ্রাণিত হয়ে ঈসা খানের মৃত্যুর পর একদশকেরও বেশী সময় পর্যন্ত ঈসা খানের পুত্র মুসা খানের নেতৃত্বে ভাটির বার -ভূঁঞাগণ ঈসা খান কর্তৃক উত্তোলিত মুঘল-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ধ্বজা সাফল্যের সাথে সমুন্নত রাখতে সক্ষম হয়। তাই বলা যায় যে, ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে দায়ূদ খান কারারানীর মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের তীব্র ছোবল থেকে বাংলার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার মহান ব্রত গ্রহণ করে ভাটি-প্রধান ঈসা খান যে প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করেছিলেন তার ফলে সমগ্র বাংলা না হলেও অন্ততঃ স্বীয় জন্মভূমি পূর্ব বাংলা তথা ভাটি অঞ্চল শুধু তাঁর জীবদ্দশাতেই নয়, বরং তাঁর মৃত্যুর পরও একদশকেরও কিছু বেশী সময় পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। এককথায় বলা যায় যে , ঈসা খানের দীর্ঘ প্রতিরোধ সংগ্রামের ফলেই বাদশাহ্ আকবর তাঁর জীবদ্দশায় সমগ্র বাংলায় মুঘল আধিপত্য দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১। Ad. Hist., পৃঃ ৪২৫ ।

২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩৮ ।

৩। The Afghans, পৃঃ ৫৯ ।

৪। সুলতানী আমল, পৃঃ ৩৬৮ ।

৫। The Afghans, পৃঃ ১১৪ ।

৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৮-১১৯ ।

৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২০-১২১ এবং Ad. Hist., পৃঃ ৪৪৩ ।

৮। The Afghans, পৃঃ ১২২ ।

৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৩-১২৪ ।

১০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৫ ।

১১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৫-১২৬ ।

১২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৬-১২৭ ।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৭ ।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৭ ।

১৫। Ad. Hist., পৃঃ ৪৪৫ ।

১৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪৫ ।

১৭। The Afghans, পৃঃ ১২৭-১২৯ ।

১৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১-১৩৩ ।

১৯। Ad. Hist., পৃঃ ৪৪৬ ।

২০। The Afghans, পৃঃ ১৩৪ ।

২১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৪ ।

২২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৪ ।

২৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৫-১৩৬ ।

২৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৬ ।

২৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৬-১৩৮ ।

২৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬১ ।

Dhaka University Institutional Repository

২৭। Ad. Hist., পৃঃ ৪৪৮ এবং Ishwari Prasad : A Short History of Muslim Rule in India, Allahabad, 1939, পৃঃ ৩৪৪-৩৪৫ (পরবর্তীতে Short History হিসেবে উল্লিখিত)।

২৮। Ad. Hist., পৃঃ ৪৪৮।

২৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪৭-৪৪৮।

৩০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪৭।

৩১। The Afghans, পৃঃ ১৩৯-১৪০।

৩২। Ad. Hist., পৃঃ ৪৪৮ এবং Short History, পৃঃ ৩৪৫।

৩৩। Ad. Hist., পৃঃ ৪৪৮-৪৪৯।

৩৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪৯।

৩৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫০।

৩৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫০-৪৫১।

৩৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫১-৪৫২।

৩৮। The Afghans, পৃঃ ১৬২ এবং Social and Cultural History of Bengal Vol. I (Muhammad Abdur Rahim), Karachi, 1963, পৃঃ ২৮। পরবর্তীতে Cultural Hist. Vol. I হিসেবে উল্লিখিত।

৩৯। The Afghans, পৃঃ ১৬২।

৪০। Cultural Hist. Vol. I, পৃঃ ৪০৪-৪০৫।

৪১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৩।

৪২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৩।

৪৩। The Afghans, পৃঃ ১৬২।

৪৪। Cultural Hist. Vol. I., পৃঃ ২৩।

৪৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩-২৪।

৪৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬।

৪৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬-২৭।

৪৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯।

৪৯। সুলতানী আমল, পৃঃ ১২।

৫০। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ৪২৭।

Dhaka University Institutional Repository

৫১। The Afghans, পৃঃ ১৬৩।

৫২। Cultural Hist. Vol. I, পৃঃ ২৮।

৫৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০৩।

৫৪। সুলতানী আমল, পৃঃ ৩২৬।

৫৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬১-৩৬৩।

৫৬। The Afghans, পৃঃ ১৯২, ২৪৮ এবং সুলতানী আমল, পৃঃ ৩৭৬।

৫৭। The Afghans, পৃঃ ১৯২-১৯৩।

৫৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৩।

৫৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৫-২০৯।

৬০। মোগল আমল, পৃঃ ২৫।

৬১। The Afghans, পৃঃ ২০৯।

৬২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৭।

৬৩। মোগল আমল, পৃঃ ১৩৩-১৩৪।

৬৪। Ad. Hist., পৃঃ ৪৫৩ এবং Short History, পৃঃ ৩৬৫-৩৬৬।

৬৫। Ad. Hist., পৃঃ ৪৫৩-৪৫৫।

৬৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫৫-৪৫৬।

৬৭। সুলতানী আমল, পৃঃ ৩১৯।

৬৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১৯-৩২৭।

৬৯। ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল শের শাহ্ বাংলার রাজধানী গৌড় দখল করে নিলে গিয়াস আল-দীন মাহ্মুদ শাহ্ মুঘল বাদশাহ্ হুমায়ূনকে গৌড় আক্রমণ করতে অনুরোধ করেন। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৭ এবং ৩৬১।

৭০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬৩।

৭১। The Afghans, পৃঃ ২৩৫।

৭২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৫।

৭৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬১-১৬২।

৭৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪৮।

৭৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯২।

৭৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯২।

৭৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮২।

Dhaka University Institutional Repository

৭৮। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ৫-৬। আবুল ফযলের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, সমগ্র ভারতবর্ষকে একই শাসনাধীনে আনয়নের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা সর্বদা আকবরের মনে জাগরুক ছিল। কিন্তু বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার কাররানী আফগান শাসক সুলায়মান খান ছিলেন আকবরের লক্ষ্য অর্জনের পথে মারাত্মক বাধা স্বরূপ। সুলায়মান কাররানীর মৃত্যু সংবাদ আকবরের নিকট পৌঁছামাত্রই তাঁর অধিকাংশ কর্মকর্তা তাঁকে গুজরাট অভিযান পরিত্যাগ করে পূর্ব-ভারতে অভিযান পরিচালনা করার পরামর্শ দেয়। আকবর রাজধানীতে থাকলে হয়তো তাঁর কর্মকর্তাদের পরামর্শ অনুযায়ী গুজরাট অভিযানের পরিবর্তে পূর্ব-ভারতের দিকেই অভিযান পরিচালনা করতেন। কিন্তু যেহেতু পূর্বেই গুজরাট অভিযান আরম্ভ হয়েছে এবং যেহেতু সুলায়মান কাররানীর মৃত্যু হয়েছে সেহেতু পূর্ব-ভারত জয় করা সহজতর হবে চিন্তা করে আকবর নিজে পূর্ব-ভারতে অভিযান পরিচালনায় অংশ গ্রহণ না করে মুনিম খানকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা আক্রমণের নির্দেশ প্রদান করেন।

৭৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২২।

৮০। খান-ই-যামান ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দের দিকে প্রথম জৌনপুরে বিদ্রোহ করার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু আকবর তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে গঙ্গাতীরবর্তী কারা নামক স্থানে খান-ই-যামান ও তাঁর ভ্রাতা বাহাদুর খান পুনরায় আকবরের আনুগত্য স্বীকার করেন। ফলে আকবর তাঁকে ক্ষমা করে দেন। ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দে খান -ই- যামান দ্বিতীয়বার বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। Vincent A. Smith : Akbar The Great Mogul, Second Edition Revised, Oxford At the Clarendon Press 1919., পৃঃ ৫৫ এবং ৭৪।

৮১। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ৫-৬।

৮২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮ এবং The Afghans, পৃঃ ১৮৬।

৮৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৮ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৬-১৮৭।

৮৪। আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ২৮-২৯।

৮৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯ এবং সুলতানী আমল, পৃঃ ৩৭৬।

৮৬। The Afghans, পৃঃ ১৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

৮৭। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ২৯-৩১, The Afghans, পৃঃ ১৯৪ এবং সুলতানী আমল, পৃঃ ৩৭৬-৩৭৭।

৮৮। Iqtidar Alam, পৃঃ ১১৮।

৮৯। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ৫৭-৫৮ এবং Iqtidar Alam, পৃঃ১১৯।

৯০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯।

৯১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯১, ৯৭ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯।

৯২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১ এবং The Afghans, পৃঃ ১৮৭-১৮৮।

৯৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮ এবং Iqtidar Alam, পৃঃ ১৩১।

৯৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৮-৯৯ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩১।

৯৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৯।

৯৬। The Afghans, পৃঃ ১৮৮-১৮৯ এবং সুলতানী আমল, পৃঃ ৩৭৭।

৯৭। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ১০০।

৯৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০০-১০১, The Afghans, পৃঃ ১৯৫ এবং সুলতানী আমল, পৃঃ ৩৭৭-৩৭৮।

৯৯। Iqtidar Alam, পৃঃ ১৩২। এম, এ, রহিম ও আবদুল করিমের মতে ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরের প্রথম দিকে মুঘলরা পাটনা অবরোধ করে (The Afghans, পৃঃ ১৯৫ এবং সুলতানী আমল, পৃঃ ৩৭৮)।

১০০। Iqtidar Alam, পৃঃ ১৩২।

১০১। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ১৩৫। Iqtidar Alam এর মতে আকবর পাটনা অবরোধ তদারকির জন্য আসেন ৪ঠা আগষ্ট (পৃঃ ১৩৪)।

১০২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৫-১৩৭, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৪, সুলতানী আমল, পৃঃ ৩৭৮ এবং The Afghans, পৃঃ ১৯৫-১৯৬।

১০৩। The Afghans, পৃঃ ১৯৬।

১০৪। Iqtidar Alam, পৃঃ ১৩৫।

১০৫। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ১৪৪।

১০৬। Iqtidar Alam, পৃঃ ১৩৬।

১০৭। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ১৪৪।

১০৮। Iqtidar Alam, পৃঃ ১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

১০৯। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ১৪৫।

১১০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫০-১৫২ এবং Iqtidar Alam, পৃঃ ১৩৭।

১১১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫০-১৫৩ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৮।

১১২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৯ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৯।

১১৩। Iqtidar Alam, পৃঃ ১৩৯।

১১৪। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ১৭০ এবং The Afghans, পৃঃ ১৯৮।

১১৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭১-১৭২ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৯।

১১৬। The Afghans, পৃঃ ১৯৯।

১১৭। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ১৬৯-১৭০ এবং The Afghans, পৃঃ ১৯৯।

১১৮। The Afghans, পৃঃ ১৯৯-২০০।

১১৯। Iqtidar Alam, পৃঃ ১৪১-১৪২ এবং The Afghans, পৃঃ ২০০।

১২০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪২ এবং আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ১৭৪।

১২১। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ১৭৪-১৮০।

১২২। সুলতানী আমল, পৃঃ ৩৭৯।

১২৩। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ১৮২-১৮৫, Iqtidar Alam, পৃঃ ১৪৩-১৪৪, The Afghans, পৃঃ ২০২ এবং সুলতানী আমল, পৃঃ ৩৮২।

১২৪। The Afghans, পৃঃ ২০৩।

১২৫। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ২২৬ এবং Iqtidar Alam, পৃঃ ১৪৫।

১২৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৬-২২৭, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৬ এবং The Afghans, পৃঃ ২০৩-২০৪।

১২৭। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ২২৮-২২৯ এবং The Afghans, পৃঃ ২০৪।

১২৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৯-২৩০ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৪।

১২৯। The Afghans, পৃঃ ২০৪-২০৫।

১৩০। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ২৩৮-২৪১এবং The Afghans, পৃঃ ২০৫।

১৩১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫২ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৫।

১৩২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫২-২৫৩।

১৩৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৪-২৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৪। রাজমহলের যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন বি,পি,পি, ভল্যুম ৩৬, পৃঃ ৪১-৫০ এবং The Afghans, পৃঃ ২০৪-২০৯ এবং সুলতানী আমল, পৃঃ ৩৮২-৩৮৪।

১৩৫। বি,পি,পি, ভল্যুম ৩৬, পৃঃ ৪৫-৪৭ এবং The Afghans, পৃঃ ২০৯।

১৩৬। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ২৭৭ এবং মোগল আমল,পৃঃ ১১৬।

১৩৭। মোগল আমল, পৃঃ ১১৬।

১৩৮। H. Bengal, পৃঃ ১৯৪-২১২।

১৩৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৫।

১৪০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৩।

১৪১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৫।

১৪২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৫-২২৬।

১৪৩। বি,পি,পি, ভল্যুম ৩৫, পৃঃ ২৯-৩০।

১৪৪। মোগল আমল, পৃঃ ২৬-২৭।

১৪৫। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ৩৭৬-৩৭৮।

১৪৬। মোগল আমল, পৃঃ ১২০ এবং বি,পি,পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ ৪৪, পাদটীকা-১৫।

১৪৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২০-১২১ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫, পাদটীকা-১৬।

১৪৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২১ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫।

১৪৯। It is in Murshidabad district, and is a very large and well-known pargana, আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ৩৭৬, পাদটীকা-৪।

১৫০। জোয়ানশাহী ও খালিয়াজুরী দু'টিপরগনাই জলাভূমিতে পরিপূর্ণ (ভারত বর্ষ -১৩৩৬ বঙ্গাব্দ-ভাদ্র-১৭শ বর্ষ- ১ম খন্ড - ৩য় সংখ্যা-পৃঃ ৩৭৮।

১৫১। মোগল আমল, পৃঃ ১২১-১২২ এবং বি,পি,পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ ৪৫।

১৫২। সুলতানী আমল, পৃঃ ৩৮০-৩৮১।

১৫৩। আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ৩৮১।

১৫৪। শাহবায খানের সংক্ষিপ্ত জীবনী জানার জন্য দেখুন মোগল আমল, পৃঃ ১৩৭-১৩৮।

১৫৫। H. Bengal, পৃঃ ১৯৫।

১৫৬। আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ৪৪৯, পাদটীকা-৩। বিহার ও বাংলায় মুঘল সেনানায়কদের বিদ্রোহের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন মোগল আমল, পৃঃ ১২৩-১৩৭।

১৫৭। মোগল আমল,পৃঃ ১৫৯।

১৫৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৫-১৩৭ এবং আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ৫৬৭।

১৫৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৭-১৩৮ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯৪।

১৬০। মাসুম খান কাবুলী ছিলেন বিদ্রোহী মুঘল সেনানায়ক। মুঘল বিদ্রোহীরা বাংলার সুবাহদার মুজফফর খান তুরবতীকে হত্যা করার পর বাংলায় বিদ্রোহী সরকার গঠন করে। বিদ্রোহীরা আকবরের ভাই এবং কাবুলের শাসনকর্তা মীর্যা হাকিমকে বাদশাহ্ নির্বাচিত করে এবং তাঁর নামে খুৎবা পাঠ শুরু করে। মাসুম খান কাবুলীকে মীর্যা হাকিমের উকিল বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়; তাঁর উপাধি হয় খান দৌরান। এই সময় বাংলায় বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন বাবা খান কাকশাল; তাঁর উপাধি ছিল খান-ই-খানান। বিদ্রোহীদের নেতা শরফ-আল-দীন হুসাইন এবং বাবা খান কাকশালের মৃত্যুর পর মাসুম খান কাবুলী বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরা দলত্যাগ করে পুনরায় মুঘল শিবিরে যোগদান করলেও মাসুম খান কাবুলী বিদ্রোহীই থেকে যান এবং ভাটি-প্রধান ঈসা খানের সাথে যোগদান করে আজীবন মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যান। এমনকি তিনি নিজেকে সুলতান রূপে ঘোষণা করে শিলা লিপি জারী করেন (মোগল আমল, পৃঃ ১৩৩-১৩৭)। ১০ই মে ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে মাসুম খান কাবুলী মৃত্যু বরণ করেন (আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ১১৩০)।

১৬১। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ৬১৯-৬২২ এবং মোগল আমল, পৃঃ ১৩৯-১৪০।

১৬২। মোগল আমল, পৃঃ ১৪২।

১৬৩। আকবর নামা৩য়, পৃঃ ৬৪৫।

১৬৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪৯-৬৫০।

১৬৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪৮-৬৫১ এবং ৬৫৮-৬৬০।

১৬৬। মোগল আমল, পৃঃ ১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

১৬৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪২।

১৬৮। বাহারীস্তান-ই-গায়বী (মির্জা নাথান)ঃ খালেকদাদ চৌধুরী কর্তৃক বাংলায় অনূদিত প্রথম খন্ড, বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৮, পৃঃ ৩০৭-৩০৮ (পরবর্তীতে বাহারীস্তান হিসেবে উল্লিখিত)।

১৬৯। মোগল আমল, পৃঃ ১২১।

১৭০। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ৬৪৫।

১৭১। নারায়ণগঞ্জের অদূরে নদীর একতীরে হাজিগঞ্জ দুর্গ, অন্যতীরে নবীগঞ্জ এবং সামান্য দূরে খিযিরপুর (মোগল আমল, পৃঃ ১৪২)।

১৭২। Medieval India - A Miscellany, Vol. I. 1969., পৃঃ ৬৭।

১৭৩। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ৬৬০ এবং মোগল আমল, পৃঃ ১৪২।

১৭৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭২ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৪।

১৭৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬০।

১৭৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭২ এবং মোগল আমল, পৃঃ ১৪৪।

১৭৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭২-৬৭৩ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৪-১৪৫।

১৭৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭২ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৪।

১৭৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭৩-৬৭৪ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৫।

১৮০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭৬ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৫।

১৮১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯৩-৬৯৪।

১৮২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯৩, পাদটীকা - ৫।

১৮৩। H. Bengal., পৃঃ ২০৪।

১৮৪। মোগল আমল, পৃঃ ১৪৬।

১৮৫। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ৬৯৪এবং মোগল আমল, পৃঃ ১৪৬।

১৮৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯৫-৬৯৬।

১৮৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯৬-৬৯৭।

১৮৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০১।

১৮৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭২১ এবং মোগল আমল, পৃঃ ১৪৮।

১৯০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭২১-৭২২।

১৯১। মোগল আমল, পৃঃ ১৬৮, টীকা - ৯৮।

১৯২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫০ এবং আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ৭৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ১০৩১।

১৯৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৯৯-১০০১ এবং H. Bengal., পৃঃ ২১১।

১৯৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪২-১০৪৩ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১১।

১৯৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০২৩ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১১। মুঘল বাহিনী কার নিকট থেকে ভূষণা দুর্গ দখল করে সে সম্পর্কে আবুল ফযল কিছুই উল্লেখ করেননি। আবদুল করিম বলেন যে, এসময় ভূষণার জমিদার ছিলেন মুকুন্দ রায় (মোগল আমল, পৃঃ ১৫২)। এক্ষেত্রে আবদুল করিম তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে কোন দলিল উপস্থাপন না করলেও তাঁর গ্রন্থের ৫১ পৃষ্ঠায় তিনি ভট্টশালীর বক্তব্যের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন যে, মুকুন্দ রায় ছিলেন ভূষণার জমিদার। নিম্নে ভট্টশালীর বক্তব্যটি উপস্থাপন করা হচ্ছে ঃ "In the beginning of the Mughal rule, Murad Khan was the Zagirdar of Fatehabad. He died about 1580 A.D. and his sons were one day assassinated by Mukundaram, Zamindar of Bhushna, lured by a false invitation. So Fatehabad was for some years in the possession of Mukundaram," (বি,পি,পি, ভল্যুম ৩৫, পৃঃ ৩৬)। ভট্টশালী এক্ষেত্রে মুকুন্দকে ভূষণার জমিদার হিসেবে উল্লেখ করলেও তিনি তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে কোন দলিল উপস্থাপন করেন নি। অন্যদিকে আকবরনামা পাঠে জানা যায় যে, ফতেহাবাদে মুরাদ খানের মৃত্যুর পর মুকুন্দ নামক একজন স্থানীয় জমিদার (Mukund, the landholder of that part of the country) মুরাদ খানের পুত্রদেরকে নিমন্ত্রণ দিয়ে এনে হত্যা করে এবং তাঁর জমিদারী দখল করে নেয় (আকবরনামা ৩য়,পৃঃ ৪৬৯)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আবুল ফযল এখানে মুকুন্দকে ভূষণার জমিদার হিসেবে উল্লেখ করেন নি। তিনি মুকুন্দকে ফতেহাবাদের স্থানীয় জমিদার হিসেবে উল্লেখ করেন এবং তাঁর বক্তব্যে ভূষণার উল্লেখ পাওয়া যায় না। ব্লখমান এক স্থানে উল্লেখ করেন যে, "When Akbar's army,in 1574,under Munim Khan Khanan invaded Bengal and Orisa, Murad Khan .... was despatched to South -Eastern Bengal. He conquered... Sirkars Bakla and Fathabad, and settled there ; but after ...... he came into collision with Mukund, the powerful Hindu zamindar of Fathabad and

Dhaka University Institutional Repository

Bosnah, ... invited him to a feast and murdered him together with his sons". (J.A.S.B. 1873, No.3. পৃঃ ২২৮-২২৯)। এখানে দেখা যায় যে, ব্লখমান মুকুন্দকে ফতেহাবাদ ও ভূষণার জমিদার হিসেবে উল্লেখ করেন। কিন্তু ব্লখমানের অনূদিত আইন-ই-আকবরী প্রথম খন্ডে দেখা যায় যে, "After his death, Mukund, the principal zamindar of Fathabad, invited Murad's sons to a feast, and treacherously murdered them." (তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭, পৃঃ ৪০৫)। এখানে মুকুন্দকে শুধু ফতেহাবাদের জমিদার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, ভূষণার নয়।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, আবদুল করিম ও ভট্টশালী মুকুন্দকে ভূষণার জমিদার হিসেবে উল্লেখ করলেও আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরী-তে তাঁকে ফতেহাবাদের জমিদার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আব্দুল করিম ও ভট্টশালীর বক্তব্য আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরী দ্বারা শুধু অসমর্থিতই হয়নি বরং আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরী-তে এ প্রসংগে ভূষণার নামই উল্লিখিত হয়নি। তবে ব্লখমানের বক্তব্যের সাথে তাঁদের বক্তব্যের মিল রয়েছে। কিন্তু ব্লখমান কর্তৃক অনূদিত আইন-ই-আকবরী-এর সাথে তাঁর বক্তব্যের মিল না থাকায় ব্লখমানের মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। যাহোক, হিম্মত সিংহ কর্তৃক ভূষণা দুর্গ দখল করার সময় মুকুন্দরায় ভূষণার জমিদার ছিলেন- আবদুল করিমের এ বক্তব্য সন্দেহাতীতভাবে মেনে নেয়া যায় না। কেননা একদিকে তাঁর বক্তব্য একমাত্র সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থ আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরী দ্বারা সমর্থিত না হওয়ায় এবং আলোচ্য ঘটনার পর আকবরনামায় কয়েকবার ভূষণা দুর্গের উল্লেখ থাকলেও মুকুন্দ রায়ের নাম পুনরুল্লিখিত না হওয়ায় এবং অন্যদিকে ভট্টশালী নিজেই অন্যত্র মত প্রকাশ করেন যে, হিম্মত সিংহের ভূষণা দুর্গ দখলের সময় এ দুর্গের মালিক ছিলেন কেদার রায় (ভারতবর্ষ-ফাল্গুন-১৩৩৯ বঙ্গাব্দ-২০শ বর্ষ-২য় খন্ড- ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ৩৫৯)। ভট্টশালীর সাথে এ ক্ষেত্রে একমত হওয়া যুক্তিযুক্ত। কেননা আকবরনামা পাঠে জানা যায় যে, উড়িষ্যার কতলু নুহানীর মন্ত্রী ও

Dhaka University Institutional Repository

ভ্রাতা খাজা ঈসার পুত্র খাজা সুলায়মান ও খাজা উসমান উড়িষ্যা থেকে বিতাড়িত হয়ে প্রথমে সাতগাঁওয়ে আসেন এবং পরে সেখান থেকে চাঁদ রায়ের জমিদারী ভূষণার দিকে অগ্রসর হন। চাঁদরায় তাঁর পিতা কেদার রায়ের পরামর্শে তাঁদেরকে নিমন্ত্রণ করে কৌশলে বন্দী করার চেষ্টা করলে আফগানরা চাঁদ রায়কে হত্যা করে ভূষণা দুর্গ দখল করে নেয়। শেষ পর্যন্ত ঈসা খানের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্থাপিত হয় এবং কেদার রায়কে দুর্গটি প্রত্যর্পণ করা হয় (আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ৯৬৮-৯৬৯)। তখন থেকে ভূষণা দুর্গ কেদার রায়ের অধিকারেই ছিল এবং সংগত কারণেই ধরে নেয়া যায় যে, হিম্মত সিংহ কেদার রায়ের নিকট থেকেই এ দুর্গ দখল করেন।

যাহোক উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের পর ঈসা খান খাজা সুলায়মানকে কেদার রায়ের সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং খাজা উসমানকে নিজ রাজ্যাংশ বুকাইনগরের জমিদারী প্রদান করেন (<u>The Afghans</u>, পৃঃ ২২৭-২২৮ এবং বি,বি, পি, ভল্যুম ৩৫, পৃঃ ৩৩-৩৪)। কিন্তু আবদুল করিম খাজা উসমান কর্তৃক চাঁদ রায়ের নিহত হওয়ার ঘটনা এবং খাজা উসমানকে বুকাই নগরের জমিদার হিসেবে মেনে নিলেও তিনি ১৫৯৩-৯৪ খ্রীস্টাব্দের দিকে ভূষণায় চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের অস্তিত্ব এবং ঈসা খান কর্তৃক খাজা উসমানকে বুকাই নগরের জমিদারী প্রদানের ঘটনা স্বীকার করেন না। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে এই যে, "আকবরের সময় ভূষণার জমিদার ছিলেন মুকুন্দ রায় এবং পরে মুকুন্দ রায়ের পুত্র শত্রুজিত যিনি জাহাংগীরের সময়ে মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। ... চাঁদ রায় বা কেদার রায় দুই ভাই ছিলেন শ্রীপুর বা বর্তমান মুন্সীগঞ্জের জমিদার। ইংরেজ পরিব্রাজক রালফ্ ফিচ শ্রীপুরে চাঁদ রায়কে দেখেন, ... কিন্তু ঈসা খান নিজের জমিদারী বুকাই নগর খাজা উসমানকে দেবেন, এই কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ... বুকাইনগর আদৌ ঈসা খানের জমিদারীর অন্তর্ভূক্ত ছিল কিনা সন্দেহ। ...খাজা উসমান এবং তাঁর সংগী আফগানরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে বাহুবলে বুকাই নগর দখল করেন। ... হতে পারে যে শ্রীপুরের চাঁদ

Dhaka University Institutional Repository

রায়কে তাঁরা হত্যা করেন, বুকাইনগর হয়তঃ চাঁদ রায়ের জমিদারীর অংশ হতে পারে, জমিদারী যে সংলগ্ন এবং লাগোয়া ছিল এমন মনে করার কারণ নাই, জমিদারী বিচ্ছিন্ন এলাকায়ও থাকতে পারে। তাঁদের সংগে খাজা উসমান এবং অন্যান্য আফগানদের মনোমালিন্যের পরে হয়তঃ খাজা উসমান এবং তাঁর সংগীরা বুকাইনগর দখল করেন। খাজা উসমানের হাতে চাঁদ রায়ের নিহত হওয়ার কথা সত্যও হতে পারে''। (মোঘল আমল, পৃঃ ৭৬-৭৮)।

আবদুল করিমের উপরোক্ত বক্তব্যের সাথে একমত হওয়া যায়না। প্রথমতঃ চাঁদ রায় বা কেদার রায় শ্রীপুরের জমিদার ছিলেন এবং রালফ্ ফিচের সাথে চাঁদ রায়ের দেখা হওয়ার ব্যপারে কোন দ্বিমত নেই। তবে রালফ্ ফিচকে চাঁদ রায় বা কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুরে দেখা যায় ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে (মোগল আমল, পৃঃ ৮৫)। সুতরাং এসময়েই রালফ্ ফিচের সাথে চাঁদ রায়ের দেখা হওয়ার কথা। কিন্তু ভূষণায় চাঁদ রায় ও কেদার রায়কে দেখা যায় ১৫৯৩ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। তাই ধরে নেয়া যায় যে, এই মধ্যবর্তী সময়ে হয়তো চাঁদ রায় ও কেদার রায় ভূষণা দুর্গ দখল করে নিয়েছিলেন। শুধু ১৫৯৩ খ্রীস্টাব্দেই নয়, বরং ১৫৯৫ এবং ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসেও ভূষণায় কেদার রায়ের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জুন মানসিংহের পুত্র দূর্জন সিংহ কেদার রায় ও খাজা সুলায়মানকে পরাস্ত করেই ভূষণা দুর্গ দখল করেছিলেন। এ যুদ্ধে সুলায়মান মৃত্যুবরণ করেন এবং কেদার রায় আহত হয়ে ঈসা খানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন (আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ১০৫৯)। আবদুল করিম এই ঘটনার কথা কোথাও উল্লেখ করেননি। শুধু তাই নয়, তিনি খাজা উসমানের কথা বারংবার উল্লেখ করলেও তাঁর ভ্রাতা খাজা সুলায়মানের শেষ পরিণতি কি হয়েছিল সে সম্পর্কে তিনি কোন আলোকপাতই করেননি। অথচ দু'ভাই এক সাথেই বাংলায় এসেছিলেন। যাহোক, ১৫৯৩-৯৪ খ্রীস্টাব্দে ভূষণায় চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে গেলে একই সাথে ১৫৯৫ ও

Dhaka University Institutional Repository

১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দে ভূষণায় কেদার রায়ের উপস্থিতি ও খাজা উসমানের ভ্রাতা খাজা সুলায়মানের মৃত্যুর ঘটনাও অস্বীকার করতে হবে। কিন্তু এত গুলো ঘটনা আবদুল করিম কোন যুক্তিতে অস্বীকার করবেন, তা বোধগম্য হয়না। অতএব, সঠিক বক্তব্য হচ্ছে এই যে, ভূষণার জমিদর যে কেউই হন না কেন অন্ততঃ ১৫৯৩, ১৫৯৫ এবং১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত ভূষণায় কেদার রায়ের অস্তিত্ব কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যাবেনা এবং উক্ত সময়ে মুকুন্দ রায় ভূষণার জমিদার ছিলেন- অন্ততঃ আকবর নামায় এধরণের কোন ইংগিত পাওয়া যায়না। দ্বিতীয়তঃ আবদুল করিম বলেন যে, বুকাই নগর হয়তঃ চাঁদ রায়ের জমিদারীর অংশ হতে পারে এবং খাজা উসমান চাঁদ রায়কে হত্যা করে এই জমিদারী দখল করেন। উসমান কর্তৃক চাঁদ রায়ের হত্যার ঘটনা সম্পর্কে দ্বিমত নেই । কিন্তু বুকাইনগরকে চাঁদ রায়ের জমিদারীর অংশ হিসেবে মেনে নেয়া যায়না। কেননা বুকাইনগর যেতে হলে ঈসা খানের জমিদারীর উপর দিয়েই যেতে হবে এবং বুকাইনগর ঈসা খানের রাজ্যাংশ মোমিন শাহী পরগনায় অবস্থিত। তাই বুকাইনগর চাঁদ রায় অপেক্ষা ঈসা খানের জমিদারীর অংশ বিশেষ হওয়াই অধিকতর যুক্তি সংগত এবং ঈসা খানের সাহায্য ব্যতিরেকে বুকাই নগর দখল করা কিংবা বুকাই নগরে জমিদারী প্রতিষ্ঠা করা উসমানের পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব নয় সুতরাং বুকাইনগর ঈসা খানের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত থাকুক বা না-ই থাকুক ইহা বলা অযৌক্তিক হবেনা যে, ঈসা খানের সাহায্যেই উসমান বুকাইনগরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৭। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ১০৪৩ এবং H. Bengal., পৃঃ ২১১।

১৯৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৬৮-৯৬৯ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১০।

১৯৯। The Afghans, পৃঃ ২২৭-২২৮। এরপর থেকে খাজা সুলায়মানকে কেদার রায়ের সাথে অবস্থান করতে দেখা যায় এবং ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জুন ভূষণা দুর্গের যুদ্ধে কেদার রায়ের সাথে তিনি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মানসিংহের পুত্র দূর্জন সিংহের বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন।

২০০। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ১০৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

২০১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪৩। বেভেরীজ শের পুরকে ময়মনসিংহের শেরপুরের সাথে অভিন্নমনে করলেও আবদুল করিমের মতে ইহা বগুড়ার শেরপুর মুর্চা। তিনি আরো মত প্রকাশ করেন যে, মানসিংহ সেলিম নগর নামে কোন দুর্গ নির্মাণ করেন নি, এই নামে একটি দুর্গ সেখানে পূর্বে থেকেই ছিল, মানসিংহ হয়তঃ এই দুর্গটি সংস্কার করেছিলেন (মোগল আমল, পৃঃ ১৫৩)।

২০২। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ১০৫৯ এবং H. Bengal., পৃঃ ২১১।

২০৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬৩ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১১-২১২।

২০৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬৭- ১০৬৮।

২০৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৯। আবুল ফযল নরনারায়ণকে মালগোসাইন (Rajah Mal Gosain) নামে উল্লেখ করেন।

২০৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭০, ৬২২ এবং ৬২৫।

২০৭। যদুনাথ সরকার ও আবদুল করিম এই স্থানকে গোবিন্দপুর হিসেবে উল্লেখ করেন (H. Bengal., পৃঃ ২১২ এবং মোগল আমল, পৃঃ ১৫৪।।

২০৮। আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ১০৬৮ এবং H. Bengal., পৃঃ ২১২।

২০৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৮১-১০৮২।

২১০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯৩।

২১১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯৩-১০৯৪ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১২।

২১২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯৪।

২১৩। H. Bengal., পৃঃ ২১২।

২১৪। ১৫৯৭ খ্রীস্টাব্দের শেষদিকে বা ১৫৯৮ খ্রীস্টাব্দের প্রথমদিকে মানসিংহ বাংলা ছেড়ে যাওয়ার মনস্থ করেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হয় এবং তাঁর ছেলে জগৎ সিংহকে তাঁর অনুপস্থিতিতে বাংলার শাসনভার নেয়ার জন্য বাদশাহ্ আকবর আদেশ দেন (মোগল আমল, পৃঃ ১৫৫)।

২১৫। মানসিংহের ছেলে হিম্মত সিংহ ১৫৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই মার্চ বাংলায় কলেরায় মৃত্যুবরণ করে এবং দূর্জন সিংহ ঈসা খানের সাথে যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করে (আকবরনামা ৩য়, ১০৯৩ এবং H. Bengal., পৃঃ ২১২)।

২১৬। এই সময় ঈসা খানের বয়স ৬৭/৬৮ বছর হওয়ার কথা।

Dhaka University Institutional Repository

২১৭। আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ১১৪০। সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুরের মতে ঈসা খান কতরাব-তে মৃত্যু বরণ করেন (Glimpses of old Dhaka, Second edition,1956, পৃঃ৭১)।

২১৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯৭।

২১৯। মোগল আমল, পৃঃ ১৯৮।

২২০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৮।

২২১। আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ৬৬০ এবং ৬৭২।

২২২। The Afghans ,পৃঃ ১৬২।

২২৩। আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ৫৯৪।

২২৪। যদুনাথ সরকারঃ "বাঙ্গলার স্বাধীন জমিদারদের পতন", প্রবাসী-ভাদ্র, ১৩২৯, ২২শ ভাগ, ১ম খন্ড, ৫ম সংখ্যা, পৃঃ৬৩৭।

২২৫। আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ৪৩১।

২২৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৬-২৭ এবং ৬৫৮।

২২৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫৮।

২২৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫৯-৬৬০।

২২৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৯৫।

২৩০। Cultural Hist. Vol.1, পৃঃ ৩৬৭-৩৬৮।

২৩১। আকবরনামা ৩য়, পৃঃ ১১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায় ঃ

ঈসা খান মসনদ - ই- আলা ঃ কৃতিত্ব বিচার

বাংলায় কাররানী আফগান শাসনের প্রতিষ্ঠাতা তাজ খান কাররানীর নিকট থেকে ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে সোনারগাঁও ও মহেশ্বরদী পরগনার ইকতা লাভের মাধ্যমে কাররানী আফগানদের অধীনস্থ একজন সামন্ত হিসেবে ঈসা খান তাঁর উল্লেখযোগ্য কর্মজীবন শুরু করেন। ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে কাররানী বংশের সর্বশেষ সুলতান দায়ূদ খান কাররানীর পরাজয় ও মৃত্যুর পর থেকে ঈসা খান ভাটি অঞ্চলে একজন স্বাধীন নৃপতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং আমৃত্যু স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত থেকে ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনভাবেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ঈসা খানের দীর্ঘ ৩৫ বছরের এই কর্মজীবনকে দু'টি সুস্পষ্ট অধ্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম অধ্যায় হচ্ছে ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কাররানী আফগানদের একজন অধীনস্থ সামন্ত হিসেবে ঈসা খানের কর্মজীবন এবং দ্বিতীয় অধ্যায় হচ্ছে ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় মুঘল-বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রধান সংগঠক ও অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে ঈসা খানের কর্মজীবন।

ঈসা খান ছিলেন একজন ক্ষণ-জন্মাপুরুষ। ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে তাজ খানের নিকট থেকে সোনারগাঁও ও মহেশ্বরদী পরগনার ইকতা লাভের পর থেকে তিনি স্বীয় প্রতিভা, কর্মদক্ষতা, যোগ্যতা এবং কাররানী শাসকদের প্রতি অবিচল আনুগত্যের দ্বারা তাঁদের আনুকূল্য লাভের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে তাঁর ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে থাকেন। ইকতা লাভের ৭ বছরের মধ্যে তথা সুলায়মান কাররানীর শাসনামলে ১৫৭১ খ্রীস্টাব্দের দিকে তিনি এতই প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেন যে, এ সময় আবুল ফযল তাঁকে ভাটি অঞ্চলের শাসক হিসেবে উল্লেখ করেন। সুলায়মান কাররানীর দ্বিতীয় পুত্র দায়ূদ খান কাররানীর শাসনামলে ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দের দিকে অর্থাৎ ইকতা লাভের ৯ বছরের মধ্যে তিনি এতদূর ক্ষমতা

Dhaka University Institutional Repository

অর্জনে সক্ষম হন যে, বাংলার ভূঁঞা- জমিদারদের মধ্যে তিনি একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে নেন এবং ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রাম অভিযানে ত্রিপুরার রাজা উদয় মাণিক্যের বিরুদ্ধে বাংলার সুলতান দায়ুদ খান কারারানীকে সাহায্য করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর দু'বছর পর ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে ঈসা খান তাঁর ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন এবং দায়ূদ খান কারারানীর চরমশত্রু ও বাংলা আক্রমণকারী মুঘল বাদশাহ্ আকবরের নৌ-বহর কে বাংলার পানি-সীমা থেকে বিতাড়িত করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। এক কথায় বলা যায় সোনারগাঁও ও মহেশ্বরদী পরগনার ইকতা লাভের পর থেকে ক্ষমতা ও মর্যাদার উচ্চ সিঁড়ি অতিক্রমে ঈসা খানকে আর কখনও পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। কারারানী আফগান শাসনামলে তাঁর সর্বশেষ বড় অর্জন হচ্ছে দায়ূদ খান কারারানীর নিকট থেকে 'মসনদ - ই -আলা' উপাধি লাভ (এ বিষয়ে পরিশিষ্টঃ ১-এ আলোচনা করা হয়েছে)। দায়ূদ খান কারারানীর মতো একজন স্বাধীন-সার্বভৌম এবং প্রতাপান্বিত সুলতানের নিকট থেকে এ ধরনের উপাধি লাভ নিসন্দেহে ঈসা খানের অসাধারণ প্রতিভা, কর্মদক্ষতা, যোগ্যতা এবং উচ্চ মর্যাদারই স্বাক্ষর বহন করে।

ঈসা খানের কর্মজীবনের প্রথম অধ্যায়ের ঘটনাবলীর তুলনায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের ঘটনাবলী ছিল অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ ও ঝঞ্ঝা বহুল। তাই সঙ্গত কারণেই একজন রাজনৈতিক -ইতিহাসের ছাত্রের নিকট তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় হয়ে উঠেছে সবচেয়ে কৌতুহল উদ্দীপক। এ অধ্যায়েই ঈসা খান তাঁর সীমিত শক্তি দ্বারা প্রবল পরাক্রান্ত মুঘল বাদশাহের বিরুদ্ধে একের পর এক যুদ্ধ করে বাংলায় মুঘল অগ্রগতি রোধ করে নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে এবং একটি উল্লেখযোগ্য ভূ-খন্ডে স্বীয় কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে বজায়রেখে বিস্ময়ের জন্মদেন। ঈসা খানের জীবনের এ অধ্যায়ের সূচনা ঘটেছিল মুঘলদের নিকট রাজমহলের যুদ্ধে তাঁর পৃষ্ঠপোষক পরিবারের পতনের মধ্য দিয়ে। ফলশ্রুতিতে ঈসা খান এক নতুন রাজনৈতিক পরিবেশ ও সংকটময় পরিস্থিতির সন্মুখীন হন। পৃষ্ঠপোষক পরিবারের পতনের ফলে ঈসা খান সাময়িকভাবে হতবাক হয়ে পড়লেও যেহেতু তিনি ছিলেন অসীম সাহসিকতা, অদম্য মনোবল এবং স্বাধীনচেতা মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তি সেহেতু তিনি কালবিলম্ব না করে পরবর্তী

কর্তব্যকর্ম স্থির করে নেন। তিনি মুঘল আধিপত্য মেনে নেয়ার পরিবর্তে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম অব্যাহত রাখার দৃঢ় শপথ নেন। যেহেতু ঈসা খান ছিলেন একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী রাজনীতিক সেহেতু তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী মুঘল বাদশাহ্ আকবরের বিরুদ্ধে তুলনামূলক ভাবে সীমিত শক্তি নিয়ে তাঁর একার পক্ষে দীর্ঘদিন লড়াই চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে,এই আত্ম উপলব্ধি থেকেই তিনি তাঁর লক্ষ্য অর্জনে সফলতা লাভের আশায় প্রতিবেশী ভূঁঞা-জমিদার এবং অন্যান্য আফগান প্রধানদের সাথে সু-সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তাঁদেরকে মুঘল বিরোধী সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তাঁদের সমন্বয়ে একটি মুঘল বিরোধী রাজনৈতিক-সামরিক জোট সংগঠনের নিমিত্তে সচেষ্ট হন। বলা বাহুল্য ঈসা খান এই কর্ম সম্পাদনে সম্পূর্ণরূপে সফল হন এবং তাঁর ইকতা সোনারগাঁও ও মহেশ্বরদী অঞ্চল থেকে তাঁরই যোগ্য ও বিচক্ষণ নেতৃত্বে ভূঁঞা-জমিদার ও অন্যান্য আফগান প্রধানগণ বাংলায় মুঘল প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফলশ্রুতিতে বাদশাহ্ আকবরের জীবদ্দশায় সমগ্র বাংলায় মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। যাহোক, এদিক থেকে বিচার করলে ঈসা খানকে একজন সফল রাজনৈতিক- সামরিক সংগঠক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। শুধু তাই নয়, ঈসা খান মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রেও অসামান্য দক্ষতা ও সমরনীতি জ্ঞানের পরিচয় দেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ঈসা খান মুঘলদের শক্তি ও সামর্থ্যের তুলনায় স্বীয় সামর্থ্য ও শক্তির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সদাসচেতন ছিলেন। তাই সীমিত শক্তি নিয়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফলতা লাভের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে অভিনব যুদ্ধ কৌশল উদ্ভাবন ও অবলম্বনে এবং তাঁর সামরিক শক্তির প্রধান ভিত্তি ও প্রধান যুদ্ধোপকরণ নৌ-বহরের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করণে সচেষ্ট ছিলেন। ঈসা খানের একটি উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ কৌশল ছিল এই যে, তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে স্থল যুদ্ধ এড়িয়ে চলতেন এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রের জন্য চতুর্দিকে নদ-নদী ও পানিবেষ্টিত এমনসব কৌশলগত স্থান বেছে নিতেন যেসব স্থান থেকে তিনি তাঁর সামরিক শক্তির প্রধান ভিত্তি নৌ-বহরের জন্য বাড়তি সুবিধা পেতেন এবং প্রয়োজন বোধে নিরাপদে সে স্থান থেকে সরে পড়তেন। পক্ষান্তরে মুঘলদের সামরিক শক্তির

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান ভিত্তি অশ্বারোহী বাহিনী সেখানে কোন কাজেই আসতোনা এবং তারা নৌ-যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হতো। ফলশ্রুতিতে নৌচালনা ও নৌ-যুদ্ধে তুলনামূলক ভাবে অনভিজ্ঞ উত্তর ভারত থেকে আগত মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করা ঈসা খানের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সহজতর হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে সুবাহ্দার খান-ই-জাহান, ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে শাহ্বায খান এবং ১৫৯৭ খ্রীস্টাব্দে রাজা মানসিংহের পুত্র দুর্জন সিংহের বিরুদ্ধে ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদের নৌ-যুদ্ধে জয়লাভের কথা স্মরণযোগ্য। এতদভিন্ন, ঈসা খান ছিলেন একজন বিচক্ষণ ও কূটকৌশলী-ব্যক্তি। তিনি মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধে কখনও পশ্চাদপসরণ ও কালক্ষেপণ কৌশল অবলম্বন, কখনও মুঘলদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ, আবার কখনও মুঘল সুবাহ্দার ও সেনানায়কদেরকে মূল্যবান উপহার প্রদান এবং মুঘল বাদশাহের প্রতি অনুগত থাকার ভান করতেন। এক কথায় বলা যায় যে কোন সময় ও অবস্থাতেই তিনি ছিলেন পরিবেশ - পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রক। অধিকন্তু প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্য ও কুচবিহার রাজ্যের পূর্বাংশের রাজা রঘুদেবের সাথে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপনও তাঁর শ্রেষ্ঠ কূটনীতিজ্ঞতার স্বাক্ষর বহন করে। সর্বোপরি মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধের সাথে সাথে ঈসা খান ঢাকা জেলার একটি উল্লেখযোগ্য অংশে, প্রায় সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা ও ত্রিপুরা জেলার কিছু অংশে স্বীয় কর্তৃত্ব দৃঢ় ভাবে বজায় রেখেও তিনি অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। যাহোক, উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ঈসা খান সমসাময়িক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে নিসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম রাজনীতিজ্ঞ, সামরিক-সংগঠক, সমর বিশারদ এবং কূটকৌশলী ব্যক্তি ছিলেন বলেই সীমিত শক্তি নিয়েও তাঁর পক্ষে প্রবল পরাক্রমশালী মুঘল বাদশাহের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের মুখেও প্রায় কোয়ার্টার শতাব্দী ব্যাপী স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হন। ফলশ্রুতিতে বাদশাহ্ আকবর তাঁর জীবদ্দশায় ভাটি অঞ্চলে তথা পূর্ব-বাংলায় মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি এবং ঈসা খানও ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে চির উন্নতশির নিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম মর্যাদা নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরিশেষে বলা যায় যে, ঈসা খান ছিলেন ষষ্ঠদশ শতকের শেষ চতুর্থাংশের দিল্লী কেন্দ্রিক সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম তথা স্বাধীনতা সংরক্ষণ সংগ্রামের অপরাজিত নেতা, বাংলার রাজনীতির কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব এবং বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাসের প্রধান নায়ক, যিনি তাঁর অমরকীর্তির জন্য বাংলার জনগণের হৃদয়ে স্থায়ী আসন দখল করে রয়েছেন এবং আজীবন সংগ্রামী ঈসা খান মসনদ-ই-আলা ষোড়শ শতাব্দীর এক ক্রান্তিকালে বাংলার আঞ্চলিক স্বাধীনতা সংরক্ষণের যে আপোসহীন ও গৌরবদীপ্ত সংগ্রামী ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন, তাঁর স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীর হিসেবে আখ্যায়িত করা মোটেই কোন অত্যুক্তি বা অতিরঞ্জন নয়।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ঃ ১

ঈসা খানের ''মসনদ-ই-আলা'' উপাধি

ইহা সর্বজন বিদিত যে, ভাটি-প্রধান ঈসা খানের উপাধি ছিল মসনদ -ই-আলা। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ঈসা খানের বংশধরদের আবাসস্থল ঢাকার নিকটবর্তী দিওয়ানবাগ গ্রামে সাতটি কামান আবিষ্কৃত হয়। এর উপর ভিত্তি করে H.E. Stapleton, J.A.S.B -তে "Note on Seven Sixteenth Century Cannon recently discovered in the Dacca District." এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রাপ্ত সাতটি কামানের মধ্যে একটিতে তিন-ছত্রে ঈসা খানের নাম, উপাধি এবং সন-তারিখ খোদিত রয়েছে[১]। কামানটি এখন ঢাকাস্থ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। কামানে খোদিত লিপির প্রথম ছত্র ও তৃতীয় ছত্রের পাঠ নিয়ে কোনরূপ মত পার্থক্য না থাকলেও দ্বিতীয় ছত্রের পাঠ নিয়ে পন্ডিতগণের মধ্যে মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কামানে খোদিত লিপির প্রথম ও তৃতীয় ছত্রের পাঠ যথাক্রমে "সরকার শ্রীযুত ইছা খা" এবং "১০০২ হিজরী সন''-এ মর্মে সকলেই এক মত । কিন্তু দ্বিতীয় ছত্রের পাঠ সম্পর্কে প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। এইচ, ই, ষ্ট্যাপল্টনের মতে দ্বিতীয় ছত্রের পাঠ হচ্ছে-"? (বমসনদী ফি) সন হীজাব''[২], সৈয়দ আওলাদ হাসানের মতে, "শমসনন্দাল্বি সন হীজাব''[৩], সৈয়দ মুহম্মদ তৈফুরের মতে, "...মসনদাল্লি ফি সন হীজার"[৪]," শামসুদ্দিন আহমদের মতে, "? (বমসনদী ফি) সন হাজার''[৫] এবং ভট্টশালী ও আবদুল করিমের মতে, "ন মসনদাল্বি সন হিজরী''[৬]। যাহোক, উক্ত পন্ডিতগণের মধ্যে উক্ত কামানের লিপির দ্বিতীয় ছত্রের সঠিক পাঠ নিয়ে মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, কামানটি ভাটি-প্রধান ঈসা খানের, কামানটি নির্মাণের সন ১০০২ হিজরী এবং ঈসা খানের উপাধি ছিল "মসনদ-ই-আলী'' কিংবা "মসনদ-ই-আলা"।

মসনদ-ই-আলী এবং মসনদ-ই-আলা সমার্থক শব্দ এবং ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ইহা ছিল আফগানদের মধ্যে একটি জনপ্রিয় উপাধি। দিল্লী কেন্দ্রিক

আফগান সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা বাহ্‌লুল লোদীর উপাধি ছিল "মসনদ-ই-আলা"[৭] এবং তিনি অন্যান্য আফগান প্রধানগণকে "মসনদ-ই-আলী"[৮] বলে সম্বোধন করতেন। সুলতান বাহ্‌লুলের উপদেষ্টা ও অমাত্য ওমর খান সরওয়ানীর এক উপাধি ছিল "মসনদ আলী" এবং তাঁর পুত্র ঈসা খানের উপাধিও ছিল মসনদ আলী[৯]। এতদভিন্ন, শের শাহের উপাধি ছিল "হযরত-ই-আলা"[১০]। বাংলায় কারারানী আফগান শাসনের প্রতিষ্ঠাতা তাজ খান কারারানীর উপাধি ছিল "মসনদ-ই-আলী" এবং সুলায়মান খান কারারানীর উপাধি ছিল "হযরত-ই-আলী"[১১]। আরো অনেক আফগান প্রধান ও অভিজাতগণকে উক্ত উপাধি গ্রহণ করতে দেখা যায়, এক কথায় বলা যায় যে, মসনদ-ই-আলী বা মসনদ-ই-আলা আফগান প্রধান, অভিজাত, অমাত্য ও সুলতানদের নিকট একটি জনপ্রিয় উপাধি ছিল। এমনকি বাহারীস্তান - ই- গায়বী পাঠে জানা যায় যে, ঈসা খানের পুত্র মুসা খানের উপাধিও ছিল মসনদ-ই-আলা[১২]। যাহোক, উপরোক্ত কামানটি নির্মিত হয় ১০০২ হিজরী সন বা ১৫৯৩ - ৯৪ খ্রীস্টাব্দে। এ অনুযায়ী বলা যায় যে, ১৫৯৩ -৯৪ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে কোন এক সময় ঈসা খান এই মসনদ-ই-আলা উপাধি প্রাপ্ত হন কিংবা গ্রহণ করেন। ঈসা খানের মসনদ-ই-আলা উপাধি প্রাপ্তি কিংবা গ্রহণ করা সম্পর্কে পন্ডিতগণকে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রদান করতে দেখা যায়। এখন বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর আলোকে ঈসা খানের মসনদ-ই-আলা উপাধি প্রাপ্তি কিংবা গ্রহণ করা সম্পর্কে যথা সম্ভব যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে নিম্নে প্রথমেই জেম্‌স্ ওয়াইজ কর্তৃক সংগৃহীত বিবরণ উপস্থাপন করা গেলঃ

"When Man Singh invaded Bengal about 1595, he advanced to Igarah-Sindhu and besieged the garrison of the fort. Isa Khan hastened to its relief, but his troops were disaffected and refused to fight. He, however, challenged Man Singh to single combat, stipulating that the survivor should receive peaceable possession of Bengal. Man Singh accepted the challenge and its conditions, ...In the first encounter Man Singh lost his sword. Isa Khan offered his , but without accepting it Man Singh dismounted. His adversary did the same, and dared him to have a wrestling bout. Instead of acceding to his wish, Man Singh, struck by the generosity and chivalry of

Dhaka University Institutional Repository

the man, embraced him and claimed him as a friend. After entertaining Isa Khan, he loaded him with presents on his taking leave.

The behaviour of the Hindu prince excited the disapprobation of many of his followers, and the Rani was so indignant at his pusillanimous conduct, that she vowed she would never return to court, where he would be put to death and she be made a widow.

This domestic quarrel, however, was quelled by Isa Khan, who volunteered to return with Man Singh to Agrah and trust to the magnanimity of the emperor for pardon.

On their arrival at Agrah, Isa Khan was thrown into prison, but when the story of the combat at Igarah-Sindhu was told, the emperor ordered his immediate release, conferred on him the titles of Diwan and Masnad-i-Ali, and gave him a grant of numerous parganahs in Bengal."[১৩]

জেম্‌স্‌ ওয়াইজের সংগৃহীত উপরোক্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, "মানসিংহ ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে বাংলা আক্রমণ করে এগার সিন্দুরের দুর্গ অবরোধ করেন। ঈসা খান দুর্গ মুক্ত করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁর সৈন্যরা যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে তিনি মানসিংহকে একক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের আহ্বান জানান, শর্ত থাকে যে, যিনি যুদ্ধে টিকে থাকবেন তিনিই বাংলার অধিকার প্রাপ্ত হবেন। মানসিংহ এতে সম্মত হন। লড়াইয়ের প্রথমেই মানসিংহ তাঁর তরবারী হারান । এ অবস্থায় ঈসা খান মানসিংহকে নিজের তরবারী প্রদানের প্রস্তাব দেন। কিন্তু মানসিংহ তা গ্রহণ না করে অশ্ব থেকে অবতরণ করলে ঈসা খানও তাঁর অশ্ব থেকে অবতরণ করেন এবং মানসিংহকে কুস্তী লড়ার আহ্বান জানান। এ অবস্থায় মানসিংহ ঈসা খানের বদান্যতা এবং বীরত্ব ও বিনয়ে অভিভূত হয়ে লড়াইয়ের পরিবর্তে ঈসা খানকে বন্ধু হিসেবে সম্বোধন করে তাঁর সাথে আলিংগন করেন। আপ্যায়নের পর বিদায়ের মুহূর্তে মানসিংহ ঈসা খানকে প্রচুর

Dhaka University Institutional Repository

উপহার প্রদান করেন। মানসিংহের এরূপ আচরণে তাঁর অনেক অনুসারীই ক্ষুব্ধ হয়। এমনকি তাঁর এই কাপুরুষোচিত আচরণে রানী এতটাই ক্ষুব্ধ হন যে, তিনি কখনও বাদশাহের দরবারে ফিরে না যাওয়ার শপথ করেন। কেননা বাদশাহ্ নিশ্চয়ই মানসিংহকে হত্যার আদেশ দিবেন এবং রানী বিধবা হবেন। যাহোক, এ অভ্যন্তরীণ কলহ ঈসা খান কর্তৃক প্রশমিত হয় এবং ঈসা খান স্বেচ্ছায় মানসিংহের সাথে আগ্রায় যেতে রাজী হন। আগ্রায় পৌঁছার পর ঈসা খানকে বন্দী করা হয়। কিন্তু যখন বাদশাহের নিকট এগার সিন্দুরের লড়াইয়ের ঘটনা বলা হয় তখন তিনি ঈসা খানকে তাৎক্ষণিক মুক্তির নির্দেশ দেন এবং দিওয়ান ও মসনদ-ই-আলী উপাধি এবং বাংলায় অনেকগুলো পরগনা দান করেন।"

প্রাচীন পূর্ব বঙ্গ গীতিকা সপ্তম খন্ডে দেওয়ান ইশা খাঁর পালা - এ ঈসা খানের মসনদ-ই-আলা উপাধি প্রাপ্তি সম্পর্কে জেম্‌স্ ওয়াইজের সংগৃহীত বিবরণের প্রায় অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায়ঃ

"...মানসিং যায় কেবল তার পাছে পাছে।।
ধইরতে না পাইর‍্যা রাজা হয়রান হইল ।
ছল কইর‍্যা ধইরব ইশারে ফন্দি যে করিল।।

এই মতে ইশা খাঁ হইল যে বন্ধ।
বন্দী হয়্যা ইশা খাঁ যে হইয়া গেল ধুন্ধ।।
জিন্‌রা পরায়্যা পায়ে দেওয়ান ইশা খাঁরে।
হাত্তির উপরে তুইল্যা পাঠায় দিল্লীর সরে।।

আকবর-সা জিজ্ঞাস করে জঙ্গের বারতা।
খুশী হয়্যা মানসিং কয় সেই কথা।।
কত জঙ্গে লইড়্যাছি আমি কত পালোয়ানের সনে।
ইশা খাঁর মতন বীর না পাইলাম রণে।।
এমন বীর নাই আর দুনিয়ার মাঝারে।
তারে বাধ্য রাইখ্‌লে কাম হইব আখেরে।।

Dhaka University Institutional Repository

এই না কথা কইয়্যা সাহেব কোন কাম করিল।
নিজ হাতে ইশা খাঁরে মুক্ত কইর‍্যা দিল।।
মুক্তি পায়্যা ইশা খাঁ বাদশার চরণ ধরিল।
ভূমিত্ পইড়্যা পরে ক্ষেমা ভিক্ষা যে চাইল ।।
ইশা খাঁর আচরণে সন্তুষ্ট হইয়া।
কুলাকুলি করে দুইয়ে সম্মান করিয়া।।
মসনদে বহাইল বাদশা নিজের যে পাশে।
সম্মান করিল কত মনের হরিষে।
মস্‌নদালী খিতাব দিয়া দিল বাইশ পরগনা।
বাইশ পরগনার মালিকানী দিল
দশ হাজার টাকা খাজনা"।।[১৪]

দেওয়ান ইশা খাঁর পালা এর উপরোক্ত বিবরণে দেখা যায় যে, "মানসিংহ সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও ঈসা খানকে বন্দী করতে না পেরে চালাকির আশ্রয় নিয়ে তাঁকে বন্দী করেন এবং জিঞ্জিরাবদ্ধ করে দিল্লীতে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখেন। শেষ পর্যন্ত বাদশাহ্ আকবর মানসিংহের নিকট ঈসা খানের বীরত্বের কথা শুনে তাঁর প্রতি সদয় হয়ে তাঁকে নিজ হস্তে মুক্ত করে দেন। মুক্তি পেয়ে ঈসা খান বাদশাহ্ আকবরের চরণ ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। আকবর ঈসা খানের আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সাথে কোলাকুলি করেন এবং তাঁকে স্বীয় মসনদের পার্শ্বে বসান । অতপর ঈসা খানকে মসনদ-ই-আলী উপাধি প্রদান এবং দশ হাজার টাকা খাজনার বিনিময়ে বাইশ পরগনার জমিদারী প্রদান করেন।"

যাহোক, জেম্‌স্ ওয়াইজের সংগৃহীত বিবরণ এবং দেওয়ান ইশা খাঁর পালা-এর বিবরণে প্রাপ্ত তথ্যাবলীতে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। জেম্‌স্ ওয়াইজের সংগৃহীত বিবরণে মানসিংহের সাথে ঈসা খানের একক যুদ্ধ, যুদ্ধে মানসিংহের পরাজয় এবং ঈসা খানের স্বেচ্ছায় আগ্রা গমনের কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে দেওয়ান ইশা খাঁর পালা-এ ঈসা খানের সাথে মানসিংহের একক যুদ্ধের কথা বলা হয়নি। এমনকি বলা হয়েছে যে, মানসিংহ চালাকি করে ঈসা খানকে বন্দী

Dhaka University Institutional Repository

করে দিল্লীতে নিয়ে যান। তবে উপরোক্ত বিবরণ দু'টিতে একটি বিষয়ে মিল রয়েছে এবং তা হচ্ছে এই যে, ঈসা খান মানসিংহের সাথে বাদশাহ্ আকবরের দরবারে যান এবং সেখানে বাদশাহ্ আকবর ঈসা খানকে মসনদ-ই-আলা উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই জেম্স্ ওয়াইজের সংগৃহীত বিবরণ ও দেওয়ান ইশা খাঁর পালা - এর বিবরণ ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। প্রথমতঃ আবুল ফযল আকবর নামায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, ঈসা খান কখনও বাদশাহ্ আকবরের দরবারে যান নি। ঈসা খানের মৃত্যু সংবাদ প্রদানের সময় আবুল ফযল বলেন, " One of the occurrences was the death of Isa. He was a great landholder in Bengal. He had some share of prudenee, but from somnolence of fortune he did not come to court",[১৩] এখানে আবুল ফযল দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন যে, ঈসা খান কখনও আকবরের দরবারে যাননি। যেহেতু ঈসা খান কখনও আকবরের দরবারে যাননি সেহেতু আকবরের সাথে ঈসা খানের সাক্ষাত কিংবা আকবর কর্তৃক ঈসা খানকে মসনদ-ই-আলা উপাধি প্রদানের কথা অমূলক নয় কি? দ্বিতীয়তঃ জেম্স্ ওয়াইজের সংগৃহীত বিবরণ ও দেওয়ান ইশা খাঁর পালা - এর মূল বক্তব্য হচ্ছে মানসিংহের সাথে একক যুদ্ধ বা যুদ্ধের পরে তাঁর সাথে বা বন্দী অবস্থায় ঈসা খান বাদশাহ্ আকবরের দরবারে যান এবং সেখানে বাদশাহ্ আকবর কর্তৃক মসনদ -ই-আলা উপাধিতে ভূষিত হন। কিন্তু মানসিংহ বাংলার সুবাহ্দার নিযুক্ত হওয়ার পরবর্তী ঘটনাবলী আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, ঈসা খানের জীবদ্দশায় মানসিংহ কখনও নিজে ভাটি আক্রমণে অংশ গ্রহণ করেন নি এবং ঈসা খানের সাথে তাঁর দেখাও হয়নি। অন্ততঃ পক্ষে আকবরনামায় এরূপ কোন ইংগিতও পাওয়া যায় না। এমনকি আকবরনামায় ঈসা খানের সাথে মানসিংহের একক যুদ্ধ সম্পর্কেও কোন ইংগিত পাওয়া যায় না। যাহোক, মানসিংহ বাংলার সুবাহ্দার নিযুক্ত হন ১৭ই মার্চ ১৫৯৪ খ্রীস্টাব্দে এবং বাংলার সুবাহ্দারীর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য বাংলার দিকে যাত্রা করেন ঐ সালের ৪ঠা মে তারিখে[১৬]। ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২রা এপ্রিল মানসিংহের পুত্র হিম্মত সিংহ ভূষণা দুর্গ দখল করেন[১৭]। ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দের ৭ই নভেম্বর মানসিংহ তাঁড়া থেকে রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তর করেন[১৮]। ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর নতুন রাজধানী থেকে মানসিংহ ভাটি-প্রধান ঈসা খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে ঈসা খান ব্রহ্মপুত্রের অপর পারে

Dhaka University Institutional Repository

চলে যান। ফলে ঈসা খানের সাথে মানসিংহের কোন যুদ্ধই হয়নি। বর্ষাকাল এসে পড়ায় মানসিংহ বগুড়ার শেরপুর মুর্চায় শিবির স্থাপন করেন[১৯]। ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২০ শে জুন মানসিংহের পুত্র দূর্জন সিংহ খাজা সুলায়মান ও কেদার রায়কে পরাস্ত করে ভূষণা দুর্গ পুনর্দখল করেন, যুদ্ধে খাজা সুলায়মান মৃত্যুবরণ করেন এবং কেদার রায় আহত হয়ে ঈসা খানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন[২০]। ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে মানসিংহের পুত্র হিম্মত সিংহ এগার সিন্দুর লুণ্ঠন করেন[২১]। ১৫৯৭ খ্রীস্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর মানসিংহের পুত্র দূর্জন সিংহ বিক্রমপুরের অদূরে সংঘটিত যুদ্ধে ঈসা খান ও মাসুম খান কাবুলীর নিকট পরাজিত ও নিহত হন[২২]। এ যুদ্ধে মুঘল বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয় এবং ঈসা খান সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করেন। ইহাই ছিল মানসিংহের সুবাহ্‌দারীর আমলে ঈসা খানের সাথে মুঘলদের সর্বশেষ সংঘর্ষ। সুতরাং মানসিংহের সাথে ঈসা খানের একক যুদ্ধ বা যুদ্ধ এবং মানসিংহের সাথে স্বেচ্ছায় কিংবা বন্দী অবস্থায় ঈসা খানের বাদশাহ্‌ আকবরের দরবারে যাওয়া, বাদশাহ্‌ কর্তৃক ঈসা খানকে দিওয়ান ও মসনদ- ই- আলা উপাধি এবং ২২ পরগনার জমিদারী প্রদানের যে কাহিনী জেম্‌স্‌ ওয়াইজের সংগৃহীত বিবরণ ও দেওয়ান ইশা খাঁর পালা - এ পাওয়া যায় তার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকতে পারেনা। তৃতীয়তঃ ঈসা খানের কামান দ্বারাই, প্রমাণ করা যায় যে, জেম্‌স্‌ ওয়াইজের সংগৃহীত বিবরণ ও দেওয়ান ইশা খাঁর পালা -এর বক্তব্য সঠিক নয়। ঈসা খানের কামানের তারিখ হচ্ছে ১০০২ হিজরী তথা ১৫৯৩ -৯৪ খ্রীস্টাব্দ । কিন্তু মানসিংহ বাংলার সুবাহ্‌দারীর দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে বাংলার দিকে যাত্রা করেন ১৫৯৪ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা মে এবং ঈসা খানের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন ১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর। এ অনুযায়ী দেখা যায় যে, মানসিংহের বাংলায় আগমন এবং ঈসা খানের বিরুদ্ধে যাত্রা করার পূর্ব থেকেই ঈসা খানের মসনদ-ই-আলা উপাধি ছিল। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ঈসা খানের মসনদ-ই-আলা উপাধি প্রাপ্তি সংক্রান্ত জেম্‌স্‌ ওয়াইজের সংগৃহীত বিবরণ ও দেওয়ান ইশা খাঁর পালা এর বক্তব্য অসত্য।

ত্রিপুরার ইতিহাস শ্রী রাজমালায় ঈসা খানের মসনদ-ই-আলা উপাধি প্রাপ্তি সম্পর্কে ভিন্ন একটি বিবরণ পাওয়া যায়। রাজমালায় বলা হয় যে,

Dhaka University Institutional Repository

"পনর শ চারি শাক পৌষ মাস শেষে,
মাঘের পনর দিনে ফতে খাঁ লৈয়া আসে।

তার কতদিন পর বঙ্গেতে উৎপাত,
দিল্লীর উমরা সৈন্য আইসে অকস্মাৎ।
ভঙ্গ দিল ইছা খাঁ সরাইল হইতে,
নৃপতি সাক্ষাতে আইসে মেহারকুল পথে।

দিল্লীর উমরা যত সরাইল আইসে,
রাজ সৈন্য দিয়া রক্ষা করহ বিশেষে।

ইছা খাঁয়ে সেই কালে মনে বিবেচিল,
মহারাণী প্রতি সেই মাতৃ সম্বোধিল।
রাণী স্তন ধৌত জল ইছা খাঁ খাইল,
রাজা রাণী পুত্র তুল্য তাকে স্নেহ কৈল।

ইছা খাঁর প্রতি রাণী রাজাতে কহিল,
মহারাজা সৈন্য দিতে তাকে আদেশিল।
পঞ্চ হস্তী দশ ঘোড়া পঞ্চ বস্ত্র দিল,
ইছা খাঁ মচলন্দানি ইনাম পাইল।
বায়ান্ন হাজার সৈন্য ইছা খাঁ সঙ্গে আর,

তদবধি ইছা খাঁর মচলন্দানি খ্যাতি,
সৈন্য সমে বিদায় হৈয়া গেল শীঘ্র গতি"।[১০]

রাজমালার উপরোক্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, "ত্রিপুরার যুবরাজ রাজধর ১৫০৪ শকে তথা ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে সিলেটের জমিদার ফতে খাঁকে বন্দী করে ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরে নিয়ে আসার কিছুদিন পরে দিল্লীর বাদশাহের সৈন্যবাহিনী সরাইল আক্রমণ করলে সরাইলের জমিদার ঈসা খান সরাইল থেকে পলায়ন করে মেহেরকুলের পথ ধরে ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরে গিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

হাজির হয় এবং রাজা অমর মাণিক্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। এমনকি ঈসা খান সাহায্য লাভের আশায় ত্রিপুরার রানীকে মাতৃরূপে সম্বোধন করেন। এতে রানী ঈসা খানের প্রতি সদয় হয়ে তাঁকে তাঁর স্তন ধৌত পানি প্রদান করলে ঈসা খান তা পানও করেন। রাণীও তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। অতপর রানীর অনুরোধে রাজা অমর মাণিক্য ঈসা খানকে ৫২০০০ সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন। শুধু তাই নয়, রাজানুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ ঈসা খানকে অনেক উপহার সহ "মচলন্দানি" উপাধি প্রদান করেন। তখন থেকে ঈসা খান "মচলন্দানি" উপাধির অধিকারী হন।"

রাজমালার উপরোক্ত বিবরণের সাথে আকবরনামায় বর্ণিত ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে মুঘল সুবাহ্দার খান-ই-জাহানের ভাটি অভিযান এবং কস্তুলের নিকট মুঘল বাহিনীর সাথে সংঘটিত যুদ্ধে ঈসা খানের পরাজয় ও পলায়নের ঘটনার যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে ভট্টশালী মত প্রকাশ করেন যে, ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্যই ঈসা খানকে মসনদ-ই-আলা উপাধি প্রদান করেন। তিনি বলেন, "As regards Isa Khan's title of Masnad-i-Ali, when the Rajmala expressly states that the title was given to him by Amara Manikya, I do not see why the statement should be disbelieved. No one can seriously contend that a powerful and independent King like Amara Manikya had not authority or power enough to confer a title on an Afghan protege."[২৮] কিন্তু রাজমালার উপরোক্ত বিবরণের উপর ভিত্তি করে ভট্টশালী যে মত প্রকাশ করেন তার সথে একমত হওয়া যায় না। কেননা রাজমালার উপরোক্ত বিবরণ ভাটি-প্রধান ঈসা খানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। প্রথমতঃ পূর্বের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, ভাটি-প্রধান ঈসা খান কখনই সরাইলের জমিদার ছিলেন না। এমন কি তিনি কখনই মুঘল বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিজ দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। দ্বিতীয়তঃ ১৫৭৮[২৯] খ্রীস্টাব্দের পূর্বেওযে ভাটি-প্রধান ঈসা খানের মসনদ-ই-আলা উপাধি ছিল তা প্রাচীন রাজমালা ও রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত পুথির সাক্ষ্য থেকে প্রমাণ করা যায়। প্রাচীন রাজমালায় পাওয়া যায় যে ঃ [৩০]

"সহস্র পরিমাণ দাড়ি সুসয্য করিয়া।
ইছা খাঁ মছলন্দালী দিছে পাঠাইয়া।।

Dhaka University Institutional Repository

সরাইল ভুলুয়ায়ে দিছে সহস্র সহস্র।
আর যত ভৌমিকে দিয়াছে করি মিশ্র" ।।

এতদভিন্ন, রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত পুথিতেও উল্লেখ করা হয় যে ঃ

"সহস্র পদাতি সঙ্গে সসজ্জ করিয়া।
ইছা খাঁ মছলন্দ আলী দিছে পাঠাইয়া।।

সরাইল ভুলুয়া দিছে হাজার হাজার।
সকলে দিয়াছে দাড়ি যত জমিদার" ।।[২৭]

উপরোক্ত বিবরণ দু'টিতে খো যায় যে, ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে "মছলন্দালী" বা "মছলন্দ আলী'' উপাধিধারী ঈসা খান রাজা অমর মাণিক্যকে দীঘি খননের কাজে এক হাজার শ্রমিক দিয়ে সাহায্য করেন। এই "ইছা খাঁ মছলন্দালী" নিসন্দেহে ভাটি-প্রধান ঈসা খান। কেননা উপরোক্ত দু'টি বিবরণেই ঈসা খান মসনদ -ই- আলা ও সরাইলের জমিদারকে পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক, উপরোক্ত দু'টি বিবরণেই ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে ভাটি-প্রধান ঈসা খান কে "ইছা খাঁ মছলন্দালী" হিসেবে উল্লেখ করায় সহজেই ধরে নেয়া যায় যে, ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেও ভাটি-প্রধান ঈসা খানের উপাধি ছিল মসনদ -ই- আলা।

তৃতীয়তঃ ভট্টশালী রাজমালায় বর্ণিত যে ঘটনার উপর ভিত্তি করে তাঁর উপরোক্ত মত ব্যক্ত করেন তা স্পষ্টতই ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দের পরের ঘটনা; ভাটি-প্রধান ঈসা খানের সাথে মুঘল বাহিনীর কত্তুলের নিকটে সংঘটিত ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দের সংঘর্ষের ঘটনা নয়। পূর্বের আলোচনায় দেখা যায় যে, ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দের পরে ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে শাহ্বায খানের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী ভাটি আক্রমণ করে খিযিরপুর, সোনারগাঁও, ভাটি-প্রধান ঈসা খানের বাসস্থান কতরাব ও এগার সিন্দুর লুণ্ঠন করে। এমনকি এসময় শাহ্বায খানকে বাজিতপুরের দিকেও সৈন্য প্রেরণ করতে দেখা যায়[২৮]। এ সময় কোন বিজয়োন্মত্ত মুঘল সৈন্যদল সরাইলে হানা দিয়ে থাকতে পারে, যার

Dhaka University Institutional Repository

পরিপ্রেক্ষিতে সরাইলের জমিদার ঈসা খান সরাইল থেকে পলায়ন করে ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরে গিয়ে রাজা অমর মাণিক্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ফলশ্রুতিতে রাজা অমর মাণিক্য তাঁকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন এবং রাজানুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ অনেক উপহার ও "মচলন্দানি" খেতাবে ভূষিত করেন। রাজা অমর মাণিক্য যে ঈসা খানকে "মচলন্দানি" খেতাবে ভূষিত করেন তিনি সন্দেহাতীত ভাবে ভাটি-প্রধান ঈসা খান হতে পারেন না। কেননা আকবরনামা পাঠে জানা যায় যে, ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে শাহ্বায খান যখন ভাটি আক্রমণ করেন তখন ভাটি-প্রধান ঈসা খান কুচবিহারে ছিলেন। কাজেই ভাটি অভিযানের প্রথমদিকে মুঘলদের সাথে তাঁর কোন সংঘর্ষই হয়নি এবং শেষের দিকে মুঘলদের সাথে তাঁর যে সংঘর্ষ হয় তাতে তিনি সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করেন। তাই সঙ্গত কারণেই ভাটি-প্রধান ঈসা খানের উদয়পুরে গিয়ে রাজা অমর মাণিক্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনার প্রশ্নই উঠে না।

যাহোক, সঠিক বক্তব্য হচ্ছে এই যে, ত্রিপুরার রাজা ভাটি-প্রধান ঈসা খানকে মসনদ-ই-আলা উপাধি প্রদান করেন নি এবং রাজা অমর মাণিক্য যে ঈসা খানকে "মচলন্দানি" খেতাবে ভূষিত করেন তিনি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ব্যক্তি হয়ে থাকবেন। এ ছাড়া পূর্বের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাজমালায় ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্যের শাসনামলে (১৫৭৭-৮৬) সরাইলে ঈসা খান নামধারী ত্রিপুরার রাজার অধীনস্থ একজন জমিদারের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ভাটি-প্রধান ঈসা খান ও একই নামের অধিকারী এই সরাইলের জমিদার ঈসা খানকে অনেকেই অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পান। এ প্রসঙ্গে পরিশিষ্ট ঃ ২-এ আলোচনা করা হয়েছে।

আধুনিক পন্ডিতগণের মধ্যেও ঈসা খানের মসনদ -ই- আলা উপাধি প্রাপ্তি বা গ্রহণ করা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতে দেখা যায়। সৈয়দ আওলাদ হাসানের মতে স্বাধীনতা ঘোষণা করে ঈসা খান নিজেই এই উপাধি গ্রহণ করেন[১১]। এম, এ, রহিমের মতে দায়ূদ খান কারারানীই ঈসা খানকে মসনদ-ই-আলা উপাধি প্রদান করেন। এ প্রসংগে তিনি বলেন, "It was because of the good grace of the Karrani Afghan ruler Taj Khan that Isa Khan was... obtained an estate in Bhati. Isa Khan thus began his career as a feudatory of the Karrani Afghan

Dhaka University Institutional Repository

rulers,... Rajmala records that the "Twelve Chiefs" of Bengal helped Daud Karrani in 1573 A.D. in his expedition in chittagong against Udayamanikya, the king of Tripura. Isa Khan , who contested the mighty forces of the Mughal Emperor Akbar in 1575 A.D. was certainly one of the Bara Bhuyans of Bengal by 1573 A.D. ...when the death of the Mughal general Munim Khan in October 1575 was noised abroad, Daud Karrani and Isa Khan made a simultaneous attack on the Mughals in the west and east. Daud rose in Orissa and occupied North and West Bengal and Isa Khan fell upon the imperial nawara in the eastern waters. Isa Khan thus helped the Karrani ruler in his struggle against his enemies, the Mughals, as well as the king of Tripura . This proves that he was devoted and loyal to Daud Karrani...The rulers to whom he rendered service could be no other than the Karranis. Isa Khan never rendered any service to Emperor Akbar... It was in recognition of his services that Daud Karrani conferred on him the tittle of Masnad-i-Ali."[৫৮]

আবদুল করিম নিম্নোক্ত কারণ প্রদর্শন করে "এম.এ.রহিমের উপরোক্ত সিদ্ধান্তও গ্রহণযোগ্য নয়" বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ঈসা খান সরাইল পরগণার জমিদার ছিলেন, তিন বৎসর আগে, অর্থাৎ ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দেও তিনি সরাইল পরগণার জমিদারই ছিলেন, তিনি তার চেয়ে বেশী ক্ষমতাশালী ছিলেন না। ঈসা খান শাহ বরদীর বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে জয়লাভ করেই কি দাউদ কররানীর সুনজরে পড়ে যান? তা'ছাড়া তখন দাউদ কররানীর নিজের অবস্থা সংকটময়;... অল্পদিনের মধ্যে মোগল সেনাপতি খানজাহান ও তোডরমল্লের সংগে তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে নিহত হন। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলার এক অখ্যাত (তখনও ঈসা খান মাত্র একটি পরগণার জমিদার) জমিদারকে সন্মানিত করার অবকাশ কি তাঁর ছিল ? দ্বিতীয়তঃ এম,এ,রহিম আবুল ফজলের যেই বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাতে পরিস্কার বলা হয়েছে যে ঈসা খান বাংলার সুলতানদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলেও তিনি কোন সময় সুলতানের দরবারে যান নি। এইরূপ লোককে সুলতান উপাধি দিয়েছেন মনে করার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়না।" এ ছাড়া আবদুল করিম আরো বলেন যে, "আমাদের মনে হয় বার-ভূঁঞার নেতৃত্ব লাভের পরে ঈসা খান নিজেই মসনদ-ই-আলা উপাধি গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন। ... তাঁর মিত্র মাসুম খান কাবুলী ১৫৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করে সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন, তাঁর অনুকরণে এবং অনুসরণে ঈসা খানও মসনদ -ই- আলা উপাধি গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ হন বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ...এই বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া না গেলেও ঈসা খানের দুর্যোগপূর্ণ বাল্য-জীবন, সাফল্য মন্ডিত কর্মময় জীবন এবং মোগল ঐতিহাসিক আবুল ফজল কর্তৃক প্রশংসিত কূটনীতিজ্ঞান এই ধারণারই সাক্ষ্য বহন করে।"[৩০]

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, সৈয়দ আওলাদ হাসান এবং এম.এ রহিমের মতো আবদুল করিমও তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে কোনরূপ প্রামাণ্য দলিল উপস্থান করেননি, বরং তিনিও তাঁদের পন্থা অনুসরণ করে ঈসা খানের জীবনের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ পূর্বক তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সাথে একমত হওয়া যায় না। প্রথমতঃ আবদুল করিম বলেন যে, মাসুম খান কাবুলী ১৫৮১ -৮২ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করে সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন এবং তাঁর অনুকরণে ও অনুসরণে ঈসা খানও মসনদ-ই-আলা উপাধি গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে আবদুল করিমের সাথে দ্বিমত পোষণের অবকাশ রয়েছে। কেননা, ইহা সর্ব জন বিদিত যে, বাংলার মুঘল সুবাহ্দার মুজফফর খান তুরবতীর সময় মুঘল সেনানায়ক ও সৈন্যরা বাংলা ও বিহারে বাদশাহ্ আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ১৫৮০ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল বিদ্রোহীরা মুজফফর খানকে হত্যা করে ঐ সালেই বাংলায় বিদ্রোহীরা সরকার গঠন করে। বিদ্রোহীরা আকবরের ভাই ও কাবুলের শাসনকর্তা মীর্যা হাকিমকে বাদশাহ্ নির্বাচিত করে এবং তাঁর নামে খুৎবা পাঠ শুরু করে। মাসুম খান কাবুলীকে মীর্যা হাকিমের প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁর উপাধি হয় খান দৌরান[৩১]। বিদ্রোহী সরকার ১৫৮০-৮২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দু'বছর বাংলা শাসন করে[৩৩]। অন্যদিকে মুজফফর খান তুরবতীর মৃত্যুর পর ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল বাদশাহ আকবর খান আযমকে বাংলার সুবাহ্দার নিযুক্ত করেন। খান আযমের সময় মাসুম খান কাবুলীর পূর্ব মিত্ররা সবাই তাঁর দল ত্যাগ করে মুঘল শিবিরে পুনঃযোগদান করলেও মাসুম খান কাবুলী ভাটি-প্রধান ঈসা খানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন[৩৪]। অতপর তিনি আর মুঘল শিবিরে ফিরে যাননি এবং ঈসা খানের আশ্রয়ে থেকে এবং ঈসা খানের সাহায্যপুষ্ট হয়ে আমৃত্যু মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। সুতরাং ইহা বলা অযৌক্তিক হবেনা যে, মাসুম খান

Dhaka University Institutional Repository

কাবুলী ছিলেন ঈসা খানের আশ্রিত এবং ঈসা খান ছিলেন মাসুম খান কাবুলীর আশ্রয় দাতা। তাই ঈসা খান কর্তৃক তাঁর আশ্রিত জন মাসুম খানের অনুসরণ কিংবা অনুকরণ করা অযৌক্তিক নয় কি? বরং মাসুম খান কর্তৃক তাঁর আশ্রয় দাতা ঈসা খানকে অনুসরণ কিংবা অনুকরণ করা অধিকতর যুক্তি সংগত। তাছাড়া আবদুল করিমের বক্তব্য অনুযায়ী মাসুম খান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ১৫৮১-৮২ খ্রীস্টাব্দে, কিন্তু ভাটি-প্রধান ঈসা খান ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দের রাজমহলের যুদ্ধের পর থেকেই কার্যতঃ স্বাধীন ও সার্বভৌম ছিলেন। কেননা একদিকে রাজমহলের যুদ্ধে মুঘলদের নিকট দায়ূদ খান কারারানীর পরাজয়ের সাথে সাথে ঈসা খানের পৃষ্ঠপোষক পরিবারের পতন ঘটায় স্বাভাবিক ভাবেই ঈসা খান কারারানী শাসকদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে যান এবং অন্যদিকে তিনি মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার না করার দরুন নতুন করে তাঁর আনুষ্ঠানিক ভাবে মাসুম খান কাবুলীর অনুকরণে ও অনুসরণে স্বাধীনতা ঘোষণা কিংবা মসনদ -ই-আলা উপাধি গ্রহণের প্রয়োজন ছিল বলে ধরে নেয়া যায় না। তাই যুক্তি সংগত ভাবেই বলা যায় যে, ঈসা খান মাসুম খান কাবুলীর অনুকরণে ও অনুসরণে মসনদ-ই-আলা উপাধি গ্রহণ করেন বলে আবদুল করিম যে মত প্রকাশ করেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ পূর্বের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেও ঈসা খানের মসনদ - ই-আলা উপাধি ছিল। এদিক থেকে বিচার করলেও আবদুল করিমের বক্তব্য গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না। তবে ধারণা করা যায় যে, ঈসা খান তাঁর পৃষ্ঠপোষক পরিবার বাংলার কারারানী আফগান শাসকদের নিকট থেকেই মসনদ-ই-আলা উপাধি প্রাপ্ত হন। এতদসংক্রান্ত কোন প্রামাণ্য দলিলের অভাব সত্ত্বেও পূর্বের আলোচনায় দেখা যায় যে, ঈসা খান বাংলায় কারারানী আফগান শাসনের প্রতিষ্ঠাতা তাজ খানের নিকট থেকে প্রথমে সোনারগাঁও ও মহেশ্বরদী পরগনার ইকতা প্রাপ্ত হন এবং কারারানী আফগানদের অধীনস্থ একজন সামন্ত হিসেবেই তিনি তাঁর কর্মময় জীবন শুরু করেছিলেন। পূর্বের আলোচনা থেকে আরো জানা যায় যে, ঈসা খান তাজ খান কারারানী থেকে শুরু করে তাঁর ভ্রাতা সুলায়মান খান কারারানী এবং সুলায়মান খানের দ্বিতীয় পুত্র দায়ূদ খান কারারানী পর্যন্ত সকল কারারানী আফগান শাসকের অনুগত ছিলেন এবং তাঁদের তিনি খেদমত করতেন। সুতরাং কারারানী আফগান শাসকদের প্রতি অবিচল আনুগত্য ও খেদমতের পুরস্কার স্বরূপ ঈসা খান তাঁদের নিকট থেকে মসনদ-ই-আলা উপাধি প্রাপ্ত হন

Dhaka University Institutional Repository

বললে অত্যুক্তি হবে না। সর্বোপরি ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেও ঈসা খানের মসনদ-ই-আলা উপাধি ছিল বিধায় ধরে নেয়া যায় যে, কাররানী শাসনামল থেকেই তাঁর এই উপাধি ছিল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কাররানী আফগান শাসকদের মধ্যে কে ঈসা খানকে মসনদ-ই-আলা উপাধি প্রদান করেন। এ ক্ষেত্রে এম,এ,রহিমের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি বলেন দায়ূদ খান কাররানীই ঈসা খানকে এ উপাধি প্রদান করেন। এক্ষেত্রে তাঁর সাথে সম্পূর্ণরূপে একমত পোষণ করা যায়। তবে আবদুল করিম যেসব কারণ প্রদর্শন করে এম,এ, রহিমের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয় বলে মত প্রকাশ করেন, আবদুল করিমের সেসব কারণ গুলোও গ্রহণযোগ্য নয় । প্রথমতঃ ঈসা খান কখনও সরাইলের জমিদার ছিলেন না। এমনকি ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি কোন ক্রমেই একজন অখ্যাত জমিদার ছিলেন না। কেননা পূর্বের আলোচনায় দেখা যায় যে, আকবর নামায় আবুল ফযল ১৫৭১ খ্রীস্টাব্দের দিকে ঈসা খানকে ভাটির শাসক হিসেবে উল্লেখ করেন। এমনকি ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দে ঈসা খানকে চট্টগ্রাম অভিযানে দায়ূদ খানকে ত্রিপুরার রাজা উদয় মাণিক্যের বিরুদ্ধে সাহায্য করতে দেখা যায়। সর্বোপরি ভট্টশালী ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে ঈসা খানের শক্তি ও সামর্থ্যের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, "Isa Khan, the most noted of the Bengal Chiefs, was powerful enough even so early as the end of 1575, to engage the imperial Nawara on almost equal terms."[৩৫] সুতরাং ঈসা খান ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে একজন অখ্যাত জমিদার ছিলেন না এবং মসনদ-ই-আলা উপাধি না পাওয়ার মতো কম যোগ্যতাও তাঁর ছিলনা । দ্বিতীয়তঃ ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মুঘল সুবাহ্‌দার মুনিম খানের মৃত্যুর পরে দায়ূদ খান যখন কটকের চুক্তি ভঙ্গ করে মুঘলদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন তখন মুঘলদের অবস্থাও যে, সংকটজনক ছিল তা আবদুল করিমের নিজের বক্তব্য থেকেও প্রমাণিত হয়। তিনি নিজেই বলেন, "মোগল বাহিনী বিপজ্জনক অবস্থায় পড়িয়া যায়, কারণ তাহারা বিহারের দিকে আশ্রয় নিতে পারেনা, আবার বাংলায়ও আফগানেরা তাহাদিগকে চতুর্দিকে ঘিরিয়া ফেলে। তখন মোগলেরা তেলিয়াগড় পথ বাদ দিয়া ত্রিহুতের পথে পশ্চিম দিকে পলাইতে থাকে।"[৩৬] তাছাড়া দায়ূদ খান যে শক্তি ও সামর্থ্য না থাকার কারণে মুঘলদের নিকট পরাজিত হন - এমনটি ও নয় । কেননা জানা যায় যে, তাঁর মন্ত্রী শ্রীহরি

Dhaka University Institutional Repository

বিক্রমাদিত্য ও অমাত্য কতলু নুহানীর বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই রাজমলের যুদ্ধে দায়ূদ খান পরাজিত হয়েছিলেন[৩৭]। সুতরাং দেখা যায় যে, আবদুল করিম দায়ূদ খানের অবস্থা যতোটা সংকটময় বলে উল্লেখ করেন বস্তুতঃ তাঁর অবস্থা ততোটা সংকটময় ছিলনা। তৃতীয়তঃ উপাধি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনেক সময় ব্যক্তিগত উপস্থিতির প্রয়োজন নাও হতে পারে। ব্যক্তিগত উপস্থিতি ব্যতিরেকেও উপাধি প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে বাগদাদের খলিফা আল-মুসতানসির বিল্লাহ্ কর্তৃক দিল্লীর সুলতান শামস্ আল-দীন ইলতুৎমিশকে "সুলতান-ই-আযম" উপাধি প্রদানের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।[৩৮] শামস্ আল-দীন ইলতুৎমিশ উপাধি প্রাপ্তির সময় বাগদাদের খলিফার দরবারে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত ছিলেন - এমর্মে কোনরূপ ইংগিত ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সুতরাং ঈসা খান দায়ূদ খান কাররানীর দরবারে উপস্থিত না থেকেও তাঁর দূত অর্থাৎ যাঁদের মাধ্যমে উপঢৌকন প্রেরণ করতেন সুলতানের দরবারে তাঁদের মাধ্যমেও দায়ূদ খান তাঁকে মসনদ-ই-আলা উপাধি প্রদান করতে পারেন বৈকি।

যাহোক, দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলা যায় যে, কাররানী শাসকদের প্রতি অবিচল আনুগত্য, অকৃত্রিম ভাবে তাঁদের খেদমত এবং দায়ূদ খান কাররানীকে তাঁর শত্রু ত্রিপুরার রাজা ও মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করায় তিনি ঈসা খানের উপর সন্তুষ্ট হয়ে রাজানুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ এই "মসনদ-ই-আলা" উপাধি প্রদান করেন।

তথ্য নির্দেশ

১। J.A.S.B. October 1909, Vol V, No. 9, পৃঃ ৩৬৭-৩৭৫।

২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭২।

৩। The Dacca Review- September- 1911, Vol.1 No. 6 , পৃঃ২১৯-২২৩। পরবর্তীতে Dacca Review হিসেবে উল্লিখিত ।

৪। Old Dhaka., পৃঃ ৮১।

Dhaka University Institutional Repository

৫। Inscriptions of Bengal Volume IV , Rajshahi, 1960, পৃঃ ৩১৪ ।

৬। মোগল আমল, পৃঃ ৬৩ ।

৭। Abdul Halim : History of the Lodi Sultans of Delhi and Agra, University of Dacca, 1961, পৃঃ ৫৩ ।

৮। The Afghans, পৃঃ ৫২-৫৩ ।

৯। তারীখ, পৃঃ ৬ এবং ১০১ ।

১০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০১ ।

১১। The Afghans, পৃঃ ১৭১ এবং ১৭৯ ।

১২। বাহারীস্তান, পৃঃ ৪৮ ।

১৩। J.A.S.B. 1874, No. 3 ,পৃঃ ২১৩-২১৪ ।

১৪। পূর্ব বঙ্গ গীতিকা, পৃঃ ২১৩-২১৬ ।

১৫। আকবরনামা ৩য়, পৃঃ১১৪০ ।

১৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৯৮-১০০১ এবং H. Bengal.,পৃঃ ২২৯ ।

১৭। প্রাগুক্ত ,পৃঃ ১০২৩ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১১ ।

১৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪২-১০৪৩ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১১ ।

১৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৪৩ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১১ ।

২০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৫৯ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১১ ।

২১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৬৩ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১২ ।

২২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৯৩ এবং প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১২ ।

২৩। রাজমালা, পৃঃ ১৮৫-১৯২ ।

২৪। ভট্টশালীর সুদীর্ঘ আলোচনার জন্য দেখুন বি,পি,পি,ভল্যুম ৩৮, পৃঃ ৩৭-৪৩ ।

২৫। ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্য দীঘি খননের কাজ শুরু করেন ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে এবং খনন কাজ শেষ হয় ১৫৮১ খ্রীস্টাব্দে ।

পনর শ শকে অমর সাগর আরম্ভন,
তিন বর্ষে সাগর খনা হৈল সমাপন।
(রাজমালা, পৃঃ১৮৯)

২৬। কালী প্রসন্নসেন, পৃঃ ৮৮-৮৯ ।

২৭। প্রাগুক্ত , পৃঃ ৮৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

২৮। আকবরনামা ৩য়,পৃঃ ৬৫০।

২৯। Dacca Review, পৃঃ ২২২।

৩০। The Afghans, পৃঃ ২২৫-২২৬।

৩১। আবদুল করিমের সুদীর্ঘ আলোচনার জন্য দেখুন মোগল আমল, পৃঃ ৬৭-৬৮।

৩২। প্রাগুক্ত, পৃঃ১৩৩-১৩৪।

৩৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৯।

৩৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৫-১৩৭।

৩৫। বি,পি, পি, ভল্যুম ৩৬, পৃঃ ৪১।

৩৬। সুলতানী আমল, পৃঃ ৩৮২।

৩৭। The Afghans, পৃঃ ২০৯-২১০ এবং বি,পি, পি, ভল্যুম ৩৬, পৃঃ ৪৫-৪৭।

৩৮। Ad. Hist., পৃঃ ২৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ঃ ২

সমসাময়িক আরো এক ঈসা খান প্রসঙ্গ

ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস শ্রী-রাজমালা অমর মাণিক্য খন্ডে ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্যের শাসনামলে (১৫৭৭ খ্রীঃ - ১৫৮৬ খ্রীঃ) সরাইলে ঈসা খান নাম ধারী একজন জমিদারের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সম্পর্কে রাজমালায় নিম্নোক্ত বিবরণ পাওয়া পাওয়া যায় ঃ

"কেহ ভয়ে কেহ প্রীতে কেহ মান্যে দিল,
বার বাঙ্গালায় দিছে তরপে না দিল।
একথা শুনিয়া রাজা বড় ক্রোধ হৈল,
রাজ্যের নিকটে রাজ্য আমা গ্লানি কৈল।
রাজধর রাজপুত্র যুদ্ধে নিয়োজিল,
বাইশ সহস্র সেনা তান সঙ্গে দিল।

এই ক্রমে চলিলেক শ্রীট্ট যুদ্ধেতে,
নৌকা পথে চলিলেক ইছাখাঁ সহিতে।
অমর মাণিক্য আজ্ঞা পাইয়া তখন,
ইছাখাঁ সহিতে চলে বঙ্গ সেনাগণ।
সুরমা উজাইয়া নৌকা শ্রীহট্টেতে গেল,
ফতেখাঁ পাঠান সঙ্গে পূর্ব্বে যুদ্ধ দিল।

পনর শ চারি শাক পৌষ মাস শেষে,
মাঘের পনর দিনে ফতে খাঁ লৈয়া আসে।

তার কত দিন পর বঙ্গেতে উৎপাত,
দিল্লীর উমরা সৈন্য আইসে অকস্মাৎ।
ভঙ্গ দিল ইছা খাঁ সরাইল হইতে,
নৃপতি সাক্ষাতে আইসে মেহারকুলপথে।

Dhaka University Institutional Repository

দিল্লীর উমরা যত সরাইল আইসে
রাজ সৈন্য দিয়া রক্ষা করহ বিশেষে।

....

ইছা খাঁয়ে সেই কালে মনে বিবেচিল,
মহারাণী প্রতি সেই মাতৃ সম্বোধিল।
রাণী স্তন ধৌত জল ইছা খা খাইল,
রাজা রাণী পুত্র তুল্য তাকে স্নেহ কৈল।

ইছা খাঁর প্রতি রাণী রাজাতে কহিল,
মহারাজা সৈন্য দিতে তাকে আদেশিল।
পঞ্চ হস্তী দশ ঘোড়া পঞ্চ বস্ত্র দিল,
ইছা খাঁ মচলন্দানি ইনাম পাইল।
বায়ান্ন হাজার সৈন্য ইছা খাঁ সঙ্গে আর,

....

তদবধি ইছা খাঁর মচলন্দানি খ্যাতি,
সৈন্য সমে বিদায় হৈয়া গেল শীঘ্রগতি"।[১]

রাজমালার উপরোক্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, "তরপের জমিদার সৈয়দ মুসা রাজা অমর মাণিক্যকে দীঘি খননের কাজে শ্রমিক দিয়ে সাহায্য না করায় তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর পুত্র রাজধর মাণিক্যের নেতৃত্বে ২২ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী তরপ অভিযানে প্রেরণ করেন। এ যুদ্ধে তরপের জমিদারকে সিলেটের জমিদার ফতে খাঁ সাহায্য করেছিল বিধায় রাজধর মাণিক্য তরপের জমিদার সৈয়দ মুসাকে পরাজিত ও বন্দী করার পর সিলেট আক্রমণ করেন। এই সিলেট আক্রমণ কালে সরাইলের জমিদার ঈসা খানও ত্রিপুরার সৈন্যবাহিনীর সাথে যোগদান করেছিল। যাহোক, ১৫০৪ শকে তথা ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে সিলেটের জমিদার ফতে খাঁকে বন্দী করে ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরে আনা হয়। এ ঘটনার কিছুকাল পরে দিল্লীর সৈন্যবাহিনী সরাইল আক্রমণ করলে সরাইলের জমিদার ঈসা খান সরাইল থেকে পলায়ন করে মেহেরকুলের পথ ধরে ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরে গিয়ে হাজির হয় এবং রাজা অমর

Dhaka University Institutional Repository

মাণিক্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। এমনকি ঈসা খান সাহায্য লাভের আশায় ত্রিপুরার রাণীকে মাতৃরূপে সম্বোধন করেন। এতে রানী ঈসা খানের প্রতি সদয় হয়ে তাঁকে তাঁর স্তন ধৌত পানি প্রদান করলে ঈসা খান তা পানও করেন। রাজা-রানীও তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। অতপর রানীর অনুরোধে রাজা অমর মাণিক্য ঈসা খানকে ৫২০০০ সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন। শুধু তাই নয়, রাজানুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ ত্রিপুরার রাজা ঈসা খানকে অনেক উপঢৌকন সহ "মচলন্দানি" উপাধিতে ভূষিত করেন। তখন থেকেই ঈসা খান "মচলন্দানি" উপাধির অধিকারী হন।'' ইহাই রাজমালার অমর মাণিক্য খন্ডে প্রদত্ত ঈসা খানের ইতিবৃত্ত। কিন্তু তিনি কে, কোথা থেকে এসে কখন কীভাবে সরাইলের জমিদারী লাভ করেন এবং তাঁর শেষ পরিণতিই-বা কি হয়েছিল, সেই সম্পর্কে কোন ইংগিত রাজমালায় পাওয়া যায় না।

যাহোক, আকবরনামায় বর্ণিত ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে মুঘল সুবাহ্দার খান-ই-জাহানের ভাটি অভিযান, কস্তুলের নিকটে মুঘল বাহিনীর সাথে ভাটি-প্রধান ঈসা খানের সংঘটিত যুদ্ধে ঈসা খানের পরাজয় ও পলায়নের ঘটনার সাথে রাজমালায় বর্ণিত দিল্লীর সৈন্যবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সরাইলের জমিদার ঈসা খান কর্তৃক সরাইল থেকে পলায়ন, ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা এবং রাজা অমর মাণিক্য কর্তৃক তাঁকে ৫২০০০ সৈন্য প্রদানপূর্বক "মচলন্দানি" উপাধি প্রদানের ঘটনার যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে ভট্টশালী ও আবদুল করিম ভাটি-প্রধান ঈসা খান ও সরাইলের জমিদার ঈসা খানকে অভিন্ন ব্যক্তি জ্ঞান করে মত প্রকাশ করেন যে, ভাটি-প্রধান ঈসা খান ক্ষমতায় আরোহণের প্রথম দিকে সরাইলের জমিদার ছিলেন। ভট্টশালী আরো বলেন যে, রাজা অমর মাণিক্যই ভাটি-প্রধান ঈসা খানকে মসনদ -ই- আলা উপাধি প্রদান করেন[২]। অবশ্য মসনদ-ই-আলা উপাধি প্রদান সম্পর্কে আবদুল করিম ভিন্নমত পোষণ করেন এবং এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে[৩]। যাহোক, এক্ষেত্রে সঠিক বক্তব্য হচ্ছে ভাটি-প্রধান ঈসা খান ও সরাইলের জমিদার ঈসা খান অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন না, বরং উভয়েই ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। প্রথমতঃ প্রাচীন রাজমালা ও রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত পুথিতে শ্রমিক সরবরাহের ক্ষেত্রে ভাটি-প্রধান ঈসা খান ও সরাইলের জমিদার ঈসা খানকে পৃথক পৃথক ভাবে দেখান হয়েছে। প্রাচীন রাজমালায় উল্লেখ করা হয় যে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

"সহস্র পরিমাণ দাড়ি সুসয্য করিয়া ।
ইছা খাঁ মছলন্দালী দিছে পাঠাইয়া ।।

সরাইল ভুলুয়ায়ে দিছে সহস্র সহস্র ।
আর যত ভৌমিকে দিয়াছে করি মিশ্র ।।"[৮]

রাজা বাবুর বাড়ীতে রক্ষিত পুথিতেও উল্লেখ করা হয় যে ঃ

"সহস্র পদাতি সঙ্গে সসজ্জ করিয়া ।
ইছা খাঁ মছলন্দ আলী দিছে পাঠাইয়া ।।

সরাইল ভুলুয়া দিছে হাজার হাজার ।
সকলে দিয়াছে দাড়ি যত জমিদার ।।"[৯]

উপরোক্ত দু'টি বিবরণেই দেখা যায় যে, "ইছা খাঁ মছলন্দ আলী" ও সরাইলের জমিদার প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক ভাবে ১০০০ শ্রমিক প্রদান করেন। এখানে "ইছা খাঁ মছলন্দ আলী" স্পষ্টতঃ ভাটি-প্রধান ঈসা খান। কিন্তু সরাইলের জমিদারের নাম উল্লেখ না থাকার কারণেই সমস্যার সৃস্টি হয়েছে। ফলশ্রুতিতে রাজমালা'র এক সংস্করণের সঙ্কলকও বিভ্রান্ত হয়ে সরাইল এবং ঈসা খান মসনদ -ই- আলাকে একত্রে জুড়ে দিয়ে সমস্যার সমাধান করেছেন বলে প্রতীয়মান হয় ঃ

"সরাইল ইছাখায় দিল সহস্র জন,
ভুলুয়া দিয়াছে দাড়ি হাজার আপন।"[১০]

এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, রাজমালা সঙ্কলক "ইছাখা" এর নাম উল্লেখ করলেও "মছলন্দ আলী" উপাধিটি উল্লেখ করেননি। যাহোক, রাজমালার সঙ্কলক যে ভুল করে ভাটি-প্রধান ঈসা খানকে ও সরাইলের জমিদার ঈসা খানকে অভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন তা রাজমালার অন্য এক সংস্করণের সঙ্কলক কালী প্রসন্ন সেনও স্বীকার করেন। তিনি বলেন, "রাজা বাবুর বাড়ীর পুথিতে এবং প্রাচীন রাজমালায় পাওয়া যায়, ঈশা খাঁ মসনদ আলী ১০০০ হাজার এবং সরাইলের ঈশা খাঁ ১০০০ হাজার কুলি প্রদান করিয়া ছিলেন। আমাদের সম্পাদ্য পুথিতে কেবল সরাইলের ঈশা খাঁ এর নাম আছে। ইনিও ত্রিপুরেশ্বর হইতে মসনদ আলী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এই কারণে উভয় ঈশা খাঁকে অভিন্ন মনে করিয়া রাজমালার নকল কারী একমাত্র ঈশা খাঁ এর নামোল্লেখ করিয়াছেন।"[৭] তিনি আরো বলেন যে, "কোন কোন ব্যাক্তি বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকের অন্তর্ভুক্ত খিজিরপুরের ঈশা খাঁ মসনদ আলী ও সরাইলের ঈশা খাঁ মসনদ আলীকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন, ... নামের ও উপাধির একতাই এরূপ ধারণার মূলীভূত কারণ। নিবিষ্ট চিত্তে সমগ্র বিষয়ে আলোচনা করিলে এই ধারণা পোষণ করা যাইতে পারেনা।... এ স্থলে "ঈশা খাঁ মছলন্দ আলী" খিজিরপুরের ঈশা খাঁ। সরাইলের ঈশা খাঁ এর নামোল্লেখ না থাকিলেও "সরাইল" শব্দ দ্বারাই বুঝা যাইতেছে, পূর্ব্বোক্ত ঈশা খাঁ ও সরাইলের জমিদার এক ব্যক্তি ছিলেন না। তাহা হইলে ঈশা খাঁ এর নামোল্লেখের পরে পুনর্ব্বার সরাইলের নাম করা হইতনা। আমাদের সম্পাদ্য পুথিতে উভয় মসনদ আলীকে অভিন্ন জ্ঞানে একমাত্র সরাইলের নামোল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা যে পরবর্ত্তী কালের সংশোধনের ফল, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে।"[৮] সুতরাং দেখা যায় যে, ভাটি-প্রধান ঈসা খান মসনদ- ই- আলা ও সরাইলের জমিদার ঈসা খানকে অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে প্রতিপন্ন করে রাজামালার সঙ্কলকের সাথে সাথে ভট্টশালী ও আবদুল করিমও একই বিভ্রান্তির স্বীকার হয়েছেন বললে অযৌক্তিক হবে না। দ্বিতীয়তঃ ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্য যে ঈসা খানকে "মচলন্দানি" উপাধি প্রদান করেন বলে রাজমালায় উল্লেখ করা হয়েছে তিনি ভাটি-প্রধান ঈসা খান হতে পারেন না। কেননা ভাটি-প্রধান ঈসা খানকে মসনদ-ই-আলা উপাধি প্রদান করেন দায়ূদ খান কারারানী এবং ইহা ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দের পূর্বের ঘটনা বলেই ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্য কে ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে দিঘী খননের কাজে ১০০০ শ্রমিক দিয়ে সাহায্য করার সময় তাঁকে রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত পুথি ও প্রাচীন রাজমালায় "ইছা খাঁ মছলন্দ আলী" হিসেবে উল্লেখ করা হয়। অন্যদিকে রাজা অমর মাণিক্য যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সরাইলের জমিদার ঈসা খানকে "মচলন্দানি" উপাধি প্রদান করেন তা স্পষ্টতঃ ১৫৮২

Dhaka University Institutional Repository

খ্রীস্টাব্দের পরের ঘটনা। এ প্রসংগে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দের পরে ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে মুঘল সুবাহ্দার শাহ্বায খানের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী যখন ভাটি আক্রমণ করে খিযিরপুর, সোনারগাঁও, ভাটি-প্রধান ঈসা খানের বাসস্থান কতরাব, এগার সিন্দুর ইত্যাদি স্থান লুণ্ঠন করে তখন বিজয়োম্মত্ত কোন মুঘল সৈন্য দল সরাইল আক্রমণ করে থাকতে পারে,[*] যে কারণে সরাইলের ঈসা খান রাজা অমর মাণিক্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এসময় ভাটি-প্রধান ঈসা খান কুচবিহারে ছিলেন[১০]। সুতরাং এ সময় যে ঈসা খান সরাইল থেকে উদয়পুরে গিয়ে রাজা অমর মাণিক্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন তিনি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ব্যক্তি হয়ে থাকবেন। তৃতীয়তঃ ভাটি-প্রধান ঈসা খান কখনই সরাইলের জমিদার ছিলেন না এবং সরাইলও কখনও তাঁর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। যদি সরাইল ভাটি-প্রধান ঈসা খানের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হতো তবে তা নিশ্চয়ই তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুসা খান মসনদ-ই-আলার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত থাকতো । কিন্তু সরাইলকে মুসা খানের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাওয়া যায়না, বরং বাহারীস্তান-ই-গায়বী পাঠে জানা যায় যে, মুসা খানের সময় সরাইলের জমিদার ছিলেন জনৈক সোনা গাযী এবং এ সোনা গাযী মুসা খানের একজন মিত্র ছিলেন। মুসা খানের নেতৃত্বাধীন বার-ভূঁঞাদের পরাজয়ের পর সরাইলের জমিদার সোনা গাযীকে মুঘল বাহিনীর সাথে একযোগে বুকাইনগরের খাজা উসমানের বিরুদ্ধে অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়[১১]। তাই এদিক থেকে বিচার করেও বলা যায় ভাটি-প্রধান ঈসা খান কখনও সরাইলের জমিদার ছিলেন না। সুতরাং রাজমালায় সরাইলের জমিদার হিসেবে যে ঈসা খানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ব্যক্তি। চতুর্থতঃ রাজমালার অন্য এক সংস্করণের সম্পাদক কালী প্রসন্ন সেনও সরাইলের জমিদার ঈসা খানকে ভাটি-প্রধান ঈসা খান থেকে ভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "ত্রিপুরেশ্বর অমর মাণিক্যের শাসন কালে সরাইল প্রদেশ ঈশা খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তির শাসনাধীন ছিল। ... ইনি ত্রিপুরার সামন্ত মধ্যে পরিগণিত ছিলেন এবং যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলে ত্রিপুরেশ্বরের পক্ষাবলম্বী হইতেন । ইঁহার বিপদকালে ত্রিপুরেশ্বরও যথোচিত সাহায্য করিতেন। অমর মাণিক্য কর্ত্তৃক তরপ রাজ্য আক্রমণ কালে, ঈশা খাঁ বাঙ্গালী সৈন্যবলসহ সেই অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন ...। তরপের যুদ্ধ ১৫০৪ শকে (১৫৮২ খ্রীঃ) সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। ইঁহার কিয়দ্দিবস

Dhaka University Institutional Repository

পরে অকস্মাৎ দিল্লীর সৈন্য দল আসিয়া সরাইল আক্রমণে উদ্যত হইল। ঈশা খাঁ আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় পলায়নপর হইলেন।... এই ঘটনা হইতে ঈশা খাঁ রাজা এবং রাজমহিষীর অসীম কৃপার পাত্র হইলেন। তাঁহাকে দরবার হইতে "মসনদ আলী" উপাধি এবং পাঁচটি হস্তী ও দশটি অশ্বসহ খেলাত প্রদান করা হইল।"[১১] এতদভিন্ন, কালী প্রসন্ন সেন সরাইলের ঈসা খান ও ভাটি-প্রধান ঈসা খান যে ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন এ মর্মে কতক যুক্তিও প্রদর্শন করেন[১৩]। আবদুল করিম কালী প্রসন্ন সেনের প্রদর্শিত যুক্তি গুলো খন্ডন করে (আবদুল করিমের সাথে কিছু কিছু ক্ষেত্রে একমত হওয়া যায়) বলেন যে, ঈসা খান একজনই ছিলেন এবং প্রথমে তিনি সরাইলে ক্ষমতায় আরোহণ করেন[১৪]। কিন্তু পূর্বের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভাটি-প্রধান ঈসা খান কখনই সরাইলের জমিদার ছিলেন না। তাছাড়া আবদুল করিম কালী প্রসন্ন সেনের যুক্তি গুলো খন্ডন করলেও তিনি পূর্বোল্লিখিত রাজমালার সঙ্কলকের বিভ্রান্তি সম্পর্কে কোন আলোচনাই করেন নি। তাই সঙ্গত কারণেই তাঁর সিদ্ধান্তের সাথে একমত হওয়া যায় না।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ভাটি-প্রধান ঈসা খান কখনই সরাইলের জমিদার ছিলেন না এবং দায়ূদ খান কাররানীই তাঁকে মসনদ -ই-আলা উপধি প্রদান করেন, ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্য নয় । এমনকি তিনি কখনও মুঘলদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিজদেশ ছেড়ে পলায়ন করে উদয়পুরে গিয়ে রাজা অমর মাণিক্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন নি, বরং তিনি দীঘি খননের কাজে অমর মাণিক্যকে ১০০০ শ্রমিক দিয়ে সাহায্য করেন। অন্যদিকে যে ঈসা খান তরপ অভিযানের সময় ত্রিপুরার রাজাকে সাহায্য করেন এবং মুঘল বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে ত্রিপুরার রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং রাজা কর্তৃক তাঁকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য প্রদান ও "মচলন্দানি" উপাধি প্রাপ্ত হয়েছেন বলে রাজমালায় বর্ণিত হয়েছে তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হয়ে থাকবেন। এ অনুযায়ী ভাটি-প্রধান ঈসা খান মসনদ-ই-আলা ব্যতিরেকেও সমসাময়িক কালে সরাইলে আরো এক ঈসা খানের অস্তিত্ব ছিল বললে অত্যুক্তি হবেনা।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১। রাজমালা, পৃঃ ১৭৯-১৯২ এবং কালীপ্রসন্ন সেন, পৃঃ ১৫২-১৫৫।

২। ভট্টশালীর বক্তব্যের জন্য দেখুন বি,পি,পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ ৩৭-৪৩।

৩। আবদুল করিমের বক্তব্যের জন্য দেখুন মোগল আমল, পৃঃ ৬১-৬৩ এবং ৬৬।

৪। কালীপ্রসন্ন সেন, পৃঃ ৮৮-৮৯।

৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ৮৮।

৬। রাজমালা, পৃঃ ১৭৯।

৭। কালীপ্রসন্ন সেন, পৃঃ ৯০।

৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩২-১৩৩।

৯। ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে ভাটি অভিযানের সময় শাহ্বায খানকে বাজিতপুরের দিকেও একটি সৈন্য দল প্রেরণ করতে দেখা যায় (আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ৬৫০)।

১০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৪৯-৬৫০।

১১। বাহারীস্তান, পৃঃ ৪৮-৪৯, ১৬০ এবং ১৬৫।

১২। কালীপ্রসন্ন সেন, পৃঃ ১১৪-১১৫।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৩-১৩৪।

১৪। মোগল আমল , পৃঃ ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ঃ ৩

ঈসা খান কেন্দ্রিক লোকপ্রিয় উপাখ্যানাদির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

ইহা সর্বজনবিদিত যে, প্রতিভাবান মহাপুরুষদের জীবদ্দশাতে যেমনি মৃত্যুর পরেও তেমনি তাঁদের সম্পর্কে নানাবিধ কল্পকাহিনীর প্রচলন হয়। অনুরূপভাবে বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রবলতম প্রতিবন্ধক এবং আমরণ স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত বাংলার বীর সন্তান ভাটি-প্রধান ঈসা খান সম্পর্কেও এই দেশের ঘরে ঘরে নানাবিধ জনপ্রিয় লোক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বহুল প্রচলিত দু'টি কাহিনীর একটি হচ্ছে মুঘল সুবাহ্‌দার মানসিংহ ও ঈসা খানের মধ্যে একক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ সংক্রান্ত এবং অন্যটি হচ্ছে বিক্রমপুরের জমিদার কেদার রায়ের ভগ্নী বা কন্যা বা কেদার রায়ের ভাই চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা সোণামণি বা সোণাময়ী বা স্বর্ণময়ীর সাথে ঈসা খানের জোরপূর্বক বিয়ে বা প্রেম সংক্রান্ত । এ দু'টি কাহিনীই সত্য ঘটনার পরিবর্তে অতি - কথার উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। তাছাড়া এ দু'টি কাহিনীতে জন প্রবাদের নায়ক ঈসা খানকে পাওয়া গেলেও ইতিহাসের নায়ক ঈসা খানকে খুঁজে পাওয়া যায় না। যাহোক, বর্তমান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক কাহিনী দু'টিতে বর্ণিত ঘটনাবলীর যথাসম্ভব সত্যতা নিরূপণ করা।

এ ক্ষেত্রে প্রথমে মানসিংহের সাথে ঈসা খানের একক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের কাহিনী সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর দেশী বিদেশী বেশ কয়েকজন লেখক মানসিংহের সাথে ঈসা খানের একক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। এ পর্যায়ে প্রথম লেখক হচ্ছেন জেম্‌স্ ওয়াইজ। তাঁর সংগৃহীত বিবরণ থেকে উক্ত বিষয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত কাহিনী পাওয়া যায়[১] ঃ

"১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে মুঘল সুবাহ্‌দার মানসিংহ বাংলা আক্রমণ কালে এগার সিন্দুরের দুর্গ অবরোধ করেন। এ অবস্থায় ঈসা খান দুর্গ মুক্ত করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁর সৈন্যরা যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় তিনি মানসিংহকে একক দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান জানান, শর্ত থাকে যে, যিনি এ যুদ্ধের

Dhaka University Institutional Repository

পরেও জীবিত থাকবেন তিনি বাংলার অধিকার প্রাপ্ত হবেন। মানসিংহ এতে সম্মত হন। কিন্তু ঈসা খান অশ্বারোহণপূর্বক যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে উপলব্ধি করেন যে, তাঁর প্রতিপক্ষ একজন তরুণ বয়স্ক যুবক, মানসিংহের জামাতা। যাহোক, তাঁরা লড়াই করেন এবং লড়াইয়ে মানসিংহের জামাতা নিহত হন। ঈসা খান কাপুরুষতার জন্য মানসিংহকে ভর্ৎসনা করে শিবিরে ফিরে আসেন। অতঃপর ঈসা খান যখন সংবাদ পান যে, মানসিংহ নিজেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন তখন তিনি পুনরায় অশ্বারোহণপূর্বক যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করেন। কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিপক্ষের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। মানসিংহই তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, নিশ্চিত হওয়ার পর লড়াই শরু হয়। ঈসা খানের প্রথম আঘাতেই মানসিংহ তাঁর তরবারী হারান। এ অবস্থায় ঈসা খান মানসিংহকে নিজের তরবারী সমর্পণ করলে তিনি তা গ্রহণ না করে ঘোড়া থেকে অবতরণ করেন। ঈসা খানও ঘোড়া থেকে অবতরণ করে মানসিংহকে মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানান। কিন্তু মানসিংহ ঈসা খানের বদান্যতা এবং বীরত্ব ও বিনয়ে অভিভূত হয়ে তাঁর সাথে লড়াইয়ের পরিবর্তে ঈসা খানকে বন্ধু হিসেবে সম্বোধন পূর্বক তাঁর সাথে আলিংগন করেন। আপ্যায়নের পর বিদায় কালে মানসিংহ ঈসা খানকে প্রচুর উপহার প্রদান করেন। কিন্তু মানসিংহের এ রূপ আচরণে তাঁর অনেক অনুসারীই ক্ষুব্ধ হন। এমনকি মানসিংহের রানী এ কাপুরুষোচিত আচরণে এতটাই ক্ষুব্ধ হন যে, তিনি কখনও বদশাহের দরবারে ফিরে না যওয়ার শপথ করেন। কেননা বাদশাহ্ নিশ্চয়ই এ পরাজয়ের জন্য মানসিংহকে হত্যার আদেশ দিবেন এবং রানী বিধবা হয়ে যাবেন। যাহোক, বাদশাহের মহানুভবতার উপর আস্থা স্থাপন করে ক্ষমা লাভের জন্য ঈসা খান স্বেচ্ছায় মানসিংহের সাথে আগ্রা যেতে রাজী হলে এ অভ্যন্তরীণ কলহ প্রশমিত হয়। আগ্রায় পৌছার পর ঈসা খানকে বন্দী করে রাখা হয়। কিন্তু বাদশাহ্ এগার সিন্দুরের লড়াইয়ের ঘটনা শুনা মাত্রই ঈসা খানকে তাৎক্ষণিক মুক্তির আদেশ দেন এবং দিওয়ান ও মসনদ-ই-আলী উপাধি এবং বাংলায় অনেকগুলো পরগনা প্রদান করেন।'' জেমস্ ওয়াইজ বর্ণিত উপরোক্ত কাহিনী ব্যতিরেকেও স্বরূপ চন্দ্র রায় রচিত সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস[২], এফ, বি, ব্রেডলি-বার্ট রচিত <u>The Romance of an Eastern Capital</u>[৩] এবং নিখিল নাথ রায় রচিত প্রতাপাদিত্য[৪] গ্রন্থেও মানসিংহের সাথে ঈসা খানের

Dhaka University Institutional Repository

একক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রায় অনুরূপ কাহিনী পাওয়া যায়। উক্ত লেখকদের প্রত্যেকের কাহিনীতেই মানসিংহকে ভীরু ও কাপুরুষ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ঈসা খানকে বিজয়ী বীর ও মহানুভব ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক, মানসিংহের সাথে ঈসা খানের একক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ সংক্রান্ত উপরোক্ত কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। প্রথমতঃ পূর্বের আলোচনায় দেখা গেছে যে, ঈসা খানের জীবদ্দশায় মানসিংহ কখনও নিজে সরাসরি ভাটি অভিযানে অংশ গ্রহণ করেননি এবং ঈসা খানের সাথে মানসিংহের দেখাও হয়নি। সুতরাং মানসিংহের সাথে ঈসা খানের একক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের প্রশ্ন অবান্তর। দ্বিতীয়তঃ আকবরনামায় আবুল ফযল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেন যে, ঈসা খান কখনও বাদশাহ্ আকবরের দরবারে যান নি[*]। যেহেতু ঈসা খান কখনও আকবরের দরবারে যাননি সেহেতু আকবরের সাথে ঈসা খানের সাক্ষাত কিংবা আকবর কর্তৃক ঈসা খানকে মসনদ-ই-আলা উপাধি প্রদান কিংবা বাংলায় অনেকগুলো পরগনা প্রদানের কথিত কাহিনী অমূলক নয় কি ? তৃতীয়তঃ ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দায়ূদ খান কাররানীই ঈসা খানকে মসনদ-ই-আলা উপাধি প্রদান করেন এবং মানসিংহ বাংলায় আগমনের পূর্ব থেকেই ঈসা খানের মসনদ-ই-আলা উপাধি ছিল। সর্বোপরি ঈসা খান নিঃসন্দেহে একজন বীর ও মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু চরম শত্রু আকবরের নিকট থেকে বীরত্বের পুরস্কার আনার জন্য তাঁর দরবারে যাওয়ার মতো এতোটা নির্বোধ নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন না। যাহোক, এক কথায় বলা যায় যে, মানসিংহের সাথে ঈসা খানের একক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের কথিত কাহিনীগুলো কল্পকাহিনী বৈ - অন্য কিছু নয়।

নিম্নে ঈসা খান ও স্বর্ণময়ী বা সোণামণির বিয়ে কিংবা প্রেম সংক্রান্ত কাহিনী সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এ সংক্রান্ত অনেক বিচিত্র ও রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। জেম্স্ ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনীটি হচ্ছে এরূপ ঃ "খিযির পুরের ঈসা খানের (ভাটি- প্রধান ঈসা খান) সাথে বিক্রমপুরের জমিদার চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের বিরোধ ছিল। একদা ঈসা খান বিক্রমপুর আক্রমণ করে চাঁদ রায়ের একমাত্র কন্যা সোণাইকে (সুবর্ণময়ী) জোরপূর্বক ধরে নিয়ে আসেন এবং বিয়ে করেন।"[৮] দ্বিতীয় আকর্ষণীয় কাহিনীটি পাওয়া

Dhaka University Institutional Repository

যায় এফ, বি, ব্রেডলি-বার্ট রচিত The Romance of an Eastern Capital - গ্রন্থে, "তরুণ বয়সে ঈসা খান বিক্রমপুরের জমিদার চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা সোণা বিবির রূপ মাধুর্যের কথা শ্রবণ করে সকল প্রকার বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তাঁকে জয় করার দৃঢ় সংকল্প হন। ধর্মীয় বাধা ছাড়াও আর একটি বাধা ছিল সোণা বিবির বৈধব্য। হিন্দু মতে কোন বিধবার পুনর্বিবাহ হতে পারেনা। কিন্তু ঈসা খান তা মেনে নেন নি, তিনি জোরপূর্বক সোণা বিবিকে মেঘনা ও লক্ষ্যার সঙ্গম স্থলে অবস্থিত কলাগাছিয়া দুর্গে নিয়ে আসেন। উত্তেজিত চাঁদ রায় ও তাঁর আত্মীয় স্বজন ঈসা খানের পশ্চাদ্ধাবন করেন। কিন্তু ঈসা খান সকল আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হন। সোণা বিবি ঈসা খানের বীরত্ব ও শৌর্যে মুগ্ধ হয়ে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ পূর্বক ঈসা খানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ঈসা খানের মৃত্যুর পরেও সোণাবিবি বেঁচে ছিলেন। ঈসা খানের মৃত্যুর পর চাঁদপুরের রাজা কেদার রায় পূর্ব প্রতিশোধ গ্রহণার্থে ত্রিপুরার রাজার সাথে এক যোগে ঈসা খানের রাজ্য আক্রমণ করেন। এ অবস্থায় সোণা বিবি তাঁর স্বামীর রাজ্য রক্ষার্থে লক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত সোনাকান্দা দুর্গ সুরক্ষিত করে কয়েক সপ্তাহ ব্যাপী লড়াই করে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। কিন্তু অবশেষে মৃত্যু যখন অত্যাসন্ন তখন তিনি তাঁর স্বামীর দুর্গ কিছুতেই শত্রুদের নিকট সমর্পণ না করার সংকল্প করেন এবং দুর্গটিকে পুড়িয়ে ভূমিসাৎ করে দেয়ার নির্দেশ দেন এবং সেই হুতাশনে আত্মাহুতি দিয়ে তিনি একে তাঁর চিতায় পরিণত করেন"[১]। এ সংক্রান্ত অন্য আর একটি কাহিনী পাওয়া যায় স্বরূপ চন্দ্র রায়ের সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস গ্রন্থে এবং তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

"ঈশা খাঁ, বিক্রমপুরের অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ চাঁদ রায়ের পরমাসুন্দরী বিধবা কন্যা সোণামণিকে বিবাহ করিবার মানসে তথায় দূত প্রেরণ করেন। ওদিকে চাঁদ রায় ও তৎপুত্র কেদার রায় শ্রবণ মাত্র জ্বলন্ত অগ্নিবৎ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। প্রথম আক্রমণেই চাঁদ রায়, ঈশা খাঁর কলাগাইছার দুর্গ বিধ্বস্ত করেন। ঈশা খাঁ ত্রিবেনী দুর্গে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। চাঁদ রায় ত্রিবেনী অবরোধ করিয়া খিজিরপুরের বহুতর অনিষ্ট সাধন করিতে লাগিলেন। ঈশা খাঁ মনে মনে স্থির করিলেন, কোনও রূপে সোণামণি আমার হস্তগত হইলেই চাঁদ রায় কন্যার শোকে বিহ্বল হইবেন এবং হয়ত যুদ্ধ করিতেও নিবৃত্ত থাকিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঈশা খাঁ অর্থবলে চাঁদ রায়ের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষকে হস্তগত করেন। প্রধান কর্ম্মচারী বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক সোণা মণিকে ঈশা খাঁর হস্তে সমর্পণ করেন।

চাঁদ রায় হিন্দুধর্ম্মে বড়ই আস্থাবান ছিলেন। যাঁহার জন্যে এত সংগ্রাম, এত নরশোণিতপাত, সেই প্রাণসমা দুহিতার নিয়তি পর্য্যালোচনা করিয়া মহাত্মা চাঁদ রায়ের হৃদয় বিলোড়িত হইল। তারামন্দিরে কপাট রুদ্ধ করিয়া সর্ব্বশক্তিমতী আরাধ্য দেবীর নিকট "হত্যা" দিলেন, আদেশ হইল, "সোণামণির জন্যে আর নরশোণিতপাত করিওনা।" এই রূপ অটল বিশ্বাসের গতিকেই যুদ্ধের অবসান হইল। চাঁদরায় বিশাল রাজ্যের সর্ব্ব কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মালোচনায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। কেদার রায়, রাজ্যশাসন, প্রজাপালন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। এদিকে যবনসম্পৃক্তা সোণামণি, বিবি অলিনেয়ামত নামে অভিহিতা হইলেন। কিন্তু দেশে আজও সর্ব্ব সাধারণের মধ্যে ইনি সোণাবিবি বলিয়াই পরিচিত আছেন।"[৮]

শ্রীসতীশ চন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনার ইতিহাস ২য় খন্ডেও প্রায় অনুরূপ একটি কাহিনী পাওয়া যায়। "শ্রীপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের সহিত তাহার বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু তিনি দৈবক্রমে একদিন চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা সোণামণিকে দর্শন করিয়া রূপোম্মত্ত হন ও পরে চাঁদ রায়ের বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারী শ্রীমন্ত খাঁকে হস্তগত করিয়া সোণামণিকে হরণ করিয়া লইয়া বিবাহ করেন। এই অপমানে চাঁদরায় অচিরে প্রাণ ত্যাগ করেন (১৫৮৩)। এবং কেদার রায় প্রতিশোধ লইবার জন্য আজীবন বিদ্বেষবহ্নি প্রদীপ্ত রাখিয়াছিলেন"[৯]।

প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা সপ্তম খন্ডে দেওয়ান ইশা খাঁর পালা থেকে জানা যায় যে, "একদা ঈসা খান নৌকায় চড়ে পদ্মা নদী দিয়ে শ্রীপুর অতিক্রম কালে জমিদার কেদার রায়ের ভগ্নী সুভদ্রাকে দেখতে পান, সুভদ্রাও ঈসা খানকে দেখতে পায়। সুভদ্রা, ঈসা খানকে দেখা মাত্রই তাঁর প্রেমে পড়ে যায়। অতপর প্রেমোম্মত্ত সুভদ্রা পদ্মার পাড়ে স্নানঘাটে যায় এবং চিঠির মারফতে ঈসা খানকে অনুরোধ জানায় যে, ঈসা খান যেন চৈত্রমাসের অষ্টমী তিথীতে এই স্নানঘাটে এসে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যান । এ অনুযায়ী ঈসা খান উক্ত দিনে পদ্মার স্নান ঘাটে আসেন এবং সুভদ্রাকে নৌকায় তুলে জঙ্গল বাড়ীতে নিয়ে যান।

অন্যদিকে কেদার রায় এ সংবাদ শ্রবণ মাত্রই ঈসা খানের পশ্চাদ্ধাবন করলেও তাতে কোন ফল হয়নি। অতপর সুভদ্রা ইসলাম ধর্ম গ্রহণপূর্বক ঈসা খানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তাঁর নতুন নাম হয় "নিয়ামত জান"। নিয়ামতজান, আদম খান ও বিরাম খান নামক দু'পুত্র সন্তানের মা হ'ন। আদমের বয়স যখন পনর বছর তখন ঈসা খান মৃত্যুবরণ করেন। ঈসা খানের মৃত্যুর পর প্রতিশোধ গ্রহণার্থে কেদার রায় জঙ্গলবাড়ী যান এবং তাঁর বোন সুভদ্রার নিকট তাঁর দু'কন্যার সাথে আদম ও বিরাম খানের বিবাহের প্রস্তাব দেন এবং তাদেরকে এ জন্য কেদার রায়ের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। সুভদ্রা এতে রাজী না হওয়ায় কেদার রায় ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন এবং বলেন যে, আদম ও বিরামকে তাদের নানী দেখার জন্য উদগ্রীব তাই তিনি তাদেরকে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু সুভদ্রা এতেও সম্মত না হওয়ায় কেদার রায় কৌশলের আশ্রয় নিয়ে আদম ও বিরামকে জঙ্গল বাড়ী থেকে শ্রীপুরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখেন এবং বলি দেয়ার জন্য কালী মন্দিরে নিয়ে যান। এ বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ শুনে কেদার রায়ের দু'কন্যা কালী মন্দিরে গিয়ে এ কাজে বাধা প্রদান করে। অন্যদিকে ঈসা খানের সেনাপতি করিমুল্লা এ সময় শ্রীপুর আক্রমণ করলে কেদার রায় ভয়ে পলায়ন করেন এবং জঙ্গল মধ্যস্থিত এক ভূ-গর্তস্থ গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন । করিমুল্লা সেখানে গিয়ে কেদার রায়কে হত্যা করে । অতপর জঙ্গল বাড়ীতে আদম ও বিরাম খানের সাথে মহাধুম-ধামের সাথে কেদার রায়ের দু'কন্যার বিয়ে দেয়া হয়"[১১১০]।

সর্বোপরি সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী রচিত রায় নন্দিনী উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তুও হচ্ছে ঈসা খান ও স্বর্ণময়ীর প্রেম কাহিনী সংক্রান্ত। এ উপন্যাস থেকে জানা যায় যে, "স্বর্ণময়ী ছিল শ্রীপুরের জমিদার কেদার রায়ের কন্যা এবং চাঁদ রায় ছিল কেদার রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ঈসা খানের সাথে তাঁদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং শ্রীপুরে কেদার রায়ের বাড়িতে তাঁর যাতায়াত ছিল। এমন কি একবার স্বর্ণময়ী যখন শ্রীপুরের কৃষ্ণ দীঘিতে সাঁতার কাটতে গিয়ে মাঝখানে ডুবে মারা যাচ্ছিল তখন ঈসা খান মুহূর্তের মধ্যে দীঘিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বর্ণময়ীকে উদ্ধার করেন। দ্বিতীয়বার প্রতাপাদিত্যের লোকরা যখন স্বর্ণময়ীকে লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছিল তখনও ঈসা খান স্বর্ণময়ীকে রক্ষা করেন। ফলশ্রুতিতে স্বর্ণময়ী বীরত্ব ও শৌর্যে মুগ্ধ হয়ে ঈসা খানের প্রেমে পড়ে। যাহোক, ইদিল

Dhaka University Institutional Repository

পুরের শ্রীনাথ চৌধুরীর সাথে স্বর্ণময়ীর বিয়ে পাকাপাকি হয়ে গেলেও স্বর্ণময়ী ঈসা খানের প্রেমে উম্মাদিনী হয়ে তাঁর নিকট পত্র প্রেরণ করে এবং ঈসা খানও এতে অনুকূল সাড়া দেন এবং স্বর্ণময়ীর সাথে দেখা করার জন্য স্বর্ণময়ীর মাতুলালয় সাদুল্লাপুরে যান। কিন্তু স্বর্ণময়ীর মামাত ভাই হেমদাকান্ত ও তাঁর গুরু অভিরাম স্বামী স্বর্ণময়ীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। যাহোক, হেমদাকান্ত তাঁর গুরুকে হত্যা করে এবং শেষ পর্যন্ত প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি মাহতাব খান স্বর্ণময়ীকে উদ্ধার করেন। অতপর ঈসা খান আনুষ্ঠানিক ভাবে কেদার রায়ের নিকট বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু কেদার রায় রাজী হলেও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা চাঁদ রায়, কুলগুরু যশোদানন্দ এবং স্বর্ণময়ীর মাতা হিরন্ময়ী এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। ফলে ভগ্নমনোরথ হয়ে ঈসা খান দাক্ষিণাত্যের বিজয় নগরের হিন্দু রাজ্যের বিরুদ্ধে আহমদনগর, বিজাপুর ও গোলকুন্ডার মুসলিম সুলতানদের সাথে জেহাদে অংশ গ্রহণের জন্য সেখানে গমন করেন। ইতোমধ্যে কুলগুরু যশোদানন্দ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জহিরুল হক নাম ধারণ করেন এবং তিনি স্বর্ণময়ীকে দাক্ষিণাত্যে ঈসা খানের নিকট নিয়ে যান। সেখানে স্বর্ণময়ী যুদ্ধাহত ঈসা খানের জীবন রক্ষার্থে চিকিৎসার জন্য তাঁর বাহু থেকে এক টুকরা মাংসচ্ছেদ করে প্রদান করেন। অতপর স্বর্ণময়ী ইসলাম ধর্ম গ্রহণপূর্বক ঈসা খানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের এক মাস পর ঈসা খান দাক্ষিণাত্য থেকে খিযিরপুরে প্রত্যাবর্তন করলে চাঁদ রায় ও কেদার রায় খিযিরপুর এসে ঈসা খানের সাথে গভীর আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হন।"[১১]

উপরোক্ত কাহিনীগুলোর মূল বিষয় বস্তু প্রায় একই রূপ হলেও অনেক ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ শেষোক্ত দুটি কাহিনী ব্যতীত অন্য সব গুলো কাহিনীতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈসা খান স্বর্ণময়ীর রূপ-মুগ্ধ হয়ে তাকে জোরপূর্বক কিংবা চাঁদ রায়ের এক বিশ্বাস ঘাতক কর্মচারীর সাহায্যে শ্রীপুর থেকে নিয়ে এসে বিয়ে করেন, কিন্তু শেষোক্ত দুটি কাহিনীতেই উল্লেখ করা হয় যে, স্বর্ণময়ী, ঈসা খানের প্রেমে-উম্মত্ত হয়ে স্বেচ্ছায় ঈসা খানের সাথে চলে আসে। দ্বিতীয়তঃ একমাত্র শেষোক্ত কাহিনীতেই স্বর্ণময়ীকে কেদার রায়ের কন্যা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু অন্যান্য কাহিনীতে স্বর্ণময়ীকে চাঁদ রায়ের কন্যা কিংবা কেদার রায়ের ভগ্নী হিসেবে এবং কোন কোন কাহিনীতে

Dhaka University Institutional Repository

স্বর্ণময়ীকে বিধবা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তৃতীয়তঃ কোন কোন কাহিনীতে প্রতিশোধ গ্রহণার্থে চাঁদরায় কিংবা কেদার রায় কর্তৃক ঈসা খানের রাজ্য আক্রমণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু শেষোক্ত কাহিনীতে দেখা যায় যে, চাঁদ রায় ও কেদার রায় খিযিরপুরে এসে ঈসা খানের সাথে গভীর আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হন। চতুর্থতঃ একটি মাত্র কাহিনীতেই স্বর্ণময়ী কিংবা সুভদ্রার দু'টি পুত্র সন্তান থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যকাহিনী গুলোতে এ সংক্রান্ত কোন ইংগিত পাওয়া যায় না ।

যাহোক, উপরোক্ত কাহিনীগুলোর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। প্রথমতঃ সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থ আকবরনামা পাঠে জানা যায় যে, কেদার রায়, ঈসা খানের একজন মিত্র ছিলেন এবং তিনি ঈসা খানের জীবদ্দশায় এবং ঈসা খানের মৃত্যুর পরেও তাঁর পুত্র মুসা খানের সাথে একযোগে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন[১২]। সুতরাং কেদার রায় কর্তৃক ঈসা খানের রাজ্য আক্রমণের প্রশ্নই উঠেনা, উপরন্তু আকবরনামায় আবুল ফযল উল্লেখ করেন যে, ভূষণা দুর্গকে কেন্দ্র করে কেদার রায়ের সাথে খাজা উসমান ও খাজা সুলায়মানের সংঘর্ষ হলে ঈসা খান উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করেন এবং কেদার রায়কে ভূষণা দুর্গ প্রত্যর্পণ করেন[১৩]। এ ছাড়াও দেখা যায় যে, ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জুন ভূষণা দুর্গের যুদ্ধে মুঘল সুবাহ্দার মানসিংহের পুত্র দূর্জন সিংহের নিকট পরাজিত ও আহত হয়ে কেদার রায় ঈসা খানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন[১৪]। দ্বিতীয়তঃ আকবরনামায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, চাঁদ রায় ভূষণা দুর্গকে কেন্দ্র করে সংঘটিত সংঘর্ষে খাজা সুলায়মান ও খাজা উসমান কর্তৃক নিহত হন[১৫]। সুতরাং ঈসা খান কর্তৃক কন্যা অপহরণের অপমানে চাঁদ রায়ের কথিত মৃত্যুর ঘটনা সম্পূর্ণরূপে অলীক। তৃতীয়ত ঃ ঈসা খানের সেনাপতি করিমুল্লার হস্তে কেদার রায়ের কথিত মৃত্যুর ঘটনাও অবাস্তব এবং কাল্পনিক। কেননা আকবরনামা পাঠে জানা যায় যে, ১৬০৩ খ্রীস্টাব্দে বিক্রমপুরের নিকটে মুঘল বাহিনীর সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কেদার রায় আহত অবস্থায় বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় তাঁকে সুবাহ্দার মানসিংহের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। এবং মানসিংহের নিকট পৌঁছার পরেই কেদার রায়ের মৃত্যু হয়[১৬]। চতুর্থত ঃ সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থ আকবরনামা ও বাহারীস্তান -ই-গায়বী পাঠে জানা যায় যে, ঈসা খানের পাঁচ জন পুত্র সন্তান ছিল এবং এরা

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছেন মুসা খান, মাহ্‌মুদ খান, ইলিয়াস খান, আব্দুল্লাহ্‌ খান ও দায়ূদ খান[১৭]। সুতরাং আদম খান কিংবা বিরাম খান নামে কথিত ঈসা খানের কোন পুত্র সন্তানের অস্তিত্ব ইতিহাসে পাওয়া যায় না। পঞ্চমতঃ সন্দেহাতীত ভাবে ঈসা খান একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী রাজনীতিক ছিলেন। তাই দৃঢ়ভাবেই বলা যায় যে, তাঁর পক্ষে এমন কোন কান্ড-জ্ঞানহীন কাজ করা সম্ভব নয়, যা থেকে তাঁর চরম শত্রু মুঘলরা কোন রূপ বাড়তি সুবিধা পেতে পারে। তাছাড়া বিক্রম পুরের কেদার রায় ছিলেন ঈসা খানের প্রতিবেশী জমিদার । সুতরাং কেদার রায়ের কন্যা বা ভগ্নী কিংবা তাঁর ভ্রাতা চাঁদ রায়ের কন্যাকে অপহরণ করে প্রতিবেশী জমিদারের অহেতুক শত্রুতা অর্জনের মতো নির্বোধও নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন না। কেননা তিনি ভালভাবে জানতেন যে, পশ্চাতে শত্রু রেখে তাঁর পক্ষে প্রবল পরাক্রম মুঘল বাদশাহ্‌ আকবরের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম অব্যাহত রাখা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। সর্বোপরি, ঈসা খান যেখানে অফুরন্ত শক্তির অধিকারী মুঘল বাদশাহের বিরুদ্ধে তাঁর সীমিত শক্তি নিয়ে লড়াইয়ে সফলতা লাভের আশায় প্রতিবেশী ভূঁঞা - জমিদারদের সাথে সু-সম্পর্ক স্থাপনে বদ্ধপরিকর ছিলেন সেখানে কেদার রায়ের কন্যা বা ভগ্নীকে জোরপূর্বক নিয়ে এসে বিয়ে করার মতো একটি বিচার - বিবেচনাহীন কাজে লিপ্ত হবেন, তা কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না । যাহোক, ইহা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা যায় যে, ঈসা খান ও স্বর্ণময়ী সংক্রান্ত উপরোক্ত কাহিনীগুলোর কোন বাস্তব ভিত্তি নেই এবং ঈসা খানের সংগ্রামী জীবন - ইতিহাসে স্বর্ণময়ী একটি কাল্পনিক চরিত্র বৈ-অন্যকিছু নয়।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত যে, ঈসা খান সম্পর্কে এ দেশে যে সব লোককাহিনী প্রচলিত রয়েছে সে গুলোর মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন ঐতিহাসিক সত্য খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রচলিত লোক কাহিনীগুলোর মধ্যে শুধু রূপকথার নায়ক ঈসা খানকেই পাওয়া যায়, কিন্তু স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে মুঘল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রামে লিপ্ত ইতিহাসের নায়ক ঈসা খানকে অনেক ক্ষেত্রেই খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে ইহা সত্য যে, সর্বযুগে, সর্বদেশের বীর সন্তানদেরকে ঘিরে অনেক লোককাহিনীর জন্ম হয়, তদরূপ এদেশের বীর সন্তান ঈসা খান মসনদ-ই-আলা- কে ঘিরেও অনুরূপ লোক কাহিনীর প্রচলন কোন ক্রমেই অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক নয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১। J.A.S. B. 1874, No. 3, পৃঃ ২১৩-২১৪।

২। সুবর্ণ গ্রাম, পৃঃ ১০০-১০১।

৩। Eastern Capital, পৃঃ৭৭-৭৯।

৪। প্রতাপাদিত্য, পৃঃ ৫৫-৫৬।

৫। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ১১৪০।

৬। J.A.S. B. 1874, No. 3, পৃঃ ২০২।

৭। Eastern Capital, পৃঃ৭৬ এবং ৭৯-৮০।

৮। সুবর্ণ গ্রাম, পৃঃ ১০৩-১০৪।

৯। যশোহর খুলনা, পৃঃ ৩৬।

১০। পূর্ব বঙ্গ গীতিকা, পৃঃ ২১৮-২৪০।

১১। আবদুল কাদির সম্পাদিত ঃ শিরাজী-রচনাবলী-উপন্যাস খন্ড "রায়-নন্দিনী", ঢাকা, ১৯৬১, পৃঃ ৭-১৪৭। পরবর্তীতে রায় - নন্দিনী হিসেবে উল্লিখিত।

১২। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ১২১৪-১২১৫ এবং মোগল আমল, পৃঃ ১৫৮-১৫৯।

১৩। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ৯৬৯।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৫৯।

১৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৬৯।

১৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৩৫-১২৩৬ এবং মোগল আমল, পৃঃ ১৫৮-১৫৯।

১৭। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ১২১৫ এবং বাহারীস্তান, পৃঃ ৪৮, ৬১,৬৮ এবং ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ঃ ৪

বাংলা সাহিত্যে ঈসা খান প্রসঙ্গ ঃ একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

পূর্ব-ভারতে মুঘল বাদশাহ্ আকবরের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভাটি-প্রধান ঈসা খান মসনদ -ই- আলার বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামী জীবন এ দেশের আপামর জন সাধারণের মনরাজ্যে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। এর প্রতিফলন ঘটে এদেশের বিভিন্ন পল্লী কবি, নাট্যকার, উপন্যাসিক এবং গীতিকার রচিত পালা গান, নাটক, উপন্যাস এবং দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে ঈসা খানকে কেন্দ্র করে রচিত প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা সপ্তম খন্ডে প্রাপ্ত অজ্ঞাতনামা পল্লী কবি রচিত পালা গান দেওয়ান ইশা খাঁর পালা, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর রচিত নাটক মুকুট, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী রচিত উপন্যাস রায় নন্দিনী, ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নাটক ঈশা খাঁ এবং এদেশের প্রখ্যাত গীতিকার, সুরকার ও সঙ্গীত শিল্পী আবদুল লতিফ রচিত একটি "দেশাত্মবোধক" সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

দেওয়ান ইশা খাঁর পালা[১] - কে মূলতঃ ঘটনামূলক গাথা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় । এ পালা গানের কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছেন ঈসা খান মসনদ - ই-আলা। এতে ঈসা খানের পিতৃপরিচয়, জন্ম, মুঘলদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম, কেদার রায়ের ভগ্নীর সাথে তাঁর প্রণয় ঘটিত কাহিনী, তাঁর মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এক কথায় বলা যায় দেওয়ান ঈশা খাঁর পালা হচ্ছে ঈসা খানের জীবনী ভিত্তিক একটি পালাগান । এ পালাগান পাঠে যে কোন পাঠকের পক্ষেই ঈসা খানের জীবনেতিহাস সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা লাভ করা সম্ভব। কিন্তু এ পালাগানে বর্ণিত ঈসা খানের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী ইতিহাস মনস্ক সু-সচেতন পাঠককে অনেক ক্ষেত্রেই হতাশ করবে। কেননা এ পালাগানে বর্ণিত ঘটনাবলীকে ইতিহাসের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ঘটনারই কোনরূপ ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, এ পালাগানে বর্ণিত ঈসা খানের পিতৃপরিচয়, মুঘল সুবাহ্দার মানসিংহের সাথে বন্দী অবস্থায় তাঁর মুঘল বাদশাহের দরবারে গমন,

বাদশাহ্ কর্তৃক তাঁকে জমিদারী প্রদান ও মসনদ-ই-আলা উপধি প্রদান, কেদার রায়ের ভগ্নীর সাথে তাঁর বিবাহ ইত্যাদি ঘটনার যে, কোন ঐতিহাসি ভিত্তি নেই, তা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ইহা সত্য যে, দেওয়ান ইশা খাঁর পালা পাঠে সমসাময়িক কালের বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা, রাজচরিত্র, স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষার্থে মুঘলদের বিরুদ্ধে ঈসা খানের সংগ্রাম এবং বাংলায় মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঈসা খান যে প্রবলতম প্রতিবন্ধক ছিলেন সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। এদিক থেকে বিচার করলে দেওয়ান ঈশা খাঁর পালা - এর ঐতিহাসিক মূল্য নিতান্ত কম নয়। এতদ্ভিন্ন, মুঘলদের বিরুদ্ধে স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষার্থে যুদ্ধে ঈসা খান যে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন তা যে এদেশের আপামর জনসাধারণের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বাংলার অজ্ঞাত নামা পল্লী কবি রচিত এ পালাগানের মাধ্যমে। যাহোক, এ দেশের গৌরবময় ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের নায়ক ভাটি-প্রধান ঈসা খানের সংগ্রামী জীবনের স্মৃতিধারণকারী এ পালাগানটিকে নিসন্দেহে বাংলা-সাহিত্য ভান্ডারের একটি অমূল্য সম্পদ হিসেবে গণ্য করা যায়।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচিত মুকুট[২] নাটকে ঈসা খানকে চিত্রিত করেছেন ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্যের বশংবদ সেনাপতি হিসেবে। মুকুট নাটক পাঠে জানা যায় যে, চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে আরাকানের রাজার সাথে ত্রিপুরার রাজার যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় সে যুদ্ধে ঈসা খান ত্রিপুরার রাজার সেনাপতিত্ব করেন এবং এ যুদ্ধে ঈসা খান মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু মুকুট নাটকে ঈসা খান সম্পর্কিত বর্ণিত ঘটনাবলীর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। কেননা ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্যের সাথে আরাকানের রাজার যুদ্ধ হয় ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু ভাটি-প্রধান ঈসা খান মৃত্যুবরণ করেন ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে। সুতরাং ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে আরাকানের রাজার সাথে যুদ্ধে ঈসা খানের মৃত্যুর ঘটনা নিছক কল্পকাহিনী মাত্র। এতদ্ভিন্ন, ভাটি-প্রধান ঈসা খান স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষার্থে মুঘলদের বিরুদ্ধে আজীবন মরণপণ যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন, ত্রিপুরার রাজার সেনাপতিত্ব করার মতো অখন্ড অবসর তিনি পেলেন কোথায় ? প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মুকুট নাটকে ঈসা খানকে ত্রিপুরার রাজার বশংবদ সেনাপতি হিসেবে চিত্রিত করে তাঁর স্বাধীন সার্বভৌম

মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছেন মাত্র। তবে ইহা স্বীকার্য বিষয় যে, ঈসা খান বাংলার ইতিহাসের এমন একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের মতো একজন বড় মাপের নাট্যকারও তাঁর নাটকে ঈসা খানের নাম ব্যবহার করতে প্রলুব্ধ হয়েছেন। এতদ্ভিন্ন, মুকুট নাটকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈসা খানের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করলেও এবং ঈসা খানের গৌরবময় সংগ্রামী জীবনের ঘটনাবলী এ নাটকে স্থান না পেলেও ঈসা খানের কীর্তি যে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের মনকেও গভীর ভাবে আলোড়িত করেছিল তা তাঁর এ নাটকে ঈসা খানের নামের উপস্থিতি থেকে সহজেই বোধগম্য হয়। পরিশেষে বলা যায় যে, ঈসা খান সংক্রান্ত মুকুট নাটকের ঘটনাবলী ইতিহাস সম্মত না হলেও এ নাটকটি নিসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করেছে।

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস রায়-নন্দিনীর[৩] প্রধান কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছেন ঈসা খান মসনদ-ই-আলা । এ উপন্যাসের মূল বিষয় বস্তু হচ্ছে শ্রীপুরের জমিদার কেদার রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ীর সাথে ঈসা খানের প্রণয় ঘটিত কাহিনী। এ উপন্যাসে সিরাজী ঈসা খানকে একজন অনিন্দ্য সুন্দর, তেজোদ্দীপ্ত, ক্ষমতাশালী এবং হৃদয়বান বীর যোদ্ধা হিসেবে চিত্রিত করেছেন, যার প্রেমে উম্মাদিনী হয়ে কেদার রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ী নিজেকে ঈসা খানের চরণে সমর্পণ করেছে। কিন্তু শিরাজী সাহেব ঈসা খানের চরিত্র যেভাবে অংকন করেছেন তাতে রসাশ্রয়ী উপাখ্যানের নায়ক ঈসা খানকে পাওয়া গেলেও বাস্তব আশ্রয়ী ইতিহাসের নায়ক ঈসা খানকে অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না। কেননা ইতিহাসের নায়ক ঈসা খান বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে মুঘল বাদশাহের বিরুদ্ধে তাঁর আমরণ সংগ্রামে, কিন্তু ইসমাইল হোসেন শিরাজীর উপন্যাসের নায়ক ঈসা খান বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন শ্রীপুরের জমিদার কেদার রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ীর হরণকারী যশোহরের জমিদার প্রতাপাদিত্য এবং দক্ষিণ ভারতের বিজয় নগর রাজ্যের হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে সেখানকার পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাজ্য আহমদ নগর, বিজাপুর ও গোলকুন্ডার সুলতানদের সংঘটিত যুদ্ধে। তাছাড়া ঈসা খানের সাথে কেদার রায়ের কন্যার প্রণয়, ঈসা খানের দাক্ষিণাত্যে গমন ও বিজয় নগর রাজ্যের হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে জেহাদে অংশগ্রহণ ইত্যাদি ঘটনার বিন্দুমাত্র ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। তবে একথা সত্য যে, এ উপন্যাসে চিত্রিত ঈসা খান, কেদার রায়, চাঁদ রায়, প্রতাপাদিত্য ইত্যাদি

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্রগুলো ঐতিহাসিক। এছাড়া ঈসা খানকে সমসাময়িক কালের অন্যান্য জমিদারদের তুলনায় যে রকম ক্ষমতাশালী ও প্রতাপান্বিত জমিদার হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে তা ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য । এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, শিরাজী সাহেব কিছুটা হলেও তাঁর এ উপন্যাসে ইতিহাসের নায়ক ঈসা খানকে উপস্থাপিত করতে সফল হয়েছেন। যাহোক, রায়-নন্দিনী উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক ভিত্তি অনেক ক্ষেত্রেই নড়বড়ে হলেও এর সাহিত্যিক মূল্যমান নিতান্ত কম নয়।

ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ঐতিহাসিক নাটক ঈশা খাঁ"-এর অন্যতম প্রধান চরিত্র হচ্ছে ঈসা খান । এতদ্ভিন্ন, এ নাটকের অন্যান্য ঐতিহাসিক চরিত্র গুলো হচ্ছে মুঘল বাদশাহ্ আকবর, মুঘল সুবাহ্দার শাহ্বায খান, মানসিংহ ও টোডরমল। মুঘল আধিপত্য থেকে স্বীয় জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় ঈসা খানের প্রতিরোধ সংগ্রামের ঘটনাবলীর বিবরণই হচ্ছে এ নাটকের মূল বিষয় বস্তু। ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এ নাটকে ঈসা খানকে একজন স্বাধীনচেতা, দেশপ্রেমিক,অমিতত্যাজি বীরযোদ্ধা এবং মহানুভব ব্যক্তি হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এছাড়াও নাট্যকার এ নাটকে ঈসা খানকে একজন অকুতোভয় এবং বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী মুঘল বাদশাহ্ আকবরের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রিয় জন্মভূমির স্বাধীনতার রক্ষাকর্তা হিসাবে প্রতিপন্ন করেন, যিনি মুঘল বাহিনীর পুনঃপুনঃ আক্রমণের মুখেও অবিচল থেকে বীরত্বের সাথে লড়াই করে বাংলাকে পদানত করার মুঘলদের সকল প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দেন। এক কথায় বলা যায় ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ নাটকে যেভাবে ঈসা খানকে চিত্রিত করেছেন তা থেকে যে কোন পাঠকের পক্ষেই বাংলায় মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান ও প্রবলতম প্রতিবন্ধক ভাটি-প্রধান ঈসা খান মসনদ-ই-আলার স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় কীর্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব। তাই ইহা বলা অযৌক্তিক হবেনা যে, এই নাট্যকার ইতিহাসের নায়ক এদেশের বীর সন্তান ঈসা খানকে তাঁর নাটকে সম্পূর্ণরূপে না হলেও মোটামুটি গ্রহণযোগ্য ভাবে চিত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নাট্যকার যে অতিরঞ্জনের দোষে দুষ্ট এবং কিছু কিছু অনৈতিহাসিক ঘটনার যে অবতারণা করেছেন তা বলা বাহুল্য। এতদসত্ত্বেও বলা যায় যে, নাট্যকার ঈসা খানের চরিত্র বলিষ্ঠ ভাবে অংকন করতে সক্ষম হয়েছেন, যা অনেকটাই

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাসের নায়ক ঈসা খানের প্রতিচ্ছবি এবং নিসন্দেহে নাটকটি লাভ করেছে জীবন্তরূপ।

ঈসা খান তাঁর গৌরবময় কীর্তির কারণে শত শত বছর পরেও যে, বাংলার জনগণের মন থেকে বিস্মৃত হননি এবং শত শত বছর পরেও যে, তিনি বাংলার স্বাধীনতা প্রিয় জনগণের নিকট প্রেরণার উৎস হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছেন তা এ দেশের প্রাক-মুক্তি-যুদ্ধকালীন দেশাত্মবোধক গণসঙ্গীত থেকেও সুস্পষ্টভাবে প্রণিধানযোগ্য। ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের গণ-অভ্যুত্থানের সময় রচিত দেশাত্ম-বোধক গানটি দীর্ঘ নয়মাসের মুক্তিযুদ্ধ কালীন সময় মুক্তি যোদ্ধাদেরকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। এ গানটি হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

"সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা
সোনা নয় তত খাঁটি
বল যত খাঁটি তার চেয়ে খাঁটি
বাংলাদেশের মাটিরে আমার বাংলাদেশের মাটি
আমার জন্মভূমির মাটি।।

এই মাটি তলে ঘুমায়েছে অবিরাম
রফিক শফিক বরকত শত নাম
কত তিতুমীর কত ঈসা খান
দিয়েছে জীবন দেয় নিকো মান "[৭]

উক্ত গানটিতে দেখা যায় যে, ঈসা খান ছিলেন দেশ-মাতৃকার এমন একজন বীর সন্তান যিনি নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন কিন্তু জন্ম ভূমির সন্মান ভূলুণ্ঠিত হতে দেন নি। ঈসা খান যে একজন স্বাধীন চেতা এবং দেশ প্রেমিক বীর যোদ্ধা ছিলেন তা এ গানটিতে সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। এক কথায় বলা যায় উক্ত গানটিতে ঈসা খানের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছে। এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন বিসর্জনকারী জাতীয় বীরদের স্মৃতি ধারণকারী এ

Dhaka University Institutional Repository

গানটি নিসন্দেহে সর্বদা বাংলাদেশের সংগীত - সাহিত্যের শোভা বর্ধন করেই যাবে।

যাহোক, উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ঈসা খানকে কেন্দ্রকরে শুধুমাত্র মুখরোচক লোক কাহিনীই জন্ম হয় নি বরং সৃষ্টি হয়েছে শিল্পমান সমৃদ্ধ পালাগান, নাটক, উপন্যাস ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত যা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের পরিধিকে করেছে আরো বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ। পরিশেষে বলা যায় যে, উক্ত পালাগান, নাটক, উপন্যাস ও দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে ঈসা খানের স্মৃতি আবহমান কাল ধরে এদেশের জনগণের মাঝে চির জাগরুক হয়ে আছে।

তথ্য নির্দেশ

১। পূর্ব বঙ্গ গীতিকা, পৃঃ ১৫৯-২৪০।

২। সোনারগাঁয়ের ইতিহাস উৎস ও উপাদান, পৃঃ ১৫৯-১৮৬।

৩। রায়-নন্দিনী, পৃঃ ৭- ১৪৭।

৪। মূলনাটক -ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদনায় - ফরিদ উদ্দিন খান ।

৫। বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রদর্শিত কেয়া চৌধুরী উপস্থাপিত রঙধনু ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে শিল্পী আবদুল লতিফের একান্ত সাক্ষাতকার থেকে শ্রুত ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ঃ ৫

ঈসা খানের সাক্ষাত - উত্তর পুরুষ ও তাঁদের ভূমিকা

ঈসা খানের জীবদ্দশায় তাঁর কোন পুত্র কিংবা অন্যকোন আত্মীয় স্বজনকে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেখা না গেলেও ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে ঈসা খানের মৃত্যুর পর ১৬০২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর পুত্র মুসা খান ও দায়ূদ খানকে মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে দেখা যায়।[১] সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থ বাহারীস্তান - ই- গায়বী পাঠে জানা যায় যে, ঈসা খানের পাঁচ জন পুত্র সন্তান ছিল এবং এরা হচ্ছেন, মুসা খান, দায়ূদ খান, আবদুল্লাহ্ খান, মাহ্মুদ খান এবং ইলিয়াস খান। এ ছাড়া আলাওল খান নামে ঈসা খানের এক ভ্রাতুস্পুত্রের উপস্থিতিও ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায়[২]। ঈসা খানের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুসা খান পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং বাহারীস্তানে দেখা যায় যে, তিনিও তাঁর পিতার মতো মসনদ-ই-আলা উপাধি গ্রহণ করেন[৩]। পিতার অবর্তমানে মুসা খান মুঘল বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত অন্যান্য ভূঁঞা-জমিদারদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মুসা খানও ঈসা খানের মতো একজন স্বাধীনচেতা, সংগ্রামী এবং দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন। তিনি তাঁর ভাইদেরকে সাথে নিয়ে অন্যান্য মিত্র ভূঁঞা - জমিদারদের সহায়তায় ভাটি অঞ্চলে মুঘল অধিপত্য প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু মুঘল বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের শাসনামলে বাংলার সুবাহ্দার ইসলাম খান চিশতীর নিকট সীমিত সৈন্যবল ও অস্ত্রবলের কারণে বার বার যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে মনোবল হারিয়ে ফেলেন এবং শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে মুঘলদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

যাহোক, নিম্নে মুঘলদের বিরুদ্ধে মুসা খানের প্রতিরোধ সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হচ্ছে। বিহারের সুবাহ্দার ইসলাম খান চিশতী ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দের ৬ই মে বাংলার সুবাহ্দার নিযুক্ত হন এবং ঐ বছর জুন মাসের প্রথম দিকে তিনি বাংলার রাজধানী রাজমহলে পৌঁছেন । রাজমহলে বসেই তিনি বাংলার ভূঁঞা - জমিদারদেরকে দমনের কর্মসূচী ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। অতপর মুসা খানের নেতৃত্বাধীন মুঘল বিরোধী ভূঞা-জমিদারদেরকে দমনের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করে ইসলাম খান চিশতী ১৬০৯ খ্রীস্টাব্দের

১৫ই অক্টোবর ঘোড়াঘাট ত্যাগ করে ভাটি অভিযানে যাত্রা করেন এবং প্রায় আড়াই মাস পরে ডিসেম্বরের মধ্যে শাহজাদপুরে পৌঁছেন।[৪] অতপর তিনি স্থল পথে বালিয়া[৫] যাত্রা করেন এবং ইহতিমাম খানকে[৬] নৌ-বহর ও গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে বালিয়া যাওয়ার নির্দেশ দেন। বালিয়ায় পৌঁছার পর ইসলাম খান ইহতিমাম খান ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে পুনরায় মুসা খানের বিরুদ্ধে অভিযান সংক্রান্ত বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়যে, ইহতিমাম খান নৌ-বহর নিয়ে খালযোগিনীর ত্রিমোহনায়[৭] যাবেন এবং ইসলাম খান কাটাসগড়ের[৮] মোহনায় যাবেন এবং সেখান থেকে তিনি যে রূপ নির্দেশ দিবেন, সকলে সে কাজ করবেন। যাহোক , ইহতিমাম খান তাঁর নৌ-বহর নিয়ে খালযোগিনীর ত্রিমোহনায় উপস্থিত হয়ে সেখানে তিনটি মোহনায় তিনটি দুর্গ নির্মাণ করে অবস্থান গ্রহণ করেন। অন্যদিকে ইসলাম খান চিশতী কাটাসগড় পৌঁছলে ইহতিমাম খান সেখানে গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হন।[৯] কাটাসগড়ের অনতি দূরেই ছিল মুসা খানের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি যাত্রাপুর দুর্গ।[১০] ইসলাম খান সুসঙ্গের রাজা রঘুনাথের পরামর্শে স্থল ও নৌ-বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের দ্বারা যাত্রাপুর দুর্গ দখলের পরিকল্পনা করেন। এ রূপ পরিস্থিতিতে মুসা খানও নিশ্চেষ্ট বসে থাকেননি, তিনিও তাঁর মিত্র জমিদারদেরকে সাথে নিয়ে মুঘলদেরকে প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং ডাকছড়া[১১] নামক স্থানে একটি সুউচ্চ দুর্গ নির্মাণ করেন। এ সময় যেসকল ভূঁঞা-জমিদারদেরকে মুসা খানের সাথে থাকতে দেখা যায় তাঁরা হচ্ছেন, মুসা খানের মামাত ভাই আলাওল খান, মুসা খানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল্লাহ্ খান ও মাহ্মুদ খান,বাহাদুর গাযী,সোনা গাযী,আনোয়ার গাযী,শয়খ পীর,মিরযা মুমিন, মাধব রায়, বিনোদ রায়,পাহলোয়ান এবং হাজী শাম্স্ আল-দীন বাগদাদী। যাহোক, দুর্গ নির্মাণের পর মুসা খান সেখানে কামান ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র স্থাপন করেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন[১২]। মুসা খানই প্রথমে কাটাসগড়ের মুঘল অবস্থানের উপর আক্রমণ পরিচালনা করেন। এ অবস্থায় মুঘল বাহিনীও মুসা খান এবং তাঁর মিত্র বাহিনীর উপর প্রতিআক্রমণ চালায়। তিন দিন ধরে উভয় পক্ষে প্রচন্ড সংঘর্ষ চললেও জয় পরাজয় অনিশ্চিত থেকে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুসা খান মুঘল বাহিনীর নিকট পরাজিত হন এবং মুঘলরা প্রথমে ১৬১০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের প্রথম দিকে যাত্রাপুর দুর্গ এবং পরে ১৬১০ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই জুলাই ডাকছড়া দুর্গ

Dhaka University Institutional Repository

দখল করে নেয়।[১৩] এ ভাবেই মুসা খান ও তাঁর মিত্রবাহিনী মুঘলদের নিকট প্রথম পর্যায়ের সংগ্রামে পরাজিত হয়।

যাত্রাপুর এবং ডাকছাড়া দুর্গের পতনের ফলে মুসা খানের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির মূল ভিত্তি অনেকাংশেই দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে তাঁর সুনাম, যশ, প্রতিপত্তি এবং মর্যাদা দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়। এমনকি তাঁর ভাই ইলিয়াস খান তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মুঘলদের আনুগত্য স্বীকার করে এবং ইসলাম খানের সাথে মিলিত হয়।[১৪] যাহোক, যাত্রাপুর ও ডাকছড়া দুর্গ জয়ের পর ইসলাম খান ১৬১০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে বিনা বাধায় ঢাকায় পৌঁছেন এবং মুসা খানের সাথে দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। অন্যদিকে মুসা খানও পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। হাজী শামস্-আল-দীন বাগদাদীকে সোনারগাঁও এর দায়িত্বে রেখে তিনি লক্ষ্যা নদীতে চলে আসেন। মুসা খান এ লক্ষ্যা নদীকেই তাঁর প্রতিরক্ষার প্রধান ভিত্তিরূপে ব্যবহার করেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নৌ-বহর মোতায়েন করেন। মুসা খান বিক্রমপুর ও শ্রীপুরে দুটি চৌকি স্থাপন করেন। মুসা খান বন্দর খালের মুখে[১৫] দু'দিকে দু'টি দুর্গ নির্মাণ করে একটিতে নিজে অবস্থান নেন এবং অন্যটিতে তাঁর মামাত ভাই আলাওল খানকে নিযুক্ত করেন। মাসুম খান কাবুলীর পুত্র মিরযা মুমিনকে নৌকাসহ তাঁদের পিছনে অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দেন। এছাড়া মুসা খান তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ খানকে নারায়ণগঞ্জের বিপরীতে কদম রসুল দুর্গে (নবীগঞ্জ), দায়ূদ খানকে কতরাবতে, মাহ্মুদ খানকে লক্ষ্যার সাথে দোলাইর সংযোগস্থল ডেমরায় নিযুক্ত করেন। সর্বোপরি মুসা খান বাহাদুর গাযীকে দু'শত নৌকাসহ লক্ষ্যার আরো উপরে বর্তমানে কালিগঞ্জের এক মাইল উত্তরে চৌরায় নিযুক্ত করেন[১৬]। কিন্তু সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মুসা খান নৌ-যুদ্ধে মুঘলদের নিকট দ্বিতীয় পর্যায়ের সংগ্রামেও পরাজিত হয়ে প্রথমে সোনারগাঁওয়ে এবং পরে ইব্রাহিমপুরে পলায়ন করেন। অন্যদিকে তাঁর ভাই দায়ূদ খান ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের হস্তে নিহত হন। ভাইয়ের মৃত্যুতে মুসা খান খুবই মর্মাহত হন এবং একের পর এক যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার ফলে তিনি মনোবল হারিয়ে ফেলেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর সকল ভাই ও মিত্র জমিদারদেরকে সাথে নিয়ে অনন্যোপায় হয়ে ইসলাম খান চিশতীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন।[১৭] মুসা খানের আত্মসমর্পণের সাথে সাথেই পূর্ব বাংলার ভূঁঞা-জমিদারদের মুঘল

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের অবসান ঘটে। যাহোক, সুবাহ্দার ইসলাম খান চিশতী মুসা খান এবং অন্যান্য জমিদারকে সান্তনা দেন এবং মুসা খানকে তাঁর পরিবারবর্গ ও ভাইদের সহ নযর বন্দী করে রাখেন এবং সুবাহ্দারের বিশ্বস্ত কর্মকর্তা আবদুর রহমান পতনী ও তাঁর ভাইদের অধীনে রাখেন । তাঁদের জমিদারী তাঁদের ভরন-পোষণের জন্য জায়গীর হিসেবে প্রদান করা হয়। মুসা খানের অন্য ভাইদের এবং মিত্র জমিদারদের বুকাইনগরের খাজা উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য নিযুক্ত করা হয়। মুসা খান ১৬২৩ খ্রীস্টাব্দের শেষ দিকে বা ১৬২৪ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে বাংলার সুবাহ্দার ইবরাহীম খান ফতেহজংগের শাসনামলে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন[১৮]।

যাহোক, মুসা খান ছিলেন নিসন্দেহে তাঁর পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরী। তিনি তাঁর পিতার আরব্ধ কাজ সফলতার সাথে অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর সীমিত সৈন্য ও অস্ত্রবলের দ্বারা পিতা ঈসা খানের মৃত্যুর পরেও একদশকেরও বেশী সময় পর্যন্ত ভাটি অঞ্চলে তথা পূর্ববাংলায় মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে দেন নি। শেষ পর্যন্ত মুঘলদের নিকট পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেও স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনিও তাঁর সহযোদ্ধাগণ যে বীরত্ব প্রদর্শন করেন তাতে তাঁদের অদম্য মনোবল, অসাধারণ রণ-কৌশল ও অকুন্ঠ স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।

তথ্য নির্দেশ

১। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ১২১৫ এবং মোগল আমল, পৃঃ ১৫৮।

২। বাহারীস্তান, পৃঃ ৪৮, ৬১, ৬৮ এবং ৭৬ । বাহারীস্তানে আলাওল খানকে মুসা খানের মামাত ভাই হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু আবদুল করিম চাচাত ভাই হিসেবে উল্লেখ করেন (মোগল আমল, পৃঃ ১৯৯)।

৩। বাহারীস্তান, পৃঃ ৪৮।

৪। প্রাগুক্ত , পৃঃ ৩৮-৪১ এবং মোগল আমল, পৃঃ ১৯০। শাহজাদপুর এখনও একটি প্রসিদ্ধ স্থান। পাবনা জেলায় করতোয়ার পশ্চিম তীরে শাহজাদপুর অবস্থিত (মোগল আমল , পৃঃ২১৪, টীকা - ৩১)।

৫। শাহজাদপুরের প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণ - পূর্বে বোয়ালিয়াকে বালিয়া বলে মনে করা হয় (মোগল আমল , পৃঃ২১৫টীকা- ৩২)।

Dhaka University Institutional Repository

৬। ইহতিমাম খানের প্রকৃত নাম মালিক আলী। আকবরের রাজত্বকালে তিনি ছিলেন আড়াইশো অশ্বারোহীর পরিচালক। কিছুকাল তিনি আগ্রার কতোয়াল ছিলেন। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর তাঁকে বিদ্রোহী খসরুর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন । পরবর্তী সময়ে তাঁকে নৌ-সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে বাংলায় পাঠানো হয় (বাহারীস্তান, পৃঃ ২৪৯)।

৭। কাটাসগড়ের সামান্য নিম্ন দক্ষিণে " ত্রিমোহনী খাল যোগিনী" অবস্থিত । বর্তমানে ইহা "তেমনা" নামে পরিচিত। শফিউদ্দিন আহাম্মদ ঃ মোগল - বার ভূঞা দ্বন্দ্বঃ প্রসঙ্গ মানিকগঞ্জ জেলা, ইতিহাস, ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা, পঞ্চবিংশ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, ১৩৯৮ বাংলা সন, পৃঃ ৬১ (পরবর্তীতে ইতিহাস হিসেবে উল্লিখিত) ।

৮। কাটাসগড় থেকেই গঙ্গা, ধলেশ্বরী এবং ইছামতির পৃথক পৃথক ধারা মানিকগঞ্জ জেলার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। কাটাসগড়ের অবস্থান বর্তমান শিবালয় থানার উলাইল ইউনিয়নের পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে। কাটাসগড় নামটি বর্তমানে "কাশটাসাগর" নামে পরিচিত(প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬১)।

৯। বাহারীস্তান, পৃঃ ৪৩-৪৬।

১০। মানিকগঞ্জ জেলা সদর থেকে প্রায় ১৫ মাইল দক্ষিণে হরিরামপুর থানার বয়রা ইউনিয়নে ইছামতি তটে যাত্রাপুর অবস্থিত (ইতিহাস, পৃঃ ৬১)।

১১। ডাকছড়া বর্তমানে "ঢাকিজোড়া" নামে পরিচিত। ঢাকিজোড়া গ্রামটি হরিরামলপুর থানার শিমুলিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২)।

১২। বাহারীস্তান, পৃঃ ৪৮-৪৯।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯-৬০ এবং H. Bengal..২৫৫-২৫৬।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬১।

১৫। বন্দর খাল বর্তমানে ত্রিবেণী খাল নামে পরিচিত (মোগল আমল, পৃ. ১৯৯)।

১৬। বাহারীস্তান , পৃঃ ৬৮ এবং মোগল আমল, পৃঃ ১৯৮-১৯৯।

১৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০-৭৮ এবং ৯১, প্রাগুক্ত , পৃঃ ২০০-২০৩, ২০৮ এবং H.Bengal, পৃঃ২৬১।

১৮। মোগল আমল , পৃঃ ৩৯২।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ঃ ৬

আকর গ্রন্থ সমূহের পর্যালোচনা

ভাটি-প্রধান ঈসা খানের ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বর্তমান সন্দর্ভে ব্যবহৃত আকর গ্রন্থগুলো গবেষক ও ঐতিহাসিকদের নিকট বিশেষ ভাবে পরিচিত। তবুও এই আকর গ্রন্থগুলোর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কেননা এ সন্দর্ভে ব্যবহৃত আকর গ্রন্থগুলো বিশেষ করে আকবরনামা,[১] আইন - ই- আকবরী[২] ও রিয়ায আল-সালাতীনের[৩] কিছু কিছু তথ্য পূর্ববর্তী গবেষক ও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে কিংবা ঐ তথ্যগুলোর প্রতি তাঁদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়নি। যে কারণে ঈসা খানের পিতৃ পরিচয় এবং মুঘল আগ্রাসী অভিযানের বিরুদ্ধে ঈসা খানের প্রতিরোধ সংগ্রাম সংক্রান্ত তাঁদের মূল্যায়ন যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয় না। যাহোক, মুঘল বাদশাহ্ আকবরের সময় বাংলায় মুঘল অভিযানের জন্য এবং ভাটি-প্রধান ঈসা খানের নেতৃত্বাধীন ভূঁঞা-জমিদারদের মুঘল-বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের একমাত্র ও প্রধান ঐতিহাসিক সূত্র হচ্ছে বাদশাহ্ আকবরের প্রিয়পাত্র আবুল ফযল কর্তৃক ফার্সী ভাষায় রচিত ইতিহাস গ্রন্থ আকবরনামা। কিন্তু আকবর নামায় পরিবেশিত ঈসা খানের পিতৃ পরিচয় এবং ভূঁঞা-জমিদারদের বিরুদ্ধে পরিচালিত মুঘল অভিযান সংক্রান্ত আবুল ফযলের তথ্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যায় না। প্রথমতঃ ঈসা খানের পিতৃ পরিচয় বর্ণনাকালে আবুল ফযল আকবরনামায় প্রথমে উল্লেখ করেন যে, ঈসা খানের পিতা ছিলেন রাজপুতদের বাঈস সম্প্রদায়ভুক্ত লোক। শের শাহের পুত্র সেলিম খানের শাসনামলে ঈসা খানের পিতা একাধিকবার বিদ্রোহ করার পর সেলিম খানের সেনাপতি তাজ খান ও দরিয়া খান কর্তৃক ধৃত হন এবং নিহত হন। তাঁর পুত্র ঈসা ও ইসমাইলকে বণিকদের নিকট বিক্রয় করে দেয়া হয়। অথচ পরে উল্লেখ করেন যে, তাজ খানের শাসনামলে ঈসা খানের পিতৃব্য কুতব্ আল-দীন তাঁদেরকে অনেক অনুসন্ধানের পর তুরাণ দেশ থেকে উদ্ধার করে বাংলায় ফিরিয়ে আনেন।[৪] এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে, আবুল ফযলের দ্বিতীয় বক্তব্যটি প্রথম বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং দ্বিতীয় বক্তব্যটি শুধুমাত্র প্রথম বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহেরই সৃষ্টি করেনি বরং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেরও জন্ম দেয়। একজন রাজপুত পিতার সন্তানরা মুসলিম হলেন কীভাবে? একজন

Dhaka University Institutional Repository

রাজপুত পিতার সন্তানদের পিতৃব্য একটি মুসলিম ও স্পষ্টতঃ আফগান নামের অধিকারী হলেন কীভাবে ? কুতুব্ আল-দীন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন কি? যদি তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে থাকেন তবে ঈসা খান একজন মুসলিম পিতামহ ব্যতিরেকে একজন মুসলিম পিতৃব্য পেলেন কীভাবে? কিন্তু আকবরনামায় এই প্রশ্নগুলোর কোন উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি পরবর্তী কালের প্রায় সকল ঐতিহাসিক ও গবেষক উক্ত প্রশ্নগুলোর সদুত্তর ব্যতিরেকেই ঈসা খানের পিতৃপরিচয় সংক্রান্ত আকবরনামায় আবুল ফযল কর্তৃক প্রদত্ত বক্তব্য গ্রহণ করেছেন। এখানে ভট্টশালী,[৫] নীরদ ভূষণ রায়,[৬] এম. এ. রহিম[৭] ও আবদুল করিমের[৮] নাম উল্লেখ করা যায়। এই ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউই উক্ত প্রশ্নগুলোর সদুত্তর দেননি বা দেয়ার চেষ্টাও করেন নি। তাই বলা যায় যে, উক্ত ঐতিহাসিকগণ আকবরনামায় প্রদত্ত আবুল ফযলের বক্তব্যের অসামঞ্জস্যতার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেননি। যাহোক,যুক্তিসংগত কারণেই ঈসা খানের পিতৃ পরিচয় সংক্রান্ত আকবরনামায় প্রদত্ত আবুল ফযলের বক্তব্য এবং উক্ত ঐতিহাসিকদের বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা যায়নি। দ্বিতীয়তঃ আবুল ফযল আকবরনামায় বাংলায় মুঘল অভিযানের বর্ণনা দিতে গিয়ে পুনঃপুনঃ মুঘল বাহিনীর সফলতা, ঈসা খানের বশ্যতা স্বীকার ও ঈসা খানের পরাজয়ের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু আকবরনামায় বর্ণিত যুদ্ধের বিবরণ ও ফলাফল গভীর ভাবে পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে ঈসা খান প্রায় যুদ্ধেই জয় লাভ করেন এবং স্বীয় অবস্থানে অটুট থাকেন এবং তিনি কখনই মুঘলদের আনুগত্য স্বীকার করেন নি। অথচ আধুনিক ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার কোনরূপ বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকেই আকবরনামায় বর্ণিত ঘটনাবলীর উপর ভিত্তি করে উল্লেখ করেন যে, "Shahbaz Khan Pacifies Bengal," "Much of Isa Khan's territory fell into Mughal hands," "Isa Khan ... offered submission to the Emperor,"[৯] ইত্যাদি। কিন্তু আবুল ফযলের আকবরনামা এবং স্যার যদুনাথ সরকারের বক্তব্যের উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থা স্থাপন করা যায় নি। এতদসত্ত্বেও আবুল ফযলের আকবরনামাই একমাত্র সমসাময়িক ঐতিহাসিক সূত্র যেখানে বাংলায় বাদশাহ্ আকবরের অভিযান সমূহ, ঈসা খানের উত্থান এবং ঈসা খান ও তাঁর মিত্রদের প্রতিরোধ সংগ্রামের কাহিনী সম্পর্কে অনেক মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এদিক থেকে বিচার করলে ঈসা খানের ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আবুল ফযলের আকবরনামার কোন বিকল্প নেই।

Dhaka University Institutional Repository

ঈসা খানের ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য উৎস হচ্ছে আবুল ফযলের আইন -ই- আকবরী। আইন -ই- আকবরী রাজনৈতিক ইতিহাস গ্রন্থ নয়, মূলতঃ ইহা বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বকালের একটি প্রশাসনিক ম্যানুয়েল। তবুও ঈসা খানের সঠিক পিতৃ পরিচয় উদঘাটনের ক্ষেত্রে আইন -ই- আকবরীতে প্রাপ্ত তথ্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কেননা আবু ফযল যেখানে আকবরনামায় ঈসা খানের পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন সেখানে আইন-ই-আকবরীতে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঈসা খানকে একজন আফগান (Isa Afghan) হিসেবে উল্লেখ করেন।[১০] তাই সঙ্গত কারণেই এ সন্দর্ভে আকবরনামায় প্রাপ্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্যের পরিবর্তে আইন-ই-আকবরীতে প্রাপ্ত সুস্পষ্ট তথ্যই গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সকলেই বিশেষ করে ভট্টশালী, নীরদ ভূষণ রায়, এম,এ,রহিম এবং আবদুল করিম তাঁদের রচনায় আইন -ই- আকবরী ব্যবহার করা সত্ত্বেও আকবরনামায় প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে তাঁরা কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ না করেই নির্বিচারে তা গ্রহণ করেছেন। তাই দেখা যায় যে,উক্ত ঐতিহাসিকগণ আইন-ই-আকবরী-এর উক্ত তথ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন নি,যদি তাঁরা আইন -ই- আকবরী-এর উক্ত তথ্য গভীর ভাবে পর্যালোচনা করতেন তবে তাঁরা আকবরনামায় প্রাপ্ত তথ্যের বিভ্রান্তির স্বীকার হতেন না। এতদ্ভিন্ন, ঈসা খান যে, ভাটি অঞ্চলের অধীশ্বর ছিলেন, তা আইন-ই-আকবরীতে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। আইন-ই-আকবরীতে ঈসা খানকে ভাটির শাসক হিসেবে উল্লেখ করা হয়।[১১] যাহোক, ঈসা খানের ইতিহাস পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আইন -ই-আকবরীরও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

এই অনুসন্ধানে ব্যবহৃত তৃতীয় উল্লেখযোগ্য আকর গ্রন্থ হচ্ছে গোলাম হুসাইন সলীম জাইদপুরী রচিত রিয়ায আল-সালাতীন। গোলাম হুসাইন সলীম মূলতঃ অযোধ্যার জাইদপুরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি মালদহে ইংরেজ কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট জর্জ উড্নীর অধীনে একজন ডাক-মুনশী বা পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি মালদহে মৃত্যুবরণ করেন।[১২] তিনি ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে ফার্সী ভাষায় তাঁর এ গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন।[১৩] এ গ্রন্থে বাংলায় প্রথম মুসলিম বিজয় থেকে ইংরেজ শাসনের প্রথম কয়েক বৎসরের বাংলার ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। রিয়ায আল-সালাতীন-এর পূর্বে ফার্সী ভাষায় আর কোন বাংলার

Dhaka University Institutional Repository

ধারাবাহিক ইতিহাস গ্রন্থ লিখিত হয়নি। ইহাই হচ্ছে বাংলার মুসলিম শাসনামলের প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস গ্রন্থ। তবে এ গ্রন্থে বাংলায় মুঘল আগ্রাসনের বিস্তারিত বিবরণ এবং ঈসা খানের মুঘল বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের ইতিহাস পাওয়া না গেলেও এ গ্রন্থে প্রাপ্ত ঈসা খান সম্পর্কিত একটি তথ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রতীয়মান হয়। এ গ্রন্থে ঈসা খানকে স্পষ্টভাবে "Isa Khan Afghan"[১৮] হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা সহজেই ঈসা খানের পিতৃপরিচয় সম্পর্কে আবুল ফযল আকবরনামায় যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন তা দূরীভূত করা যায়। কেননা আবুল ফযল আইন -ই- আকবরীতেও সুস্পষ্ট ভাবে ঈসা খানকে "Isa Afghan" হিসেবে উল্লেখ করেন। তাই সঙ্গত কারণেই এই সন্দর্ভে ঈসা খানের পিতৃপরিচয় সংক্রান্ত আকবরনামার বিভ্রান্তিকর তথ্যের পরিবর্তে আইন -ই-আকবরী ও রিয়ায আল-সালাতীনের সুস্পষ্ট তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। অথচ আধুনিক গবেষক ও ঐতিহাসিকগণ তাঁদের রচনায় রিয়ায আল-সালাতীন গ্রন্থটি ব্যবহার করা সত্ত্বেও ঈসা খান সম্পর্কিত উপরোক্ত তথ্যটি তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে বলে মনে হয়,যদি তা না হতো তবে তাঁরা ঈসা খানের পিতৃ পরিচয় সম্পর্কিত আকবরনামায় প্রাপ্ত তথ্যের উপর বিনা দ্বিধায় আস্থা স্থাপন করতেন না। যাহোক, ঈসা খানের সঠিক পিতৃ পরিচয় উদঘাটনের ক্ষেত্রে আইন -ই-আকবরীর ন্যায় রিয়ায আল-সালাতীন- এরও অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে।

আরেকটি বিশিষ্ট আকর গ্রন্থ হচ্ছে আলা উদ্দিন ইস্পাহানী ওরফে মির্জা নাথান লিখিত বাহারীস্তান-ই-গায়বী। মির্জা নাথান ছিলেন বাংলার সমকালীন মুঘল সেনাপতিদের মধ্যে অন্যতম। মুঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তিনি পূর্ব-ভারতে পরিচালিত প্রায় সকল মুঘল অভিযান ও যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বাংলার ভূঁঞা-জমিদারদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। গায়বী তাঁর ছদ্ম নাম, এই ছদ্ম নাম অনুযায়ীই তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম বাহারীস্তান-ই-গায়বী । এ গ্রন্থটি চারটি খন্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক খন্ডে তিনি জাহাঙ্গীরের শাসনামলের এক এক জন সুবাহ্দারের কার্যাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করেন। প্রথম খন্ডে সুবাহ্দার ইসলাম খান চিশতীর শাসনকাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং এ খন্ডের নাম "ইসলাম নামা"।[১৭] এই সন্দর্ভে শুধু প্রথম খন্ড ব্যবহৃত হয়েছে। এ খন্ডের সূচনা হয় বাদশাহ জাহাঙ্গীরের শাসনামলে ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে ইসলাম খান চিশতী বাংলার সুবাহ্দার

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে নিযুক্তি লাভের পর থেকে অর্থাৎ ঈসা খানের মৃত্যুর প্রায় ৯ বছর পর থেকে। স্বভাবতঃই ঈসা খানের কার্যকলাপ সম্পর্কে এ খন্ডে আলোকপাত করার অবকাশ ছিলনা। তবে ঈসা খানের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্ররা কীভাবে তাঁর মুঘল-বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামকে আরো এক দশকেরও বেশী সময় পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে পেরেছিল, তা জানার জন্য এ খন্ডের বিকল্প নেই। কেননা এক মাত্র এ খন্ড থেকেই জানা যায় যে, ঈসা খানের মৃত্যুর সাথে সাথে বাংলার ভূঁঞা-জমিদারদের প্রতিরোধ সংগ্রাম শেষ হয়ে যায় নি বরং তাঁর পুত্র মুসা খানের নেতৃত্বে তা অব্যাহত থাকে। মুসা খান তাঁর পিতার মসনদ -ই- আলা উপাধি গ্রহণ করেন। এ খন্ড থেকে আরো জানা যায় যে, মুসা খানসহ আবদুল্লাহ্ খান, দায়ূদ খান, মাহ্মুদ খান ও ইলিয়াস খান নামধারী ঈসা খানের পাঁচজন পুত্র সন্তান ছিল, যা অন্য কোন গ্রন্থ থেকে জানা যায় না।[১৬] যাহোক,ঈসা খানের পুত্রদের মুঘল-বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বাহারীস্তান -ই- গায়বী-এর কোন বিকল্প নেই।

সর্বশেষ আলোচ্য আকর গ্রন্থ হচ্ছে, আব্বাস খান সরওয়ানীর তারীখ -ই- শেরশাহী বা তোহ্ফা-ই-আকবরশাহী।[১৭] আব্বাস খান সরওয়ানী বাদশাহ্ আকবরের অধীনে চাকুরী করতেন। তাঁর পিতার নাম ছিল শায়খ আলী সরওয়ানী। ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দের দিকে তিনি তাঁর এই ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন।[১৮] বর্তমান সন্দর্ভে তারীখ-ই-শেরশাহী ২য় খন্ড ব্যবহৃত হয়েছে এবং এটি মূলতঃ আফগান সুলতান শের শাহের শাসনামলের বিস্তৃত ইতিহাস। এ গ্রন্থে ঈসা খান সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া না গেলেও এটির অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। কেননা এ গ্রন্থ থেকে ঈসা খানের উত্থানের পূর্ববর্তী কালের তথা শের শাহ্ কর্তৃক বাংলার হুসাইন শাহী বংশের উৎখাত, মুঘল বাদশাহ্ হুমায়ুনের সাথে শের শাহের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই এবং বাংলা ও দিল্লীতে সূর-আফগান শাসনের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানা যায়। উল্লেখ্য যে, বাংলার সূর আফগান শাসকদের উত্তরসূরী কারারানী আফগানদের অধীনে একজন সামন্ত হিসেবেই ভাটি-প্রধান ঈসা খানের গৌরবময় কর্মজীবনের শুভ সূচনা হয়েছিল।

যাহোক, বিশেষ ভাবে উপরোক্ত আকর গ্রন্থগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী এবং সাধারণভাবে অন্যান্য সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলীর সমন্বয়ে ঈসা খান মসনদ -ই- আলার কর্মময় বীরত্ব ব্যঞ্জক জীবনের ইতিহাস পুনর্গঠনের প্রয়াস বাস্তবায়ন করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১। আকবরনামা ৩য় খন্ড ঃ এইচ, বেভেরীজ কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত ।

২। আইন-ই-আকবরী ১ম খন্ড ঃ ব্লখমান কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত এবং ২য়খন্ডঃ এইচ, এস, জেরেট কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত , যদুনাথ সরকার কর্তৃক পুনঃসংশোধিত ও টীকা যুক্ত ।

৩। রিয়ায-আল-সালাতীন ঃ আবদুস সালাম কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত ।

৪। আকবর নামা ৩য়, পৃঃ ৬৪৭-৬৪৮ ।

৫। ভট্টশালীর বক্তব্যের জন্য দেখুন বি,পি,পি, ভল্যুম ৩৮, পৃঃ ৩১-৩৭ ।

৬। নীরদ ভূষণ রায়ের বক্তব্যের জন্য দেখুন H. Bengal, পৃঃ ১৭৭-১৭৮ ।

৭। এম, এ, রহিমের বক্তব্যের জন্য দেখুন The Afghans, পৃঃ ২২৪-২২৫ ।

৮। আবদুল করিমের বক্তব্যের জন্য দেখুন Mughal Period, পৃঃ ৭০-৭৯ এবং মোগল আমল, পৃঃ ৫৪-৬০ ।

৯। H. Bengal, পৃঃ ২০৫ এবং ২১১-২১২ ।

১০। আইন ২য় ,পৃঃ ১৩০ ।

১১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩০ ।

১২। রিয়ায, পৃঃ ২, পাদটীকা-৪ ।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪,পাদটীকা-১ এবং ৩৯৮ ।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮ ।

১৫। বাহারীস্তান , পৃঃ ১০-১৩ । খালেকদাদ চৌধুরী কর্তৃক বাংলায় অনূদিত প্রথম খন্ড ।

১৬। প্রাগুক্ত , পৃঃ ৪৮, ৬১ এবং ৭৬ ।

১৭। তারীখ - ই- শেরশাহী ২য় খন্ড ঃ এস, এম, ইমাম উদ্দীন কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত ।

১৮। তারীখ, পৃঃ V, এবং ১ ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

ফার্সী পুস্তক

Allami, Abul Fazl : The Ain-i-Akbari Vol. I, Translated into English by H. Blochmann, Second edition revised and edited by Lient. Colonel D.C. Phillot, Third edition 1977.

: VOL. II. Translated into English by Colonel H.S. Jarrett, Second edition corrected and further annotated by Sir Jadu-Nath Sarkar, Calcutta, 1949.

: VOL. III. Translated into English by Colonel H.S. Jarrett, Second edition, corrected and further annotated by Sir Jadu-Nath Sarkar, Reprinted, Calcutta, 1989.

: The Akbarnama Vo. I. Translated from the Persian by H. Beveridge, Second Indian Reprint, 1977.

: Vol. II. Translated from the Persian by H.Beveridge. Second Indian Reprint, 1977.

: Vol. III. Translated from the Persian by H. Beveridge, Second Indian Reprint, 1977.

Dhaka University Institutional Repository

Nathan, Mirza : Baharistan -i- Ghaybi, Vol. II. Translated into English by M.I. Borah, Gauhati, Assam, 1936.

: Vol. I. Translated into Bengali by Khalequedad Chowdhury, Bangla Academy, Dacca, 1978.

Salim, Ghulam Hussain : Riyazu-s-Salatin, Translated into English by Abdus Salam, Reprint, Delhi, 1975.

Sarwani ,Abbas Khan : The Tarikh-i-Sher Shahi, Vol. II. Translated into English by S.M. Imam Al-Din, University of Dacca, 1964.

ইংরেজী পুস্তক

Ahmed, Shamsud-Din : Inscriptions of Bengal, Vol. IV, Varendra research Museum Rajshahi East Pakistan, 1960.

Ali, Muhammad Mohar : History of The Muslims of Bengal, Vol. IA, Printed and Published Under The Supervision of The Department of Culture And Publications, Imam Muhammad IBN SA'UD Islamic University, Riyadh, 1985.

Bhattacharyya, Sudhindra Nath : A History of Mughal North-East Frontier Policy, Dacca,January 1929.

Dhaka University Institutional Repository

Bradley-Brit, F.B. : The Romance of An Eastern Capital, Indian edition, 1975.

Gait, E.A. : A History of Assam, Second edition, Calcutta, 1926.

Halim, Abdul : History of The Lodi Sultans of Delhi AndAgra, University of Dacca, 1961.

Hunter, W.W. : A Statistical Account of Bengal, Vol. VI.,Reprinted, 1973.

: The Indian Musalmans, Reprinted from the third edition, Calcutta, 1945.

Hussain, Md. Delwar : A Study of Nineteenth Century Historical Works on Muslim Rule In Bengal, Asiatic Society of Bangladesh, 1987.

Karim, Abdul : History of Bengal Mughal Period, Vol. I., Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi, Rajshahi, 1992.

Khan, Iqtidar Alam : The Political Biography of A Mughal Noble : Munim Khan Khan-i-Khanan 1497-1575, Published for the Department of History Aligarh Muslim University, Orient Longman, 1973.

Dhaka University Institutional Repository

Majumdar, R.C., Raychaudhuri, H.C., Datta, Kalikinkar. : An Advanced History of India, Second edition (with corrections), London, 1965.

Prasad, Ishwari : A Short History of Muslim Rule in India, Allahabad, 1939.

Rahim, Muhammad Abdur : The History of The Afghans in India, Karachi, 1961.

: Social and Cultural History of Bengal, Vol. I. Karachi, 1963. and Vol. II. 1967.

Roy, Atul Chandra : History of Bengal Mughal Period (1526-1765 A.D.), Calcutta, 1968.

Sachse, F.A. : Bengal District Gazetteers; Mymensingh, Calcutta, 1917.

Sarkar, Sir Jadu-Nath : (Edited) The History of Bengal, Vol. II., Third Impression, University of Dacca, 1976.

Smith, Vincent, A. : Akbar The Great Mogul, Second edition revised, Oxford at the Clarendon Press, 1919.

Taifoor, Syed M. : Glimpses of Old Dhaka, Dhaka, 1952.

Tarafdar, M.R. : Husain Shahi Bengal A Socio-Political Study, Dacca, 1965.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা পুস্তক

আহমদ, ওয়াকিল : বাংলায় বিদেশী পর্যটক, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, অক্টোবর, ১৯৯০।

ইসলাম, সিরাজুল : (সম্পাদক) বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ডিসেম্বর, ১৯৯৩।

করিম, আবদুল : বাংলার ইতিহাস ঃ মোগল আমল প্রথম খন্ড, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৫ জানুয়ারী, ১৯৯২।

: বাংলার ইতিহাস ঃ সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৭।

করিম, মোঃ রেজাউল ও আসগর, সৈকত : (সম্পাদিত) সোনারগাঁয়ের ইতিহাস উৎস ও উপাদান, রহমান গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ, ঢাকা, ১লা জুলাই, ১৯৯৩।

কাদির, আবদুল : (সম্পাদিত) শিরাজী রচনাবলী, উপন্যাস খন্ড, ঢাকা, ১৯৬১।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ভৈরব : ঈশা খাঁ (ঐতিহাসিক নাটক), সম্পাদনায় ফরিদ উদ্দিন খান।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখাল দাস : বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম দে'জ সংস্করণঃ জানুয়ারী, ১৯৮৮, কলিকাতা।

মজুমদার, কেদার নাথ : ময়মনসিংহের ইতিহাস, সান্যাল এন্ড কোং, কলিকাতা, ফেব্রুয়ারী, ১৯০৬।

Dhaka University Institutional Repository

মিত্র, সতীশ চন্দ্র : যশোহর-খুলনার ইতিহাস ২য় খন্ড, প্রথম সংস্করণ ১৩২৯ বাংলা, কলিকাতা।

মোহাম্মদ মিছের, কাজী : বগুড়ার ইতিকাহিনী (অতীত ও বর্তমান), অনুসন্ধান অফিস, বগুড়া, পূর্ব পাকিস্তান, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৫৭।

মৌলিক, ক্ষিতীশচন্দ্র : (সম্পাদিত) প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা সপ্তম খন্ড, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, ১৯৭৫।

রহিম, মুহম্মদ আবদুর : বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫।

রায়, নিখিল নাথ : প্রতাপাদিত্য, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।

রায়, স্বরূপ চন্দ্র : সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস, কলকাতা, ১৮৯১।

সেন , কালী প্রসন্ন : (সম্পাদিত) শ্রীরাজমালা, তৃতীয় লহরের মধ্য- মণি (টীকা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত কপি, ক্যাটালগ নং RB-954.15-SRI. V. 3.

সেন, প্রভাস : বগুড়ার ইতিহাস, রংপুর সাহিত্য পরিষদ, ২য় সংস্করণ।

অজ্ঞাত : রাজমালা, আগরতলা -বীর যন্ত্রে - শ্রী ঈশান চন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত, ২০শে চৈত্র ১৩১১ ত্রিপুরাব্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত কপি, ক্যাটালগ নং RB- 954.15- SRI.

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজী সাময়িকী

Beveridge, H. : On Isa Khan, the ruler of Bhati, in the time of Akbar, in Journal of the Asiatic Society of Bengal, No. I, 1904.

Bhattasali, N. K. : Bengal Chief's Struggle for Independence in the reign of Akbar and Jahangir, in Bengal Past and Present, Vol. 35, 1928, Vol. 36, 1928; Vol. 38, 1929.

Blochmann, H. : Contributions to the Geography and History of Bengal, Vol. XLII, 1873; XLIII, 1874 and XLIV, 1875.

Hasan, Sayid Aulad : The Seven Sixteenth Century Cannon Discovered in The Dacca District In 1909, in The Dacca Review, Vol, I, No.6, September, 1911.

Hosten, H. : The Twelve Bhuiyas or Landlords of Bengal, in Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. IX, No. 10, November, 1913.

Khatun, Habiba : In Quest of Katrabo, in Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Vol. XXXI. No. 2, December, 1986.

Naqvi, Hamida Khatoon : Incidents of Rebellions During the Reign of Emperor Akbar, in Medieval India; A

Dhaka University Institutional Repository

Miscellany, Volume Two, Department of History, A.M.U., Aligarh, 1972.

Qaiser, A.J. : Shahbaz Khan Kamboh, in Medieval India : A Miscellany, Vol. One, Aligarh, 1969.

Rahim, Muhammad Abdur : Chittagong Under the Pathan rule in Bengal, in Journal of The Asiatc Society. Letters. Vol. XVIII, No.1, 1952.

Stapleton, H.E. : Note on Seven Sixteenth Century Cannon recently discovered in the Dacca District, in Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol.V, No. 9, October, 1909.

Wise, James : On the Barah Bhuyas of Eastern Bengal, in Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XLIII, Part 1-History, Literature, & c. No. III, - 1874.

: The Barah Bhuyas of Bengal. No. II. in Journal of The Asiatic Society of Bengal, Vol. XLIV. 1875.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাময়িকী

আহাম্মদ, শফিউদ্দিন	ঃ	মোগল - বার ভূঞা দ্বন্দ্ব: প্রসঙ্গ মানিকগঞ্জ জেলা , ইতিহাস, ইতিহাস পরিষৎ পত্রিকা, পঞ্চবিংশ বর্ষ, ১ম-৩য় সংখ্যা, ১৩৯৮ বাংলা সন।
ভট্টশালী, নলিনী কান্ত	ঃ	বঙ্গীয় ভৌমিকগণের স্বাধীনতা সমর, বিচিত্রা, আষাঢ়,শ্রাবণ,অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ বাংলা।
	ঃ	বঙ্গীয় ভৌমিকগণের সহিত মোগলের সঙ্ঘর্ষ, ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ভাদ্র, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ বাংলা।
	ঃ	প্রতাপাদিত্যের কথা, ভারতবর্ষ, ২০শ বর্ষ-২য় খন্ড-৩য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৩৯ বাংলা।
সরকার, স্যার যদুনাথ	ঃ	প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ, প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২৬ বাংলা।
	ঃ	প্রতাপাদিত্যের পতন, প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩২৭, বাংলা।
	ঃ	প্রতাপাদিত্যের সভায় খ্রীষ্টান পাদ্‌রী, প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২৮ বাংলা।
	ঃ	বাঙ্গলার স্বাধীন জমিদারদের পতন, প্রবাসী ভাদ্র, ১৩২৯ বাংলা।